

বর্ষ

২৫ ৪৪

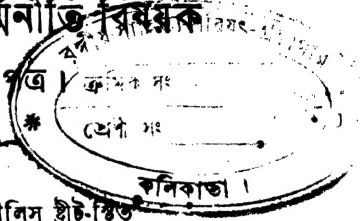
২৬০৫

ব. ম. ব. স.

ধর্ম

আয়ুর্বেদ ও ধর্মনীতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।



২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট-স্থিত

আর্য আয়ুর্বেদ কলেজ
হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেন্ট উপাধি ও সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,

কবিরাঙ্ক শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিভূষণ

সম্পাদিত।

বিষয়—নূতন বর্ষ, নাম-মাহাত্মা, লক্ষ টাকার কথা, অস্ত্রিমে স্বপ্নাব-
সান, পিপাসার জল, জব্যগুণ-বিচার, জ্যোতিষের গুণ, পতি-দেবতা, সদাই মনে
রেখো, অগ্নি পরীক্ষা।

প্রকৃতির শিক্ষা ।

উৎকৃষ্ট ভাবময়ী পদ্য-পুস্তিকাঃ ইহাতে সৃষ্টির ক্ষুদ্রমহৎ সমস্ত বস্তুকে, এক নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে পাইবেন। পড়িলে ভাবকের মন প্রকৃতির মনোহর ছবি দেখিয়া উন্নত হয় ও উক্তের হৃদয় জ্বলন্ত হইয়া, ভগবানের দিকে শ্রোতোরূপে বহিয়া যায়। মূল্য ১০ আনা। মফস্বলবাসী ১০ আনা ডাঃ ষ্ট্যাম্প কবিরাজ মহাশয়ের ঠিকানায় পাঠাইয়া লউন।

“ঋষি”-পত্রিকার নিয়ম ।

- ১। “ঋষি” বাঙ্গালা মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (হলজ্বা বিঘ্ন না হইলে) অবিচলিত-নিয়মে বাহির হইবে। কোন গ্রাহক কোন মাসের “ঋষি” না পাইলে তাহার পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জানাইতে হইবে। নচেৎ ইহার জন্ত আমরা দায়ী নহি। আকার (অনূন) ডিমাই ৮ পেজী ও ফর্ম।
- ২। মূল্য, অগ্রিম বার্ষিক ১ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১/০।
- ৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ অগ্রগৃহপূর্বক গ্রাহক-নম্বর-সহ নাম-ধাম-আদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। নূতন গ্রাহকগণ “নূতন” এই কথাটির উল্লেখ করিবেন।

ফুলের বাগান—প্রসিদ্ধ লেখক বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিতকৃত মূল্য ১/১ অতীব সুন্দর। গল্প, উপজ্ঞান, প্রবন্ধ ও সমালোচনা একাধারে। একটু পড়িলে সমস্ত না পড়িয়া থাকা যায় না। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্য।

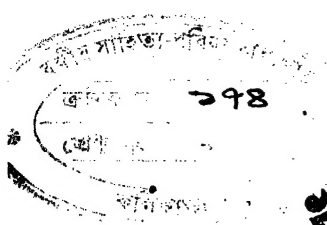
প্রবাস চিত্র—বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখক শ্রীজলধর সেন প্রণীত। অমূল্য অতুল্যপুস্তক। মনের আবেগে সন্ধ্যাসি-বেশে দুর্গম পাহাড় জঙ্গল ঘুরিয়া গ্রন্থকার অপূর্ব ঘটনা ও দৃশ্যাবলি চিত্রিত করিয়াছেন, পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়। মূল্য ১ টাকা। প্রাপ্তির ঠিকানা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান।

ফেব্রুয়ারি দে এণ্ড কোং

৪৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

গ্রীষ্মোপযোগী নানাবিধ বস্তাদি আমদানি করা হইয়াছে। কামিজের জন্ত উৎকৃষ্ট ছিটের কাপড় প্রভৃতির নমুনা ও মূল্যাদি, পত্র পাইলে পাঠান হয়। আঙ্গুলিক এখানে পাওয়া যায়। অর্ডার পাইলে অল্প সময়ের মধ্যে পোষাক তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়।

Civil and Military Tailors, Army Contractors &c. &c.



ঋষি।

২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা } '১৩০৬ আষাঢ়। জুন।

নূতন বর্ষ।

ঋষির গতি—আমাদের এই পত্রিকার শুভারম্ভ বিগত ১৩০৫ সালের সেই আষাঢ় মাসে—দুরন্ত প্রেগ-দানবের সু-বিষম বিভীষিকার মধ্যে যখন চতুর্দিকে লোক কেবলই ছ ছ-খাসে পালাইতেছিল; দোকান-কারখানা সব বন্ধ; কম্পোজিটার অভাবে প্রায় সমস্ত প্রেসই অটল,—যখন লোকে নূতন কার্যে হস্তক্ষেপ করা দূরে থাকুক, আরক্কার্য্যও সহন্য-স্পৃষ্ট অগ্নিগর্ভ অঙ্গারের ঝাঁপে দূরে নিক্ষেপ করিতেছিল, আজ এই পুনরাগত আষাঢ়ে বিশ্ব-পাতার প্রসাদে ইহার একবৎসর পূর্ণ হইল। গ্রাহকগণ অবশ্য জানেন—

ঠিক্ মাসে মাসে নির্দিষ্ট দিনে অবাভিচারিত নিয়মে ভগবৎকৃপায় আমরা এই পত্রিকা খানি প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। যদি কেহ ঠিক্ সময়ে পত্রিকা না পাইয়া থাকেন তবে সে ডাকঘর-সংক্রান্ত ত্রুটি বা অশু হৃদৈবাধীন ঘটনা থাকিবে।

আমরা ঋষি পত্রিকার নিয়মাবলিতে লিখিয়াছি 'পত্রিকার আকার ৩ ফর্ম্মা হইবে'—কিন্তু কার্য্যকালে মধ্যে মধ্যে সাড়ে তিন ও ৪ ফর্ম্মা দিয়াছি। ঈশ্বরের কৃপায় এই এক বৎসরের মধ্যে আমরা গ্রাহকগণের অবাচিত অচেষ্টিত সুবহল অনুগ্রহ পাইয়াছি,—ঋষি, মাসিক পত্রিকার চিরপ্রসিদ্ধ বিশ্বপুঞ্জ ভেদ করিয়া নিক্ষুণে এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিলেন। ঋষির এই অবাধ গতির জন্ত আমাদের মনে একটু গ্লান্বার সঞ্চার হয়; যেহেতু, এই চাকটিক্যময় বেশ-বিলাসের দিনে—আপাত-প্রমোদ-প্রিয়তার রাজত্বে—ভ্রম-ধূসরিত বিকট

জটা-বেষ্টিত বুড়া বিট্কেল ঋষির কথায় কয়জন কাগ দিতে চায় ? ঋষি বাছ-
বাছা করিয়া নিমন্ত্রণ করিতেছেন বটে, কিন্তু খাইতে দিতেছেন ক্ষেতের সেই
দিশি চাউলের অন্ন, পলতার ডালনা, আর ঘি-কাঁচকলা ! তিনি না দেন
রসগোল্লা, না রাবড়া, না একটু রসালো চাটনী । /তথাপি স্বথের বিষয়—
অনেকে ঋষির সঙ্কল্প-প্রসারিত আশীর্বাদোন্মুখ-হৃৎয়ের অস্বাহ প্রসাদের ভক্ত
হইয়াছেন ।

বিষাদের কথা—কিন্তু তথাপি কালের এমনই দোষ যে, কোনও
পরিচিত বন্ধুকে হয় ত বলিলাম “ভাই ! আমাদের ঋষির গ্রাহক হও, বছর^১ /
একটাকা, মাসে সোয়াপাঁচ পয়সা বই ত নয় ?” তিনি বলিলেন “আম্মার অনেক
ধুরচ, একটাকা বছরে দেওয়া আমার সাধ্যাতীত ।” কিন্তু সেই বন্ধুকেই সময়া-
ন্তরে দেখিলাম—থিয়েটার দেখিয়া তাহার কতগুলি বেশী পয়সা উড়াইতেছেন !
আবার হয় ত, কোনও স্থলে মাসে মাসে কাগজ পাঠাইতেছি,—গ্রাহক বাবুর
সব কথাই মনে থাকে, কিন্তু মূল্যের টাকাটা পাঠাইতে তিনি ভুলিয়া যান—এ
হ্রস্বষ্ট মাসিক পত্রিকা মাত্রেরই । এই জন্মই মাসিক-পত্রিকা উঠিয়া যায়—
তাই বলি, ধন্ত নব্যভারত ও বামাবোধিনী—ধন্ত রে তোদের কচ্ছপের আয়ুঃ !

আমাদের কাগজের আয়ুঃ—অনেকে আবার ইচ্ছাস্বেষেও
গ্রাহক হইতে ভয় করেন ; কেন না, তাঁহাদের আশঙ্কা যে, অন্তান্ত মৃত পত্রি-
কার নজীরের অনুসারে কাগজ হয় ত উঠিয়া যাইবে । কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে
স্পর্দ্ধার সতি সাহস দিয়া বলিতেছি—সম্পাদকের অকালে জীবনসমাপ্তি বা
ছর্নিবার আধি-ব্যাধি ব্যতীত অন্ততঃ ১০ বৎসরের পূর্বে সম্ভবতঃ আমাদের
কাগজ উঠিবে না । যেহেতু ইহাতে যে অকারাদি ক্রমে দ্রব্যগুণ বাহির হই-
তেছে, তাহা শেষ করিতে দশ বৎসর লাগিতে পারে । উহা শেষ করা সম্পা-
দকের বদ্ধমূল প্রতিজ্ঞা । দ্বিতীয়তঃ, এই পত্রিকা খানি কোন দুষ্ট স্বার্থের জন্ম
করা হয় নাই । ইহা স্বকীয় ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনের জন্ম নহে । আর্থিক লাভের
জন্মও নহে—লাভ হয়ও না । সম্পাদক চিরকাল যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়ার চর্চা
করিয়াছেন, ব্যবসায়ের কালেও সেই চর্চা কথঞ্চিৎ রাখিবার জন্মই তাঁহার এই
স্বত্র অবলম্বন । সুতরাং কাগজের অকাল-বিলোপ না হইবারই সম্ভাবনা ।
শুভে ইতঃপর ঈশ্বরের মনে কি আছে তাহা তিনিই জানেন ।

ঋষির উদ্দেশ্য—শরীর ও মন প্রথমে এই দুই জগৎপাতার নিকট হইতে পাইয়াই মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হয়—বিদ্যাখনাদি পরের কথা । ঐ দুইই বাবতীর স্বথ-হুঃখ গুণ-দোষের মূল-ভিত্তি-স্বরূপ । এই ছায়ারই সদস্য পরিণামের জন্ত মানুষ “মালিখের কাছে” জবাবদায়ী হইবে । শরীরের সংপরিণাম—স্বাস্থ্যগত, মনের সংপরিণাম—ধর্মগত । শাস্ত্রে বলে “ধর্মার্থকাম-মোক্ষাণামারোগাং মূল সূত্রমম্” । ধর্ম, বল, অর্থ বল, কাম বল, আর মোক্ষই বল, সকলেরই মূল নীরোগতা । আরও উক্ত আছে ‘এক এব সুদুর্কশো নিধনেপ্যনুষ্যতি যঃ’ শরীরেণ সমং নাশং সর্বমশ্রুৎ তু গচ্ছতি ॥’ ধর্মই একমাত্র সুস্থঃ যাহা নিধনেও সঞ্চে যায় । কিন্তু অশ্রু সকলই দেহ-নাশের সহিত নাশ-প্রাপ্ত অর্থাৎ সম্পর্ক-বিলুপ্ত হয় । ভাল হইবার ও ভাল করিবার কথা জানেন অনেকেই, কিন্তু সে সব জানিয়াও মানুষের মনে জাগরুক থাকে না । সে গুলি জাগ্রৎ রাধিবার একমাত্র সজুপায়—সাধুসঙ্গ । কিন্তু সকলের পক্ষে ত সাধুসঙ্গ সম্ভব হয় না, তজ্জন্ত সাধুদিগের উক্তিগুলির সর্বদা স্মরণ ও অলোচনাই তৎপক্ষে প্রশস্ত উপায় ।

হঠাৎ হরিবোল বলিয়া সমুখভাগ দিয়া একটা শব্দ লইয়া গেলে “আর পাপাচরণ করিব না” বলিয়া কতই না প্রতিজ্ঞা মনে উদ্ভিত হয় । কিন্তু সেই দেবভাবটা কতদিন থাকে ? ধর্মসভ্যতে কোনও উপদেশ-পূর্ণ হৃদয়গ্রাহিণী বস্তুতা গুনিয়া সভা-ভঙ্গ কালে লোক-সমুদয় যখন বহির্গত হইতে থাকে, তখনও কতজনের মনে (পূর্বের মত) কত ভাবুকতা ও কত ধর্ম-প্রবণতা উদ্ভিত হয় । কিন্তু সেই ভাবটাই বা কতদিন স্থায়ী হইয়া থাকে ? ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, মানুষ যতই কু-প্রবৃত্তির দাস হউক না কেন, সংপ্রবৃত্তির উত্তেজক স্মৃতিকল্প কথাগুলি কর্ণগোচর হইলে মন একটু না একটু নিশ্চয়ই টলিয়া যায় ! কিন্তু তত্তৎ বিষয়ের বিস্মৃতি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ (এবং ঈশ্বরেরও অভিপ্রেত) । এক কথায় সংসার-ক্ষেত্রে পরিধাবিত, বিষয়-ব্যাকুলিত মানবের সমক্ষে কোন না কোন স্মারক পদার্থ মধ্যে মধ্যে উপনীত হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ স্মৃতি কথায় মানুষকে পুনঃ পুনঃ “তাগাদা” না করিলে কখনই সেই অপরিহার্য বিস্মৃতির প্রতিবিধান হইতে পারে না । আমাদের এই পত্রিকা খানি ঐরূপ মাসে মাসে তাগাদা করিবার জন্তই দ্বারে দ্বারে উদ্ভিত হইতেছে।

এই এক বৎসর তাগাদায় যদি একজনের মনও উদ্বোধিত ও পবিত্রতার দিকে উন্মুখীকৃত হইয়া থাকে, তবে আমাদের বায় ও শ্রমের যথেষ্ট সার্থকতা হইয়াছে সন্দেহ নাই।

ঋষির প্রবন্ধ—কলিকাতা ও মফস্বল হইতে অনেকে আমাদের কাছে লেখেন “মহাশয়! ঋষিতে ঋষ্মের কথা আর একটু বাড়াইয়া দিন, শুষ্ঠ, পিপুল মরিচের কথা পড়িয়া কি হইবে?” কেহ বলেন “ধর্ম্মাধর্ম্মির কথা অনেক শুনা আছে, “উহাতে প্রয়োজন নাই, আয়ুর্বেদের কথা বেশী করিয়া লিখুন।” কেহ বা লেখেন উহাতে বেশ মিঠা মিঠা গল্প নভল দিয়া পাঁচ ফুলের সাজী করুন, যেমন অত্রাত্ম কাগজে দেখিতে পাই।” কিন্তু আমরা জানি, একসঙ্গে সকলকেই সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা বৃথা, সুতরাং আমাদের কাগজের যে মূর, তাহাই থাকুক। বলি, যদি নভেল খুঁজিতে হয়, তবে ত ওরূপ কাগজের অভাব নাই, সব কাগজেই তা সেই এক মূর।

আর আজ কাল যে সমস্ত নিত্য নূতন মাসিক পত্রিকা উদ্ভিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশেরই মধ্যে প্রায়শঃ এইরূপ সকল বাজে কথাই লেখা থাকে, যথা—“নাচস্তু নগরে গোবর্দ্ধনকান্ত নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাহার তিনটা পুত্র—লগেন্দ্র, বগেন্দ্র ও জগেন্দ্র এবং তিনটা কন্যা—এ-বালা, ও-বালা আর সে-বালা। কন্যা তিনটা ক্রমে বয়ঃসী হইল। সেই বাড়ীর কাছে এক প্রতিবেশীর বাড়ী—সেই বাড়ীতে রসরাজ নামে একটা খুবক ছিল, ক্রমে এতে-ওতে চোখো-চোখি, দেখা দেখি, লেখা-লেখি, মাথা-মাথি, হতাশ! নৈরাশ !! ইহি-ইহি !! উছ-উছ !!! কত কি ঘটন-রটন হইয়া গেল!”—বলুন দেখি, এমন সব বাজে কথা শুনিয়া, কবে কাহার স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধা হইবে?

একটু বিশেষত্ব—এই পত্রিকায় অভূতপূর্ব রীতিতে অকারাদি ক্রমে দ্রব্যগুণ লিখিত হইতেছে—বিজ্ঞব্যক্তিমাত্রই বলিতেছেন এরূপ সুবিস্তীর্ণ দ্রব্যগুণ এ পর্য্যন্ত কুত্রাপি লিখিত হয় নাই—ইহাতে দ্রব্যের দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম, উৎপত্তি-স্থান, আকৃতি-নিক্রপণ, বিচার দ্বারা সন্দেহ ভঞ্জন, পাশ্চাত্য পরীক্ষায় নির্ণীত গুণাস্তর, রসবীর্ষাদি তত্ত্ব, প্রয়োগবিধি প্রচলিত লৌকিক ইতিবৃত্ত প্রভৃতি এক একটা গাছ গাছড়া সম্বন্ধে যত কিছু জানিতে পারা যায় তৎসমস্তই লিখিত হইতেছে। প্রত্যেক গাছ গাছড়া খচিত যে

সকল নানা মুষ্টিযোগে লিখিত হয়—সে শুধি স্ত্রীলোকেরা জানিয়া রাখিলে কথায় কথায় ডাক্তার কবিরাজকে ডাকিতে হয় না, তদ্বারা গৃহস্থালীরও অনেকটা সাশ্রয় ও শাস্তি হইতে পারে ।

শেষ প্রার্থনা—এই পত্রিকা সকলেরই প্রয়োজনীয়—সকলেই ইহার গ্রাহক হইয়া আমাদেরিগকে উৎসাহিত করুন । সজ্জিত বা সুনীতির কথা বাহাদের ভাল লাগে না, আমাদের করপুটে নিবেদন—তঁাহারাই সর্ব্বাঙ্গে ইহার গ্রাহক হউন ; যেহেতু অনিচ্ছাক্রমে চোক বুলাইতে বুলাইতেও যদি দু-একটা কথা মনে লাগিয়া যায়, তবে অপ্রিয় তিক্ত ঔবধের ভ্রায় পেটে গিয়া নিশ্চয়ই গুণ দিবে—বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ।

গ্রাহকগণের আশীর্বাদ লইয়া ও যথাযোগ্যস্থানে স্নেহাশীর্বাদ দান করিয়া পুনরায় নববর্ষের কর্তব্য পালনে ব্রতী হইলাম । জগদীশ্বর আমাদেরিগকে স্বাস্থ্য ও ক্ষমতা দিন ।

নাম-মাহাত্ম্য ।

ভাই ভাইএ বিবাদ চিরকালই আছে । শুধু আজকালকার ছেলে পিলেদের ভিতর নয়—শুধু অল্পবুদ্ধি মানুষের ভিতর নয়, ষ্টিগুগাস্তর পূর্বে দেবতাদিগের মধ্যেও এই বিবাদ দেখা যায় । সে বহুদিনের কথা—যে কথা বলিব মনে করিয়াছি—সে বহুকাল পূর্ব্বের কথা । এক দিন শিবের মালা লইয়া কার্তিক ও গণেশে বিবাদ বাধিয়াছিল । শিব—ভোলা মহেশ্বর—যেখানে যা পান, তাই লইয়াই তাঁর আনন্দ । জানি না, কি জন্ত, কি কাজে লাগে তাও জানি না, বিবাদ সেই হাড়ের মালাছড়াটি লইয়া । অনেক শ্মশান ঘাঁটিয়া, হাড় সংগ্রহ করিয়া, পাগল মহেশ—“পাগল” কিনা তাই—শ্মশান হইতে কতকগুলি হাড় কুড়াইয়া মালা গাঁথিয়া আপনার গলায় ধারণ করিয়াছেন । ছেলে ছুজনের মধ্যে সেই মালা ছড়াটির জন্ত বিবাদ । তারা শুনিয়াছে যে, সেই মালা ছড়াটির শক্তি—না কি, অনন্ত । অনন্ত গুণ যে কি, তা’ পাগল ভোলা বোঝেন, আর তাঁর ছেলে ছুটি তাঁর কাছে না কি শুনিয়া বুঝিয়াছে । গুণ যাই হোক, তারা কিন্তু আর বোধ মানে না, এ বলে আমার

চাই, ও বলে আমার চাই। শিবের প্রবেশ-বাক্য আর তাহানিগকে ধামাইতে পারে না—শিবও বিব্রত ; কারে রাখিয়া কারে দেন, স্থির করিতেই পারিলেন না। তখন তিনি যেসিয়া একটা মতলব স্থির করিলেন ভাল। “পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিয়া আজ যে অঞ্জে আমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে, এই মালা তাহারই প্রাপ্য”। হকুম ওনিয়া কার্তিক আমোদে আটখানা। তাহার বাহন ময়ূর, বায়ুবেগে মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিয়া আসিবে। আর গণেশ ইহুরে চড়িয়া কত দিনে যাইবে ?

কার্তিক মহাস্তবমানে তৎক্ষণাৎ তীর্থযাত্রার বাহির হইল, কিন্তু গণেশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। খানিক পরে গণেশ আর সে গণেশ নাই। সে যেন তীর্থ-ভ্রমণের জন্ত কি এক আশ্চর্য যাহন পাইয়াছে। কিন্তু কৈ তার ত যাত্রার কোন উদ্যোগই দেখিতেছি না ! তবে হইল কি ?

এখন গণেশ আর সেু ভাবে বসিয়া নাই ত ! জু'হাতে খোল ও জু'হাতে করতাল বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া হরিনাম সংকীৰ্ত্তন—যে নামে মহেশ পাগল, নারদ বৈরাগী সাজিয়া গান গাহিতে গাহিতে বিতোর—বাহুজ্ঞান শূত্র, চৈতন্ত চতুর্দশবর্ষীয়া সহধর্মিণী, বৃদ্ধা জননী ও সমুদার ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী, একদিন যে নামের তরঙ্গে গঙ্গা উজান বহিত, পশুপক্ষী নীরব নিস্তব্ধভাবে চিত্তার্পিতের জ্ঞান হইয়া থাকিত, পাষণ্ড জীবভূত হইত—সেই হরিনাম, সেই মধুর হরিনাম সংকীৰ্ত্তন করিয়া নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেছে। নাম নাই, আহার নাই, বিশ্রাম নাই, বেলায় দিকে লক্ষ্য নাই, বাহু জ্ঞান নাই—মুখে কেবল ‘হরিবোল’ ‘হরিবোল’। গণেশের সেই সরল প্রাণের মধুর হরিবোল-ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত, তাহার সেই উদ্ভগু নৃত্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত।

দিবা অবসান প্রায়। গণেশ বাহুজ্ঞানহীন। কার্তিকের সঙ্গে দেখাই নাই। গণেশের হরিধ্বনিতে ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যোহিত। মহেশ্বর মহাতাবে বিতোর—আর থাকিতে পারিলেন না, দৌড়িয়া গিয়া গণেশকে কোলে তুলিয়া লইলেন, আর বারম্বার মুখচুষন করিয়া, অঙ্গনারে সেই অতি বয়েস ধন—শিবের সেই স্বয়মসর্গয সেই মহা-শক্তি মালা গাছটা গণেশের গলার পরাইয়া দিলেন। বলিলেন, বৎস ! তোমার তীর্থ পর্যটন অনেকক্ষণ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আজ আমি তোমার মত পুত্ররত্ন পাইয়া, ধন্ত হইলাম । ধন্ত জগন্মোহন হরিনাম, ধন্ত হরিনামের স্নানস্ত শক্তি । আজ, একমাত্র হরিনাম ঐতাবে গণেশ জয়ী—কর্নফল নাম-বলের নিকট পরাত ।

ভজিব গঙ্গা বনুনা চ ভজ মোদাবরী ভজ সরস্বতী চ ।

সর্কাদি তীর্থানি রসন্তি ভজ ব্রাহ্মতোনারকথাঃসঙ্গঃ ॥

শ্রীগুরুপদ যোগবিশারদ ।

লক্ষ টাকার কথা ।

গুরু-স্তোত্রম্

(শঙ্করাচার্য্য-রচিতম্)

শরীরং সুরূপং তথা বা কলত্রং বশস্তারু চিত্রং ধনং মেরুভূল্যাম্ ।

মনশ্চের লগ্নং গুরোরজ্বি পদে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥

ধাকুক স্নানর রূপ, স্নানরী রমণী,

মেরুভূল্য ধন, কীর্তি দিগন্তব্যাপিনী,

গুরু-পাদ-পদে যদি না রহিল মন,

কি ফল, কি ফল, তাঁর কি ফল কখন !

কলত্রং ধনং পুত্রপৌত্রাদি সর্কং গৃহং বাক্ববাঃ সর্কমেতচ্চি জাতম্ ।

মনশ্চের লগ্নং গুরোরজ্বি পদে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥

ধাকুক কলত্র পুত্র পৌত্র বহুধন,

ধাকুক স্নানর গৃহ, আত্মীয় স্বজন,

গুরু-পাদ-পদে যদি না রহিল মন,

কি ফল, কি ফল, তাঁর কি ফল কখন !

বড়বাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা কবিদ্বাদি গদ্যাং সূপদ্যাং কেরোতি ।

মনশ্চের লগ্নং গুরোরজ্বি পদে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥

ধাকুক বড়ক বেদ মুখে অনিবার,

ধাকুক সামর্থ্য গদ্যা পদ্যা লিখিবার,

শুরু-পাদ-পদ্যে যদি না রহিল মন,

কি ফল, কি ফল, তার কি ফল কখন !

বিদেশেষু মাশ্রুঃ স্বদেশেষু ধনুঃ সদাচারবৃত্তেষু মত্তো ন চাশ্রুঃ ।

মনশ্চেন্ন লগ্নঃ শুরোরজিব্ধু পদ্যে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥

ধাকুক স্বদেশে আর বিদেশেও মান,

ধাকুক মহতী নির্ধা সদা বিদ্যমান,

শুরু-পাদ-পদ্যে যদি না রহিল মন,

কি ফল, কি ফল, তার কি ফল কখন !

ক্ষমামণ্ডলে ভূপভূপালবৃন্দেঃ সদা সেবিতং বশ্র পাদান্নবিন্দম্ ।

মনশ্চেন্ন লগ্নঃ শুরোরজিব্ধু পদ্যে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥

এই ভূমণ্ডলে মৃত রাজরাজেশ্বর

সেবা করে পাদপদ্ম যার নিরন্তর,

সেই শুরু-পাদ-পদ্যে না রহিলে মন,

কি ফল, কি ফল, তার কি ফল কখন !

যশো মে গভং দিক্ষু দানপ্রভাপাৎ অগভস্ত সর্বং করে যৎপ্রসাদাৎ ।

মনশ্চেন্ন লগ্নঃ শুরোরজিব্ধু পদ্যে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥

যাঁহার কৃপায় নিত্য বহুদান করি

ছুটিরাছে যশ মোর দশদিক্ ধরি,

জগতের উপায়েই সামগ্রী সকল

যাঁহার কৃপায় মোর করে অবিরল,

সেই শুরু-পাদ-পদ্যে না রহিলে মন,

কি ফল, কি ফল, তার কি ফল কখন !

ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিরাজো ন কান্তান্নখে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্ ।

মনশ্চেন্ন লগ্নঃ শুরোরজিব্ধু পদ্যে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥

যোগে ভোগে অখগণ থাকুক আনার,

ধাকুক বা নারীর স্ত্রে মত্ত অনিবার,

শুরু-পাদ-পদ্যে যদি না রহিল মন,

কি ফল, কি ফল, তার কি ফল কখন !

অরণ্যে ন বা বস্ত গেহে ন কার্যে ন দেহে মনো বর্ততে মে বনর্থে ।

মনশ্চেন লগ্নং গুরোরজিৎ পদে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ।

কিবা গেহে, কিবা দেহে, কিবা বনে আর

কিবা কার্যে নাহি বার হনয় আমার ।

অমূল্য গুরুর পদে না রহিলে মন,

কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কখন !

অনর্থ্যাণি রত্নানি ভুক্তানি সম্যক্ সমালিঙ্গিতা কামিনী বামিনীষু ।

মনশ্চেন লগ্নং গুরোরজিৎ পদে ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥

রত্ন-ভোগ-মুখে ছিন্ন উন্নত হইয়া,

বামিনী কাটায়ে দিমু কামিনী লইয়া ।

গুরু-পাদ-পদে যদি না রহিল মন,

কি ফল, কি ফল, তায় কি ফল কখন !

গুরোরষ্টকং বঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী যতি ভূপতি ব্রহ্মচারী চ গেহী ।

লভেদ্ বাহিতার্থং পদং ব্রহ্মসংস্রঃ গুরোকৃত্বাক্যো মনৌ যস্ত লগ্নম্ ॥

কিবা পুণ্যবান্ জন, কিবা আর যতি,

কিবা গৃহী, ব্রহ্মচারী, অথবা ভূপতি,

গুরু বাক্যে যদি তাঁর নিত্য রহে মন,

এ স্তম্ব করেন পুনঃ মুখে উচ্চারণ,

তাঁহা হ'লে মহা-পুণ্য এই শ্লোকচর,

ব্রহ্মপদ মিলাইয়া দিবেক নিশ্চয় ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি এ ।

অস্তিত্বে স্বপ্নাবসান ।

এ কি স্বপ্ন দেখিলাম ! তরঙ্গিত হৃদয়ের তরল লহরীলীলা অঙ্গকার করিয়া
সেই সুখ-শশী কোন্ জলদ্বালাে সুখ লুকাইল ? এত আঁধার ! এত নির্জন !
এত দীর্ঘবতার রাত্ৰি ! এখানে কেহ নাই—আমি একা । এই অঙ্গকার রূপ
পাশাপ-একোটে আমি একা । সৰ্ব্বদ্বারা পথিকের মত পথ খুঁজিতে খুঁজিতে

কোথার চলিয়া যাই, তখনই প্রাণীর মত হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলি, শরতের মেঘের মত উঠিতে উঠিতে মিলাইয়া যাই। আবার স্মৃতি বলিয়া দেয়—
আমি একা। ঐ যে স্বর মিলাইয়া যায়, ঐ যে শরতরত্নের শীকরমূলত শৈত্যের
মত “হরিধ্বনি” মিলাইয়া যায়, উহা কেমন মধুর! কেমন মুনোমদ! কত মধুর
স্নেহ তুমি রাখি, কত বেণুবীণার শরতরত্নে তাপিত প্রাণ শীতল করিয়াছি,
কিন্তু এমন মিষ্ট স্বর ত কোথাও শুনি নাই। ধ্বনি গো, জাগিরা থাক, এই
নীরব নিঃসঙ্গ প্রাণের অন্তরালে থাকিয়া, তরঙ্গিত হইয়া উঠ, “বল হরি হরি
বোল”।

এ বার সকলই নীরব হইল। সকলই মিলাইল। এখন আমি একা।
আলোকের উপকূল পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে যেন নিশাহারা সাগরবক্ষে
ভাসিয়া যাইতেছি। সব আলোকই অদৃশ, সব স্মৃতিই বিলীন; কিন্তু একটা
আলোক যেন নিশাহাতে চায় না, কে যেন একটা স্বরকে ভুলিতে দেয় না,—
“বল হরি হরিবোল”। কে জানে কেন এই স্বর সন্ধ্যাই কাণের কাছে ঘুরিয়া
বেড়ায়, সন্ধ্যাই প্রাণের চূড়ায় গিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করে। সে স্বপ্নময়
রাজত্বের স্বপ্নময়ী কারাসুক্তির শেষ দিনে, কি মধুর স্বরই আমাকে মাতাই-
য়াছে,—“বল হরি হরি বোল”

কে জানে ও নামের ভিতর কি আছে। এই যে এত আঁধার, এই যে
এত অবসাদ, ঐ নাম যেন তাহাদের ভিতর বিজুলী খেলাইয়া গেল। এ
অশরীরী শরীরে যেন বল পাইলাম। এই অশরীরী জীবনে যেন আশ্রয়
মিলিল। জীবন্ত পাপের সৃষ্টি জলধর, ইন্দ্রধনু ধরিতা, স্বেদাবেশে যখন হিম-
কির হৈম কীরীট আক্রমণে উদ্যত হয়, তখন গিরিরাজ অগ্নিময় বিছাৎবাণে
তাহাকে বিদ্ধ করেন। মেঘ কাঁদিতে কাঁদিতে গগন-প্রাঙ্গণে নিশাইয়া যায়।
পাপপুণ্ড্র ক্ষুদ্রজীব সেইরূপ হরিনামের স্মৃতিক্রমে আত্মহারা হইয়া পড়ে,
সেই অগার অমৃত-সাগর-বক্ষে ক্ষুদ্র সন্ধিকার মত, হর্ষল পক্ষ বিস্তার করিয়া
ভাসিয়া যায়। ভাসিয়া কোথায় যায় কে জানে, কে জানে সে কোন্
তরঙ্গাঘাতে মরিতে মরিতে অমৃতপর্ণে আবার অমর হইয়া উঠে।

আমি মরিয়াছিলাম, কিন্তু অমর হইয়াছি সেই নাম শুনিয়া “বল হরি হরি-
বোল” নামে জীব ছিলাম, কিন্তু শিব্য লভিয়াছি সেই নাম শুনিয়া

“বল হরি হরিবোল” । বাহার নামের, এত গুণ না জানি সে কেমন ! সে বাণীর মত কঠোর, কিন্তু তাহার স্বরের মত কোমল । সে বিরহের মত দাহক, কিন্তু বিরহীর মত ব্যাকুল । সে চাঁদের মত স্নান, কিন্তু কলঙ্কের মত কৃষ্ণ । সে মনের মত চঞ্চল, কিন্তু ক্রবের মত স্থির । আমি তাকে ভালবাসি কি না জানি না কিন্তু সে আমাকে ভাল বাসে । ভালবাসা কথাটা কি মধুর ! এ কি মারা না আর কিছু ? মারা বলিলে সংসার বুঝায়— মারা ও স্বপ্ন একই কথা । স্বপ্ন বর্তমানে সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতে অসার । কিন্তু ভালবাসা ? ভালবাসী স্বপ্ন নয়—অমর্ত্য আগরণ । ভালবাসা ভগবানের জীবন্ত অনুগ্রহ । সেই আমার প্রার্থীদের কথা মনে নাই, কিন্তু সোহাগিনীর কথা মনে আছে । সে আমার ভাল বাসিত, প্রাণ দিয়া ভাল বাসিত, প্রাণের প্রাণ প্রেম দিয়া ভাল বাসিত । প্রেম কি অমূল্য রত্ন তাই ! কাহার সহিত প্রেমের তুলনা দিব ? রূপ ? এ দরিদ্র ত কেবল নেত্রের দ্বারে ভিখারী ! যদি নেত্রের কপাট বন্ধ করিয়া দি, তবে তাহার পরিমা আকাশেই ভাসিয়া যায় । বিষয়পঞ্চক, পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারস্থ হইয়া মনকে চুরি করিতে কত রূপই ধারণ করে । কিন্তু প্রেম ? বাহিরে ভিতরে—ভিতরে বাহিরে একই রূপ । প্রেমিক রাবণ যে দিকেই চাহে, সেই দিকেই রামমূর্তি, চোক বুলিতে চার, সেখানেও সেই রাম । শেষে সে রাম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া, সমুদ্রের শান্তির পারে উঠিল । প্রেম ও ভালবাসা একই পদার্থ । সে আমার ভালবাসে আমি তারে ভালবাসি, “বল হরি হরিবোল ।”

এই শেষ দিনে, অভিনয়ের এই শেষ অঙ্কে, একবার উচ্চঃস্বরে “বল হরি হরিবোল” । কোলাহলময়ী ধরিত্রীর মায়ার বন্ধন ছিঁড়িয়া, যে ব্যোমধান অকুল পুত্রপানে, অপরিচিত সুখ হৃৎথের আলোকাকরকারে ছুটিয়াছে, একবার তাহার হৃদয় লক্ষ্য করিয়া গগনস্পর্শী স্বরে, বজ্রবাহুবগণ ! “বল হরি হরি বোল” ।

নেত্রের সলিল নেত্রে সুবরণ করিয়া, হৃদয়ের উচ্চাস হৃদয়ে বাঁধিয়া, সাধিত্রীর সিন্দূর ললাটে পরিয়া, পতিসোহাগিনি ! উচ্চঃস্বরে “বল হরি হরি বোল” । নাড়ীর বন্ধন অনেক দিন ছিঁড়িয়াছে, প্রাণের পিঞ্জরে অনেক দিন গুঁথিয়াছে, সুত্বার শকার অনেকবার কাঁদিয়াছে, এখন না, বেহের বন্ধন কাটিয়া

“বল হরি হরিবোল”। পিতার পা ছাড়িয়া দাও, আদরের বড়ি দিয়া আর থাকিও না। শিশু মায়ের কোলে উঠিয়া “বল হরি হরিবোল”। অশ্রুজলে চিত্ত নিৰ্বাণ করিয়া “বল হরি হরিবোল”। গন্ধার সলিল গন্ধার নিকেপ করিয়া “বল হরি হরিবোল”। এই সংসার রূপ শূন্যের সুখময়ী চিত্ত-পথ্যায় শয়ন করিয়া শয়নে স্বপনে জাগরণে “বল হরি হরিবোল”।

(এখন) সাধের স্বপন ভাঙল রে ভাই ক্রোন দিকে খাই
পাই না ভেবে।

বল হরিবোল বল হরিবোল, হরিবিনে কুল
আর কে দেবে।

(এখন) খেমে গেছে মায়ার বাঁশী, খেমে গেছে আশার হাসি,
নোকা আশে যাচ্ছি ভেসে, কাণ্ডারী কি তুলে নেবে।

শ্রীতারাপদ কাব্যতীর্থ।

পিপাসার জল !

সে অনেক দিনের কথা। আমি আর বড় দাদা এক সঙ্গে থাকি। এক দিন রবিবার, দাদার আফিস বন্ধ। কিন্তু তাতে কাজের কামাই নাই। এক ভাড়া আফিসের কাগজ বড় দাদার শয়নঘরে জমা। বেলা ছই প্রহর; টেবিল ঘাসের সূর্য একেবারে মাথার উপর অগ্নি বর্ষণ করিতেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন সেই প্রথর রৌদ্রের আলার কাতর হইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। দাদার মাড়া শব্দ নাই; কোন্ এক বাছুরের মোহিনী মায়ার যেন সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ হইয়া আছে। দ্বিপ্রহর সময়ে দাদা তাঁর আফিসের কাগজ পত্র পুড়িয়া বসিয়াছেন; সরকারী কর্মচারীর আর মনিবার রবিবার নাই।”

বড় বৌদিদি সুতরাং দাদার কাছে আসর জমাইতে না পারিয়া পাঁচ বৎসরের মধ্যে বরোতে লইয়া আমার সঙ্গে অধিষ্ঠান করিলেন। মেয়েটী আমার কাছে শয়ন করিয়া রাত্রে একর স্তম্ভিত প্রায় ছড়িয়া দিল; সে সকল

প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার সাধ্য নাই। আমি তার কথার কোনটার বা উত্তর দিতেছি, কোনটা বা 'আনি না' বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি। এমন সময়ে আমাদের বাড়ীর পাশেই সুধোপাখ্যার মহাশয় দিগের বাড়ীর উঠানের চাঁপুগাছ হইতে একটা পাখী সেই 'নীলব নিস্তক্কর' ভল করিয়া ডাকিয়া উঠিল—'ফটিক্ জল'। সুবিশাল আকাশমার্গ সেই পাখীর শব্দে যেন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এমন একটা ব্যাপারের উপর প্রশ্ন করিবার অশ্রু হুরো প্রস্তুত হইল। 'মাথা তুলিয়া ছই একবার পাখীর করণ কর্ণের 'ফটিক্ জল' শুনিয়া আমার সেই স্নেহময়ী ভ্রাতৃপুত্রী প্রশ্ন করিয়া বলিল 'পাখী কি বলে।' আমি বলিলাম 'ফটিক্ জল'। তাহার পর প্রশ্ন 'কেন বলে?' এ প্রশ্নের উত্তর আমার জ্ঞানভাণ্ডারে ছিল না; সুতরাং বালিকার এ কথার উত্তর দিবার অশ্র বড় বৌদিদির শরণ লইতে হইল। তিনি তখন এক অপূর্ণ আখ্যায়িকা জুড়িয়া দিলেন। তাহার মর্ম্ম নোঁটামুটী এই যে, এক বাঘিনী শাণ্ডী পূজবধূকে বড়ই কষ্ট দিত। এক দিন শাণ্ডী-বউ ছই অন্তে ধান 'ভানিতে ছিলেন, এমন সময়ে বধূর জলতৃষ্ণা পাইল; বধু ভয়ে ভয়ে শাণ্ডীর নিকট একটু জল খাইতে বাইবার অবকাশ প্রার্থনা করিলেন। শাণ্ডী মনে করিলেন, বউ বুঝি একটা গল্প করিয়া বিভ্রাম করিবার ফন্সী করিল, তাই তিনি রাগে অধীরা হইয়া বোকে একটা ঠোনা মারিলেন। বউ অমনি চলিয়া পড়িল, তাহার প্রাণবায়ু ছুঁকার আলার পাখী হইয়া আকাশে উড়িয়া গেল। সেই দিন হইতে যখনই বড় যৌতু হয়, তখনই সেই পাখী 'ফটিক্ জল' বলিয়া কাতরকর্মে তাহার গভীর ছুঁকার কথা ঘোষণা করে। গরুটা বেশ। কিন্তু বাহাকে শুনাইবার অশ্র, তাহার প্রশ্নের উত্তরের অশ্র বৌদিদি এই গল্পের অবতারণা করিয়া ছিলেন, সেই প্রশ্নকর্ত্রী তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত; আমারও একটু ঘুমের ঘোর হইয়া ছিল। বড় বৌদিদি এমন অসভ্য শ্রোতৃবৃন্দের হাত হইতে নিস্তার পাইবার অশ্র আমার কক্ষ ত্যাগ করিয়া আবার দানার কক্ষদ্বারে উন্মোচনী করিতে গেলেন।

আবার সমস্ত মগন শব্দিত করিয়া পাখী ডাকিল 'ফটিক্ জল'। আমার ঘুমের ঘোর কটিয়া গেল, আমি সুধুই শুনিতে লাগিলাম সেই আর্জবর, সেই

কৃষাকর্মের আকুল আবেগন। 'পাখীর কথা' জুলিয়া গেলাম। আমার মনের মধ্যে আর একটি জয়ভেদী দৃষ্টি আগিয়া উঠিল।

পূর্বেই বলিয়াছি যুথোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের প্রতিবেশী। তাঁহারই চাপাগাছ হইতে সেই করুণ আর্তনাদ আসিতেছিল। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহার একমাস পূর্বে যুথোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে এক অতি শোচনীয় ব্যাপার হইয়া গিয়াছিল।

যুথোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস পূর্ববঙ্গে, তাঁহার বয়স প্রায় ৩৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার সংসারে কেবল তাঁহার বিধবা স্ত্রী রঞ্জিনী, তাঁহার স্ত্রী, এবং তাঁহার ৪টা শিশু সন্তান, এবং সেকেন্দ্রে একটা বড়ো চাকর, নাম—গদা। স্ত্রীটি দ্বিতীয় পক্ষের, কর্তার প্রাণের অমূল্যনিধি, তুলো জড়ান বাক্স-বন্ধ মনকাব্য আদরের ধন! আর রঞ্জিনী?—তাঁহার মত দুঃখিনী জগতে নাই। সংসারের সমস্ত কাজের ভার তাঁহারই পড়ে, অথচ পরণে বস্ত্র নাই, পেটে অন্ন নাই, মরিলে 'আহা' বলিবার লোক নাই! রঞ্জিনী সারাদিন খাটিতে খাটিতে রুত্ত-শ্রান্ত হইয়া যখন মরু-বায়ুর ভার দীর্ঘনিশ্বাস কেলে, তখন সে নিশ্বাসের প্রতিধ্বনি আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না, হয় কেবল বৃদ্ধ গদার হলহলারিত বরোদন শ্রুতি ছুটীতে। কেননা গদাধর রঞ্জিনীকে রাজা খুকী, অন্নকণীরা আইবড় মেয়ে এবং পরগৃহলক্ষ্মী—এই তিন অবস্থাতেই দেখিয়াছে—এবং এক রকম নিজ হাতেই মানুষ করিয়াছে। খুব বড় লোকের ঘরেই রঞ্জিনীর বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বিধির নিরীক্সে সবকুলের সন্তান হারাইয়া আজ সে উদরানের অস্ত্র ভ্রাতার গলগ্রহ।

গদা ছেলে বেলায় রাজা খুকীকে এখন রাজাদিদি বলে, নিশীথকালে হঠাৎ খুম ভাঙ্গিয়া গেলে ঐ বৃদ্ধ ভৃত্য তাহার রাজাদিদির সম্বন্ধে কোন কোন দিন এই রূপ তাবে—আহা এমন রূপ! এই কচি বয়েস! তবে এই বোল বয়স! এখনও জীবনের অনেক দিন বাকী আছে, এত কষ্টে দিদির কিরূপে কাটিয়ে যাই, কলিকাতার লইয়া যাই, তনিয়াছি আমাদের মেজ খোকা বাবু (বর্ণ পরিচয়), সে না কি বিধবাদের কষ্ট নিবারণের জন্য কি করিয়া করিয়াছে। তার কাছেই এই হতভাগিনীকে গহাইয়া আসি। তাই তাই, ও কি কথা! এ যে বড় সর্বনেশে কথা! ভ্রাতৃপণের ঘরের

বিধবা ! আর আমি বলিতেছি কি ? গদা ভাবিয়া ভাবিয়া শেষ বীমাংশে এই টুকু করে যে—অস্তিত্ব শান্তিনিদান মৃত্যুর কোণী ছাড়া রক্তিনীর আর জুড়া-ইবার স্থান নাই। বৈশাখ মাস। ছোট খোকার অন্নপ্রাশনের দিন উগ্ৰহিত। মুখুজে মহাশয় এই স্মৃত্তে আমার দশজন ভ্রাতৃলোককে খাওয়াইবেন। তাই আরোজন হইতে লাগিল, কিন্তু ব্যাপারবিধানে খাটিবে কে ? মুখুজে ঠাকুর পৃথিবীর সব জীলোককেই বড় ঝগড়াতে মনে করেন ; তাঁহার জী এমন শান্ত স্ত্রীলা ভাল মাহুব ; অধট পোড়া পাড়ার লোক বা অল্প আত্মীয়া কুটুম্বিনী—ইহার সহিত মিলিয়াশিমিলিয়া দুদণ্ডও কাটা হইতে পারে না। তাই ঠাকুর মহাশয় মনে কল্পিলেন, কোনও জীলোককে বাড়ীতে আনা হইবে না। কানের লোকের ভাবনা কি ? রক্তিনী ও বাঁড়ের মত শিশু আছে কিসের জন্ত, সব কাজ সেই করিবে। আর গদা পুরোনো ইট, একাই দশ জনের কুল্য, আর বাজে লোকের আবশ্যক কি ?

এইবার গদা ও হতভাগিনীর হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের পালা পড়িল—(আর কবেই বা না পড়ে ?) রক্তিনীর ছ তিন দিন আগে জ্বর হইয়াছিল, সবে অন্ন পথ্য করিয়াছে। আবার দৈবক্রমে অন্নপ্রাশন একাদশীর দিনে পড়িয়াছে। মুখুজে মহাশয়ের বাড়ী ছ তলা, অতি পুরাতন, সিঁড়ি উঁচু নীচু, ইট বাহির করা, উঠানে রান্নাঘর ছথানা ঘর পরস্পর হইতে অতি দূরে দূর। ছ এক বাক্সবাতারাত কল্পিলেই পাহাড় ভ্রমণের পরিশ্রম অহুভূত হয়। রক্তিনী একাকিনী এই নীমার মধ্যে উপর-নীচে ছুটাছুটা করিতে করিতে সারাদিন পরে তৃষ্ণার্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন হইয়া ভূমিশায়িনী হইল। জ্বর আবার ফুটিল। একাদশীর উপবাস, তার তন্নানক খাটুনি, তার উপরে সর্বদেহদহনকারী উদ্ভাপ। তন্নানক পিপাসা ! জরের ঘোরে রক্তিনী বলিয়া উঠিল তৃষ্ণার হাতি কাটির গেল—একটু জল দাও ! ওগো তোমাদের পারে যদি একটু জল দাও ।

ত্বাতুরের এই মর্ষবিহারী আর্জনাৎ শুনিয়া গদাঘর জল দিবার জন্ত বসী হাতে করিয়া ছুটিল। এ দিকে মুখুজে মহাশয়ের সেই অধিরূপিনী ঘরনী পেছন হইতে রক্তিনীর চুল টানিয়া বলিল—ওরে কালামুখী কুলটা, একাদশীর দিনে জল খাওয়া কি লা ? চণ্ডালিনী তুই কি আমাদের নিকলক কুলে কাদি দিবি ?

গদা আগিয়া দেখিল—জল খাবার লোক ফুরাইরাছে! পিপাসা-প্রজ্বলিত মেঘে প্রাণ-পাখী থাকিতে না পারিয়া কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। গত তিরকারের শেষাংশ গদারী বাড়েই গড়িল। গদা চোখ মুছিতে মুছিতে গরিয়া গেল।

দিনে দিনে সে সব কথা ভুলিয়া গেলাম কিন্তু আজ এই বিশ্রহরে যখন সুখোপাখ্যার মহাশয়ের চাপা গাছের মধ্য হইতে পাখী ডাকিয়া উঠিল 'কটিক্ জল' তখন সেই এক মাস পূর্বের ছন্দরভেদী দুষ্ট আমার মনন সমক্ষে উপস্থিত হইল। আমি সুখুই শুনিতে লাগিলাম হৃতকালিনী রঙ্গিনী বলিতেছে—
কৃকার ছাতি কটিকা গেল একবিন্দু জল দাও, না দাও। আমার মনে হইতে লাগিল পাখী আর কেহ নহে, পাখী সেই রঙ্গিনী। আজ এই রোজ-তাপি তাপিত হইয়া কাতরকণ্ঠে নিষ্ঠুর স্বপনের কাছে প্রার্থনা করিতেছে 'কটিক্ জল'। চম্পক বৃক্ষের প্রত্যেক পত্রের অন্তরাল হইতে যেন সেই ভূবাতুরের আবেদন স্বর্গপথ বিদীর্ণ করিয়া উঠিতেছে 'কটিক্ জল'। পাখীর কথা ভুলিয়া গেলাম; সুখু দেখিতে লাগিলাম—ব্রাহ্মণকস্তা বাগিকা রঙ্গিনী একবিন্দু জলের অস্ত্র ছুট্ কুট্ করিতেছে আর বলিতেছে 'কটিক্ জল'। কি ছন্দরভেদী সেই স্বর! এখনও আমার মনে আছে। এখনও যদি কোন দিন নিরুন্ন দ্বিপ্রহরে আকাশমার্গ বিদীর্ণ করিয়া পাখী ডাকে 'কটিক্ জল', তৎক্ষণাৎ আমার প্রাণের ভিতরে সেই লুকান বেদনা আগিয়া উঠে, রঙ্গিনীর 'সেই ভূবাকাতুর মলিন সুখ আমার মনে পড়ে, সেই দীর্ঘনয়নে একবিন্দু জলের অস্ত্র কাতরতা মনে পড়ে, আর শরীর শিহরিয়া উঠে।

তখন ভাবি—এ কাতরকণ্ঠ কি শুনিয়া ব্যথিত হইবার কেহ নাই? এ দ্বন্দ্বকাহিনী কি ব্যোমবায়ুতেই মিলাইয়া যার? কখনই নহে। ইহার অবশ্য স্রোতা আছে। উপরে গরিয়া এক জন নিত্য নিত্য শ্বঃখীর আর্তনাদের বিন্যাস রাখিতেছে।

শ্রীজলধর সেন ।

দ্রব্যগুণ-বিচার ।

ঈশ-লাঙ্গলা ।

বাঙ্গালা নাম—ঈশলাঙ্গলা বা বিষলাঙ্গলা ; হিন্দী—করিহারী ; ইংরাজী—*Gloriosa Superba or Aconitum napellus*. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কলিহারী তু হলিনী লাঙ্গলী শক্রপুষ্পাপি । বিশল্যাগ্নিশিধানন্ডা বহুবক্ত্রা চ গর্ভমুৎ ॥ সংস্কৃত নাম—কলিহারী, হলিনী, লাঙ্গলী, শক্রপুষ্পী, বিশল্যা, অগ্নিশিখা, অনন্ডা, বহুবক্ত্রা, গর্ভমুৎ । এতদ্যতীত ইহার এই কয়টা নাম দৃষ্ট হয়—বিহাজ্জালা, ব্রণহৎ, পুষ্পসৌরভা, অগ্নিমুখী, ঈশ্বরী ।

লতা-গাছ হয়, ক্ষুদ্রাবস্থায় অরং দাঁড়াইয়া থাকে, বড় হইলে অশ্রু বৃক্ষকে আশ্রয় করে । ইহার পাতা খাট-চওড়া বাঁশপাতার মত, তদপেক্ষা মোটা ও নরম, এবং ফিকে সবুজ । আদার পাতা গুলি ঘেঁরুপ ডাঁটার দুইপাশ হইতে উঠিয়া ক্রমে উর্ধ্বে উর্ধ্বে সাঙ্গানো থাকে, ইহারও প্রায় সেইরূপ । ইহার ফুল লালবর্ণ, দেখিতে বড় সুন্দর—কতকটা অশোকফুলের মত, কিন্তু তদপেক্ষা একটু বড় ; ইহার মূল মোটা শতমূলীর মত, কিন্তু শতমূলী যতদূর শাদা এবং ঘেঁরুপ ক্রমে অত্যন্ত সরু হইয়া যায়, ইহা সরুপ নহে, এক খণ্ড হয়িত্রা বা আদা স্বেৎ বাঁকা হইয়া ৮।১০ অঙ্গুলি লম্বা হইয়া জন্মিলে ঘেঁরুপ আকৃতি হইত, ইহা প্রায় তদ্রূপ ; ঔষধার্থ এই মূল ব্যবহৃত হয় । ইহা এক-জাতীয় বিষ । অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নয় বলিয়া শাস্ত্রে এই জাতীয় বিষের নাম উপবিষ । “অর্ক” দেখুন ।

কলিহারী সরা কুষ্ঠশোফাৰ্শোত্রণশূলজিৎ ।

সঙ্কারা শ্লেষ্মজিৎ তিক্তা কটুকা তুবরাপি চ ॥

তীক্ষ্ণাষ্ণা ক্রিমিহনঘ্নী পিত্তলা গর্ভপাতিনী ॥

রস—কার-তিক্ত-কটু-ক্ষার ; বিপাক—কটু, বীৰ্য্য—উষ্ণ ; গুণ—লঘু, শ্লেষ্মহর, পিত্তকর, তীক্ষ্ণ, কুষ্ঠ-শোধ অর্শঃ ব্রণ ক্রিমি ও শূল নাশক । (শূল নাশক অর্থাৎ বাহ্য প্রলেপে স্থানীয় বাধা নাশক, আভ্যন্তরিক প্রয়োগেও উদরাদির শূলনাশক হইতে পারে, যেহেতু বিষমাত্রাই

আয়েন, এবং অধিকাংশ আয়েন বস্ত্রই শূলনাশক ; কিন্তু একুণ প্রয়োগ সচরাচর দৃষ্ট হয় না) । প্রভাব—সারক, গৰ্ভশাতকারক ।

প্রয়োগ—ইহার মূল দৈর্ঘিতে অনেকটা মিঠা বিষের ত্রায় । পাশ্চাত্য উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদেরা ইহাকে এক প্রকার মিঠা-বিষ (Aconite) মনে করেন ; তবে মিঠা-বিষের অপেক্ষা ইহা ঈর্ষং মৃদু, ইহার মাত্রা ১/১০ আনা পর্য্যন্ত । মিঠাবিষের প্রয়োগ যেমন জ্বর বাত ক্লুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে আছে, ইহারও সেইরূপ । আমরা গুনিয়াছি, জ্বরিত তাম্রকে ৭ বার বিষলাঙ্গলার রসের ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ রতি মাত্রায় ষথায়ুক্ত অমুপান সহ ব্যবহার করিলে জ্বর ও শূলরোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায় । শরীরের কোনও স্থানে ব্যথা বা ফোলা থাকিলে, ইহার শিকড় বাটিয়া দিলে অতি শীঘ্র শান্তি হয় । শুধু বিষলাঙ্গলার প্রয়োগ শান্ত্রে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ইহার শক্তি বুঝিয়া বিবেচনা পূর্বক সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারিলে ফললাভের আশা আছে । ডাক্তার মুদন সরীক বলেন—“ইহা বিষাক্ত কি না দেখিবার জ্ঞান আমি নিজে ক্রমে ক্রমে ১৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত খাইয়াছিলাম তাহাতে কোনও কুলক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, বরং ক্ষুধাবৃদ্ধি, ক্ষুণ্ণি ও বলবৃদ্ধি অমুভব করিয়া ছিলাম । আমি প্রায় বোগ বৎসর চিকিৎসা প্রসঙ্গে ইহা ব্যবহার করিতেছি ; ইহার সাধারণ মাত্রা— ৫ হইতে ১২ গ্রেণ, দিনে তিন বার সেব্য ।” বোধায় পণ্ডিগের ক্রিমি মারিবার জ্ঞান ইহা ব্যবহৃত হয় । মাত্রাজে সর্পবৃশিকাদি-সর্প স্থানে ইহার প্রলেপ দেওয়া হয় । তথায় ইহা দুই প্রকারের আছে বলিয়া পরিচিত ; এক প্রকারের মূল ৩৪টা হইয়া ভিন্ন ভাবে বাহির হয়, অত্র প্রকারের কেবল একটা মূল নির্গত হয় । বহুমূলযুক্তকে মাত্রাজীরা পুরুষ ও একমূলকে জ্বীমতি বলে । এই পুরুষ জাতীয় গাছের মূল তাহার চাকা চাকা করিয়া পুনঃ পুনঃ ঘোলে ডুবাইয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া পরিশেষে সবন্ধে শিশিৃত রাখিয়া দেয় । কাহাকেও সাপে কাটিলে দু-এক চাঁকা খাওয়াইয়া দেয় ।

জ্বর বিকারের “কালানল” রস ও “প্রতাপলঙ্কেশ্বর রসে,” ভগ্নরসের “বিদ্যানন্দ তৈল” ও “করবীরাশ্য তৈলে” এবং কুষ্ঠের “বৃহৎ সোমরাজী তৈল” ও “বৃহৎ মরিচাদি” প্রভৃতি তৈলে বিষলাঙ্গলা আবশ্যক হয় ।

উডুম্বর ।

বাঙ্গালা নাম—ডুমুর ; হিন্দুস্থানী—জুরর , ইংরাজী—Fig tree. সংস্কৃত
পর্যায়ঃ—উডুম্বরো জন্তফলো যজ্ঞানো হেমডুম্বক । সংস্কৃত নাম—উডুম্বর বা
উডুম্বর, জন্তফল, যজ্ঞান, হেমডুম্বক । ইহার অন্ত নাম—অপ্পফল, শীতবন্ধল,
সদাফল, ক্রিমিকণ্টক, পুষ্পহীন, ব্রহ্মবক্ষ, সূচক্ষু, শ্বেতবন্ধল, কালস্কন্ধ, যজ্ঞ-
যোগ্য, স্প্রতিষ্ঠিত, পাকিব্রক, সোমা, জঘনেফল ।

ডুমুর গাছ অল্পশ্রু অনেকেই দেখিযাছেন—এই গাছ বটাদিবিবর্ণ ও পঙ্ক-
কীরিবৃক্ষের অন্তর্গত । পঙ্ককীরি বৃক্ষ (অর্থাৎ উষ্ণ বা শাদা রস আছে বাহাদেবর
ভাষারা) যথা—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, পারশী (পলাশ পিপুল) ও পাকুড় ।

এই গাছ সাধারণতঃ মায়ূষের ৩ঃ গুণ উচ্চ হয়, পাতা ৪ঃ অঙ্গুলী চওড়া,
৪ঃ অঙ্গুলী লম্বা এবং অত্যন্ত কর্কশ ; কিন্তু পশ্চিম দেশে এক একটা প্রকাণ্ড
গাছও দৃষ্ট হয়, অত্যন্ত বড় হইলে গাত্র হইতে বটের স্থায়ী সৰু সৰু বোয়া
নামে । সংস্কৃত উডুম্বর বা উডুম্বর শব্দের 'উ' খসিয়া গিয়া ক্রমে বাঙ্গালা
ডুমুর নামের সৃষ্টি হইয়াছে ।

ডুমুর দুই প্রকারের আছে, যজ্ঞডুমুর ও সাধারণ ডুমুর । সাধারণ ডুমুর
অপেক্ষা যজ্ঞডুমুরের ফল ৩ঃ গুণ পর্য্যন্ত বড় হয় । এখানে উডুম্বর শব্দের
দ্বারা যজ্ঞডুমুরকেই বুঝাইতেছে ; সাধারণ ডুমুরের সংস্কৃত নাম কাকোডুম্বরিকা
(কাক ডুমুর) ফল্ল, মল্লপু, জঘনেফলা । উভয়েরই গুণ বলা হইবে ।

বিনাফুলেই এই ফল হয় বলিয়া ইহার পূর্বোক্ত সংস্কৃত নাম—অপ্পফল
বা পুষ্পহীন । ডুমুর গাছের গায়ে (কিয়দূর উচ্চে) ফল হয় বলিয়া ইহার
পূর্বোক্ত অন্ত নাম—জঘনেফল । হোমকালে ইহার কাঠের যুপ (দণ্ড
বিশেষ) প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহার পূর্বোক্ত নামান্তর—যজ্ঞান, যজ্ঞযোগ্য ও
পবিত্রক । লৌকিক সংস্কার আছে যে, ডুমুরের ফুল দেখিলে রাজা হয়, ইহা
সত্য কি মিথ্যা ভগবান্ জানেন । তবে বোধ হয়, রাজপদ ফল্গত বলিয়াই
পরম্পর তুলনা দ্বারা এ কথা সৃষ্টি হইয়া থাকিবে ।

উডুম্বরো হিমো রক্ষো গুরুঃ পিত্তকফাশজিৎ ।

মধুর স্তবরো বর্ণো ব্রণশোধনরোপণঃ ॥

যজ্ঞডুমুরের রস—মধুর রসায়ন; বিপাক—মধুর; বীৰ্য্য—শীতল; গুণ—শুক, রূক্ষ, কফপিত্তনাশ, রক্তরোধক ও রক্ত শোধক, ত্রণ শোধক ও ত্রণ-রোপক । ত্রণশোধক অর্থাৎ ইহার ছালের কাথে বা ধুইলে পূজ ক্রেন দূর হইয়া বা পরিষ্কার হয় । ত্রণরোপক অর্থাৎ বা ক্ষয়বৃদ্ধি বা নিম্নতর হইলে ইহার ছালের রসে ঐ ঘাস মাংস গজাইয়া গুরিয়া আসে । প্রভাব—বর্ণশোধক অর্থাৎ পাকা যজ্ঞডুমুর বা অগ্নিসংস্কৃত কাচা যজ্ঞডুমুর খাইলে শরীরের বর্ণ উজ্জ্বল হয় এবং ছাল বাটিয়া লাগাইলে মেচেঙা প্রভৃতি বিবর্ণতাকারী রোগ দূরীভূত হয় ।

নির্ঘণ্ট রত্নাকর মতে—উদ্বৃষরঃ প্রমেহয়ঃ গৰ্ভসন্ধানকারকঃ ॥

অস্থিসন্ধানকৃৎ বর্ণ্যং কফপিত্তাতিসারকান্ ।

ঘোনিরোগং নাশয়তি বন্ধং চৈবান্ত শীতলম্ ॥

রক্তকৃৎ পিত্তদাহ ক্ষুং তৃষা শ্রম প্রমেহক্ষুৎ ।

শেষ মুচ্ছা বমিধ্বংসি পকং ফলং তু কীর্তিতম্ ॥

অর্থাৎ যজ্ঞডুমুরের ফল শ্রাবযুক্ত প্রমেহয় ও গর্ভস্থাপক । ইহার ছাল ভগ্নাস্থি ষোজক, বর্ণকর, কফপিত্তাতিসার নাশক, ঘোনিরোগঘ্ন, এবং শীতল । পকফল রক্তদোষহর, পিত্ত দাহ ক্ষুধা তৃষণা শ্রম প্রমেহ (জালাযুক্ত) নাশক, এবং ক্ষয় মুচ্ছা বমি হারক বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

কাকোদ্বৃষরিকা গুণঃ ৭

কাকোদ্বৃষরিকা ফল মলপূঃ ভূধনেফলা ।

মলপূ স্তম্ভকং তিক্তা শীতলা তুবরা জয়েৎ ।

কফপিত্ত ত্রণ শিত্র কুষ্ঠ পাণ্ডুর্শঃ কামলাঃ ॥

কাকডুমুর কষায় ও দ্বৈষংতিক্ত রস, রক্তমলমূত্রাদির স্তম্ভকর, কফপিত্তনাশ, ত্রণ, ধবল, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, অর্শ ও কামলা রোগীর হিতকারী । ইহার তিক্ত ও কষায় রস সবেও ইহা প্রভাব বশতঃ শীতল ।

প্রয়োগ—ডুমুরের ঔষধীয় শক্তি বিবৃত করিবার পূর্বে বলা উচিত যে অল্পদেশে ইহা উৎকৃষ্ট তরকারীর মধ্য গণ্য । পদ্মডাঙ্গায় গৃহস্থের বাড়ীর

অনতিদূরে অবস্থ-জাত অনেক ডুমুরের গাছ দৃষ্ট হয় ; দরিদ্র গৃহস্থেরা দিন-বিশেষে পয়সার অনাটনে বাজারে যাইতে নহে পারিলে ডুমুর ও তৎসদে অন্ত শাকপাতা সংগ্রহ করিয়া সে দিনের আহার নির্বাহ করিয়া থাকে । অথবা কচি উজ্জ্বল কুঁরিবার লব্ধ অন্তান্ত তরকারীর সহিত মধ্যে মধ্যে ইহা রন্ধন করিয়া থাকে । কচি ডুমুর সুখাদ্য, লক্ষুপাক ও সুধরোচক । সহরের বাজারে দু পয়সার অল্প চারিটামিলে, সহরে গরিব তত্র বাবুরা তাহাই পাইয়াই চরিতার্থ হন । বিশেষতঃ, ইহা নিন্দোষ ও উপকারী বলিয়া রোগীপ পথ্য রূপে প্রসিদ্ধ, তজ্জন্য সহরের বাজারে ইহার একটু আদর ও টানাটানি লক্ষিত হয় । তরকারী রূপে ব্যবহার করিবার পক্ষে বঙ্গডুমুর অপেক্ষা ছোট ডুমুরই ভাল । ইহা ভাজা, দ্রষ্ট, ছেঁচকি, মাছের ঝোল বা নিরামিষ ব্যঞ্জন, প্রভৃতি বাহার উপকরণেই প্রযুক্ত হউক, সর্বত্রই সুস্বাদু হইয়া থাকে । ঔষধাকারে বঙ্গডুমুরের প্রয়োগই কবিরাজ মণ্ডলী মধ্যে প্রচলিত, কিন্তু বঙ্গ-ডুমুরের কাষ ছোটডুমুরেও যে না হয় এমন নয়, বরং রোগবিশেষে এই ডুমুরেই অধিক ফল হয় । উভয় ডুমুরই কষায়রস ও ধারক, প্রধানতঃ এই গুণেই কতিপয় রোগে ডুমুরের ব্যবহার ; কিন্তু ছোট ডুমুরের কষায়রস সহিত ঔষধ তিলের আমোজ আছে, অতএব মেহ প্রভৃতি রোগে চোখ বুজিয়া বাঁধা-নিয়মে শুধুই বঙ্গডুমুরের রস ব্যবহার না করিয়া অবস্থা বিশেষে ছোট ডুমুরও প্রয়োগ করা উচিত । মনে করুন, যদি মেহাদি রোগের সহিত জীর্ণজ্বর, কাস, পাণ্ডু, চর্মরোগ, বক্তদুষ্টি প্রভৃতি উপসর্গ থাকে, তবে নিশ্চয়ই বঙ্গডুমুরের রস অপেক্ষা সাধারণ ডুমুরের রসেই অধিক উপকারের সম্ভাবনা ।

মেহ, বহুমূত্র, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, শ্বেতপ্রদর ও রক্তপ্রদর রোগে বঙ্গডুমুর উপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ । কবিরাজগণ উক্ত রোগ সমুদায়ে রোগীকে বঙ্গডুমুর পথ্যরূপে ব্যবস্থা দেন ; এবং ব্যবস্থের বটিকা চুণাদি ঔষধের অল্পপানার্থ বঙ্গডুমুরের রস ব্যবস্থা করেন । বস্তুতঃ উক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ ঐ ডুমুর যখন যে ভাবেই ব্যবহার করুন, উপকার পাইয়া থাকেন । ইহা তাঁহারা ছাল ও বীজ ফেলিয়া চাকা-চাকা করিয়া কাটিয়া মিশ্রিত গুঁড়া সহ নানাস্তে জল খাবার করিতে পারেন ; ভাতে দিয়া, স্নাতে ভাজিয়া, ঝোলে, তরকারীতে—নানারূপে ব্যবহার করিতে পারেন । বঙ্গডুমুরের মোরকবাও

হইয়া থাকে ; ইহা বড় সুখাতু, কিন্তু প্রস্তুত করিবার সময়ে ইহার রস নিংড়াইয়া ফেলা হয় বলিয়া ইহা কিঞ্চিৎ হীনগুণ হইয়া থাকে ।

যজ্ঞডুমুরের হালুয়া—বড় উপকারী, ইহা প্রস্তুত করিবার বিধি এই,—যজ্ঞডুমুর অল্পক অবস্থায় কিঁকে-সবুজ থাকে, পাকিবার আগে (ডাঁসা অবস্থায়) আরো কিঁকে ও একটু হরিদ্রাত হয় । 'ত্রৈলপ্য' ডাঁসা যজ্ঞডুমুর সংগ্রহ করিয়া ছেঁচিয়া বা কাটিয়া বীজ ফেলিয়া দিবে, এবং কিয়ৎক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে । পরে ঐ ডুমুর উঠাইয়া শিলায় উত্তমরূপে বাটিয়া লইবে ; উননে কড়াই চড়াইয়া তাহাতে গব্যঘৃত দিয়া এই বাটা ডুমুর কিয়ৎ পরিমাণে জাজিয়া লইয়া, একটু রস টানিয়া গেলে উর্হাতে ছাগদুগ্ধ দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে—পরে পরিষ্কার চিনি মিশাইয়া এবং ছোট এলাচ, তেজপত্র ও দাক-চিনির স্নান শুঁড়া দিয়া পুনরায় নাড়িতে নাড়িতে 'খসুথসে' মত হইলে নামা-ইয়া রাখিবে ; শীতল হইলে খাওয়া উচিত । প্রতিদিন নূতন করিয়া প্রস্তুত করা ভাল ; একটু কড়া-পাক করিলে ৩৪ দিন পর্য্যন্ত থাকে, তাহাতে গুণের হানি হয় না । এই হালুয়া খাতুদৌর্বল্য, বহুমূত্র ও ক্ষয়রোগীর পক্ষে অমৃতবৎ । প্রতিদিন বৈকালে অল্প 'জলখাবার' পরিবর্তে এই হালুয়া আহার কর্তব্য ।

যজ্ঞডুমুরের সরবৎ—যজ্ঞডুমুর পাকিলে সুন্দর লাগরণ ও মিষ্টাস্বাদ হয় । ইহার একটা দোষ এই যে, পাকিবার দু'একদিন পরেই উহার মধ্যে পোকা গড়ে, সুতরাং টাটুকা-পাকা যজ্ঞডুমুর সংগ্রহ করিতে হয় । অতিপক ডুমুরের পোকা ফেলিয়া দিয়া লইলেও হানি নাই (এ পোকা বিবাক্ত নয়, তবে ঘৃণা বলিয়া অনেকের অকরচিকর হয় ।) পাকাডুমুর বেশ নরম হয়, বীজ ফেলিয়া দিয়া একটা প্রস্তর পাত্রে উত্তমরূপে চটুকাইয়া উহাতে ছানার জল বা ঘোল দিয়া গুলিবে ; পরে কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে । ইহাতে অল্প কেওড়ার জল বা গোলাপজল দিতে হয় । এই সরবৎ বায়ুপিত্ত অজীর্ণ ও রক্তপিত্ত রোগীর বিশেষ উপকারী । সরবৎের দিনে সহজ শরীরে এই সরবৎ পান করিলে শরীর স্নিগ্ধ থাকে । পশ্চিমদেশে বাজারে খুব বড় বড় পাকা যজ্ঞ-ডুমুর বিক্রীত হয়, তথায় এই সরবৎের বড় আদর । শুধু পাকা যজ্ঞডুমুরের রস একটু মধু মিশাইয়া খাইলে রক্তপিত্তরোগীর সমধিক উপকার হয় ।

(১) যজ্ঞডুমুরের মূলের ছাল ছেঁচিয়া তাহার রস াঁচা ও যজ্ঞডুমুরের

শুক বীজ চূর্ণ ১/০ আনা একত্রে দিনে ৩ বার সেবন করিলে মেহের স্রববৎ-
 শ্রাব ও মূত্রাধিক্য এবং স্ত্রীলোকের শ্বেত প্রদর^১ আরোগ্য হয়। (২) যক্ষ-
 ডুম্বরের ছালের কাথে ঘোনি ধোত করিলে, স্ত্রীলোকের স্রব^২ আরোগ্য হয় ;
 শরীরের অস্থানের ক্ষতেও এই ধোতি উপকারী। (৩) ডাঃ স্যাটকিন্সন
 বলেন “ইহার পাতার উপরে খেঁ মসুরের মত উৎপন্ন হয়, তাহা বাটিয়া দিলে
 বসন্তরোগের ব্রণ গভীর ও দূষিত হইতে পারে না।” (৪) তিল-তৈলের
 সঙ্গে যক্ষডুম্বরের আঠা কেনাইয়া দিলে পোড়া-ঘা সারে। (৫) ম্যাকান
 সাহেব বলেন—“ডুম্বর গাছে অনেক সময় লাক্ষাকাট অবস্থিতি করে।” এই
 গাছের লাক্ষা রক্তপিত্ত ও বস্মার ফলপ্রদ। যক্ষডুম্বরের আঠায় পাথী ধরিবার
 একপ্রকার আঠা প্রস্তুত হয়।

রক্তপিত্তরোগের ‘উশীরাসব’ বহুমূত্রের ‘কদল্যাঙ্গি ঘৃত’ ও প্রসিদ্ধ অমৃত-
 প্রাশ ঘৃত, প্রভৃতি ঔষধে যক্ষডুম্বর আবশ্যক হয়।

এরও ।

বাঙ্গালা—রেড়ী বা ভ্যারাণ্ডা ; হিন্দী—রেটী ; ইংরাজী—Castor oil
 plant. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—শুক্ল এরও আমগুণ্ঠিত্রো গন্ধর্ষহস্তকঃ । বাতারি
 স্তরুণশ্যপি কুব্জশ নিগদ্যতে । রজ্যেহপরো কুব্জঃ স্তাদুকুব্জো কুব্জখা ।
 ব্যাঘ্রপুচ্ছ বাতারি শঙ্খ উত্তানপত্রকঃ । সংস্কৃত নাম—শুক্ল এরও, আমগু,
 চিত্র, গন্ধর্ষহস্তক, বাতারি, তরুণ, কুব্জ ; (অপর) রক্ত এরও, কুব্জ, উকুব্জ,
 কুব্, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চঙ্খ, উত্তানপত্রক । এরওের অত্যন্ত নাম—ত্রিপুটী
 ফল, পঞ্চাঙ্গুল, শূলশক্র, বর্ধমান, কাস্ত, চিত্রবীজ, ইষ্ট, স্নেহপ্রদ ।

এরও গাছ অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন । ইহা মানুষের মত উচ্চ,
 স্থান বিশেষে, মানুষের দেড়গুণ বা দ্বিগুণ উচ্চ হয় । পাতা মানুষের হাতের
 খাবার মত, পাঁচ ছয়টা শির বাহির করী, ঐ শির বেধানে শেব হইয়াছে
 সেখানে ক্রমে সৰু হওয়ার পাতার চোছারা খাঁজ-কাটামত । ইহার শুভ্রী-
 কাঠ হুঁত্বিন অঙ্গুলী মোটা ও বড় হালকা, ডালগুলি ফাঁপা ; এই বৃক্ষকে
 সংস্কৃতকবিয়া অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাই এই উক্তি—“নিরস্ত-
 পাদপদেশে এরওপি ক্রমায়তে” অর্থাৎ যে দেশে বৃক্ষ নাই, সেখানে রেড়ী-

গাছ ও পাহাছ বলিয়া গণ্য হয়। এরূপ গাছ, শাদা ও লালভেদে দুই প্রকারের আছে, লালগাছগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়, গাছ ঘোর লালবর্ণ নহে, কেবল লালের আভাযুক্ত। হইএরূপে যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

শ্বেত এরণ্ডের গুণ ।

শ্বেতোরুবকঃ কটুক তীক্ষ্ণশোকাঙ্কো গুরু শুধা।

মধুর তিক্তকো বৃষ্যো স্বাদুপাকঃ সরঃ স্মৃতঃ ॥

বাতোদাবর্তকফহং জরকাসোদরাপহঃ ।

শোথশূল কটীবস্তি শিরোরুগ্ণ নাশনঃ স্মৃতঃ ॥

খাসানাহ কুষ্ঠ ব্রণ গুল্ম প্রীহামপিত্তহা।

প্রমেহোক্ষবাতরক্ত মেদোহস্তবর্দ্ধন প্রণুৎ ॥

শ্বেত এরণ্ডের রস—কটু-মধুর-তিক্ত ; বিপাক—মধুর ; বীৰ্য্য—উষ্ণ ; গুণ—তীক্ষ্ণ, গুরু, বায়ুনাশক, উদাবর্ত (বায়ুতে পেটের ভিতর উর্দ্ধদিক্ টানিয়া রাখা, তাহাতে কিছুতে বাহে প্রস্রাব হয় না), কফহর, জ্বর, কাস, উদর রোগ, শোথ ও শূল প্রশমক, কটী, বস্তি ও মস্তকের ব্যথা নাশক ; খাস, আনাহ, কুষ্ঠ, ব্রণ, গুল্ম, প্রীহা ও আমল (সঞ্চিত আম নিষ্কাশিত করে) পিত্তনাশক, উষ্ণতা (দেহের জ্বালা বা উত্তাপ) নিবারক, বাতরক্ত, মেদ ও অন্নবৃদ্ধি হারক। প্রভাব—প্রমেহ নাশক, বৃষ্য।

রক্ত এরণ্ডের গুণ ।

রক্তোরুবক জ্বরো রসে কটুর্লবুঃ স্মৃতঃ ।

তিক্তো বাত কফ খাস কাস ক্রিম্যর্শো ব্রণহা ॥

রক্তদোষ পাণ্ডুরক্ত প্রান্ত্যরোচক নাশনঃ ।

প্রায়স্তু গুণাশ্চান্ত শ্বেতবচ্চ সমীরিতাঃ ॥

রক্ত এরণ্ডের রস—কটু-তিক্ত-কষায় ; বিপাক—কটু ; বীৰ্য্য—উষ্ণ ; গুণ—লবু, বাতকফহর ; খাস, কাস, ক্রিমি, অর্শ ও ব্রণ নাশক, রক্তদোষ, পাণ্ডুরোগ ও অরুচি হারক ; শ্বেত এরণ্ডের অন্ত্যন্ত গুণও ইহাতে আছে ; প্রভাব—ত্রাস্তি (ত্রসী বা শিরোগুর্ধন) নিবারক।

স্ত্রীজাতির গুণ

আমরা কিয়দ্দিন পূর্বে স্ত্রীজাতির কতকগুলি দোষ ঋষির পাঠিকাগণকে দেখাইয়াছি, এক্ষণে স্ত্রীজাতির কতকগুলি গুণ পাঠিকা ভগিনীগণকে উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। স্ত্রীজাতির গুণ গুলি স্মৃত্যু, এই অমূল্য গুণাবলীতে অলঙ্কৃত। বলিয়াই হিন্দু-সংসারে রমণী দেবীবৎ পূজনীয়া। কিন্তু পূর্বে যে দোষগুলি দেখাইয়াছি, তাহাও বড় ভয়ানক। সেই দোষ গুলির জন্তই অনেক-সংসারে স্ত্রীজাতিকে দেবীর পরিবর্তে প্রেতিনীরূপে দেখিতে পাই। সেই দোষ গুলি সংশোধিত করিয়া রমণী বাহাতে নিজ দেবী নামের গৌরব রক্ষা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা সকল রমণীরই কর্তব্য। এক্ষণে দেখান বাউক স্ত্রীজাতিতে কি আছে।—

যে অমূল্য প্রেম রত্নের শীতলস্পর্শে জীব জুড়ায়, ধুলু হর, হিন্দুরা বাহাকে বলেন “বাহা বই সুনির্মল দ্বিতীয় নাহি আর” সেই পবিত্র প্রেমরত্নের আবাস-ভূমি রমণী হৃদয়। রমণী-হৃদয় প্রেমের প্রস্রবণ, তাই ত্রীগোরাঙ্গ রাধাভাবে অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃতি সাজিয়া জীবকে শ্রীভগবৎ সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। এ জগতে স্ত্রীজাতি না থাকিলে কেহই প্রেমের পবিত্র সন্মিলনানন্দ উপভোগ করিতে পারিতেন না। উহা কবির কল্পনার পরিণত হইত মাত্র। স্ত্রীহৃদয় স্বর্গের আলোকে প্রভাসিত। লম্পট সুরাপায়ী পতি, অবিরত অনাদর অপমান লাঞ্ছনা বরণায় সন্মুখা সহধর্মিণীর হৃদয় ভাঙিয়া দিতেছেন, সর্বস্ব ব্যয় করিয়া বারবিলাসিনীর চরণ রূপ মহাবৈতরণী পার হইতেছেন, তবুও স্ত্রীজাতি সর্বজন-দুগ্ধ্য সেই স্বামীকে অশ্রদ্ধা করেন না। তবুও সেই মুখখানি চাহিয়া তাঁহার আত্মহারা হন। সেই কুক্রিয়াসক্ত পতির একটু মাথা ধরিলে, তাঁহার জগত অন্ধকারময় দেখেন, তাঁহার মঙ্গলের জন্ত কত দেব দেবীর নিকট প্রতিনিয়ত মাথা কুটিতে থাকেন। স্ত্রীজাতি সর্বাবস্থাতেই জানেন “পতিরেক গতিঃ সদা”।

সন্তান পালন স্ত্রীজাতির একটি বিশেষ গুণ। সন্তানের মঙ্গলার্থে স্ত্রীজাতি না করিতে পারেন এমন কোন কার্যই নাই। কুক্রিয়াসক্ত পুত্রের চরিতে বিরক্ত হইয়া পিতা পুত্রকে নানারূপ নির্মাতন করিতে লাগিলেন, সেই পুত্র-

কেই স্নেহময়ী জননী "বাধুধন" বলিয়া বৃকে টানিয়া লইয়া রমণী হৃদয়ের অসীম স্নেহবস্তা দেখাইয়া, দীর্শকের চিত্ত বিমোহিত করেন। সন্তানের কিকিয়াত্র পীড়ার সূক্ষ্ম হইলে অক্ষুণ্ণ ন্যূনে পীড়িতের শিরোদেশে বসিয়া অনবরত শুক্রবা করিতে একমাত্র জননীই সক্ষম। 'জননী আছেন বলিয়াই ভগত পালন হইতেছে, বলিতে গেলে জননী ভগদাত্রী-স্বরূপা। এই ভক্তই "মাতা স্বর্গাদপি গরীরসী"। যে মাতা ভগদাত্রী-স্বরূপা সেই মাতা স্ত্রীজাতি। সুতরাং বলিতে হয় স্ত্রীজাতির গুণেই বিশ্বময়ের বিশ্বরাজ্য চলিতেছে।

আধুনিক কর্তারা ভৃত্যবর্গকে কুকুর বা তরুপেকা কোনও নিকৃষ্ট জীব বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু গৃহিণীরা ঠিক তাহার বিপরীত ভাবে দাসদাসী-গণকে প্রতিপালন করেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে মাতার স্তায় স্নেহদান করিয়া তাহাদিগের যত্নগার লাভব করিয়া দেন; স্ত্রীজাতির স্নেহ কারুণ্যেই তাহারাজীৱ পরাধীনতা-সুখলাভ হইয়াও সুখস্বাচ্ছন্দ্য পরগৃহ বাস করিতে সমর্থ হয়।

যারে অতিথি উপস্থিত হইলে কর্তাদিগের ব্যবহার অনেক স্থলে স্ত্রীর বদলে স্ত্রীর ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রীজাতি কত আদর যত্নের সহিত অতিথির সন্তোষ বিধান করেন। শাস্ত্র পুনঃপুনঃ অতিথি সেবার আদেশ দিয়াছেন, স্ত্রীজাতিও বলেন "অতিথি রুষ্ট হইলে সর্বনাশ হয়"। "রমণীজাতির ধর্মপ্রাপতাই জ্ঞানিও হিন্দুধর্মকে জীবিত রাখিয়াছে। জ্ঞানিও যে হিন্দু-সংসারে অতিথি সেবা, ভগবৎ সেবা, গুরু ব্রাহ্মণ বৈকবে ভক্তি দেখিতে পাওয়া যার তাহারও কারণ স্ত্রীজাতির গুণ। ধর্মপ্রাপতাই সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। যে হৃদয় ধর্মভাবহীন সে হৃদয় নিকৃষ্ট জীব অপেক্ষাও ঘৃণিত। যোর স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা হইতেই সমাজে অশান্তি-অনল ধ্বংসক অলিয়া উঠিয়া পরিণামে সেই অনলে সকলে দগ্ধ হয়। নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সমাজের ইষ্টানিষ্টের দিকে চাহিয়া দেখিবার বড় একটা সময় পান না, তাহার পশ্চাত্ত্য স্ত্রীতিনীতি অনুকরণের জন্য স্বতঃই ব্যস্ত। প্রত্যেক প্রদেশের রুচি ও রীতিনীতি বিভিন্ন। এক দেশে যে আহার্য্য স্বাহ্যকর; অন্য দেশে তাহাই অস্বাস্থ্যকর হইতে দেখা গিয়াছে, এইরূপ প্রতিকার্য্যেই এক দেশের সৃষ্টি অন্য দেশের বিভিন্নতা আছে ও তাহা থাকা স্বভাবসিদ্ধ তাহা কেহ বুঝেন না। তাহার কারণে বিধবা বিবাহ ও ঘোবন বিবাহ প্রচলিত করিবেন, সেই

চিন্তাতে তাঁহারা সর্বদা অর্জুনিত । এখনও কচিং “অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী
নব বর্ষে চ রৌহিনী” যে দেখা যায় তাহা স্ত্রীজাতির ধর্মপ্রাণতারই পরিচয়
মাত্র । আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্ত্রীজাতির হস্তে স্বাধীনতার জয়পতাকা
ফুলিয়া দিয়া কিরূপে ভারতের মুখোজ্জল করিবেন, তাঁহারা সর্বদা সেই
চিন্তাতে অস্থির । তাঁহাদের কল্পনা যতই দুর্য্যোগে পরিণত হইতেছে, সমাজ
ততই অশান্তিময় হইয়া উঠিতেছে । কিন্তু এই ক্ষুধিনেও স্ত্রীজাতির গুণেই
এখনও হিন্দুসমাজ টিকিয়া আছে । বায়ুবিভাড়িত তরণীর নাবিকের ভ্রম
এখনও ধর্মপ্রাণতা রক্ষু দ্বারা উচ্ছ্বল সমাজরূপ মত্ত হস্তীকে স্ত্রীজাতি,
অতি সতর্কতার সহিত ধরিয়৷ আছেন । এখনও যে দীন দরিদ্র-পালন,
ব্রাহ্মণসঙ্কনদিগকে দান, স্বামী শ্রীবন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে গমন হইতেছে
তাহাও স্ত্রীজাতির গুণ । এই বোয় বিপ্লবের সময়ও স্ত্রীজাতির গুণেই
এখনও মানবহৃদয়ে ধর্মের ছায়া নিপতিত রহিয়াছে ।

কোনও ইংরাজ মহাপুরুষ স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন “স্ত্রীলোক ধীরভাবে
প্রত্যহ যে যন্ত্রণা সহ করে, পুরুষদিগকে যদি তাহার শতাংশের একাংশ সহ
করিতে হইত, তবে তাঁহারা পাগল হইয়া যাইতেন । তাহার অবিশ্রান্ত-
দাসত্বের কোন পুরস্কার পায় না । অবিচল ধীরতা, সহনশক্তির বিনিময়ে
সর্বদা নিষ্ঠুর ব্যবহারই লাভ করে । তাহাদের ভালবাসা, পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা,
সতর্কতা, এমন কি একটা ভাল কথাও দ্বারাও স্বীকৃত হয় না ।” কত স্ত্রীলোক
এই সকল স্থির ভাবে সহ করে এবং বাহিরে প্রফুল্ল ভাব দেখায় যেন তাহাদের
প্রাণে কোনই কষ্ট নাই” । বস্তুতঃ এবিধাচরণ একমাত্র স্ত্রীজাতিতেই
সম্ভবে ।

দয়া, মমতা, স্নেহ, ভালবাসা, দীর্ঘরে শ্রীতি, পরলোকে বিশ্বাস প্রভৃতি
মহাত্ম গুণাবলীর স্ত্রীজন্যে বেরূপ একাধিপত্য সেরূপ আর কোথাও নাই ।
অনেক স্থলে দেখা যায় কোন দীন খাতক বা প্রজা তাহাদের দেয় প্রদান
করিতে না পারিয়া খাতক বা জমীদারের কোপানলে পড়িয়া সর্বস্বাস্ত হইবার
শেষ সীমান উপস্থিত হইয়াছে, তৎকালে সেই বাটীর গৃহিণীর অশ্রুকম্পাতেই
সে দায় উদ্ধার হইয়াছে ।

কোন শত্রু পক্ষের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে, রমণী আত্মীয় সঙ্ঘিত শত্রুতা

বিস্মৃত হইয়া দিনে দশ বার খুবরু লইয়া থাকেন । পীড়িতের সেবা করিতে জীভাতি স্বতঃই মুক্তপ্রাণ । এমন কি বাহার সহিত কখনও পরিচয় নাই ঈশ্বর দীন বৃক্ষতল-শায়ী পীড়িত-পথিকের নিকট জীভাতিকে স্থানীতল পানীর-পাত্র হস্তে উপস্থিত হইতে দেখা যায় ।

শাস্ত্র বলেন “শ্রীরেব জী ন সংশয়ঃ” । যে মর্সারে জী নাই সে সংসার কত বিশৃঙ্খলাময় তাহা বোধ হয় সহজেই সকলে অনুমান করিতে পারেন । দুঃখের বিষয় আধুনিক শিক্ষা বলে দেবীবৎ এই অতুল্য হৃদয় খানিও পুরুষের কঠিন চরিত্রানুকরণ করিয়া কলঙ্কিত হইতে বসিয়াছে । আমাদের বিনীত নিবেদন, ভগিনীগণ ! বিদেশীয় রীতিনীতির অনুকরণ না করিয়া, প্রাচীনা আর্ধ্য-মহিলাগণের চরিত্রানুকরণে যত্নবতী হও, তাহা হইলে আবার ভারত-ভাগ্যে সৌভাগ্যরূপি উদিত হইয়া তাহাকে প্রভাসিত করিবে, ভারত আবার সীতা-সাবিত্রীর ছবি অঙ্কে লইয়া ধন্ত হইবে । নিজ জাতিতে রত্ন থাকিতে পর দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাওয়া নিশ্চয়ই ঘৃণা ও মূর্খতার বিষয় । হিন্দু সংসারে রমণীই “শ্রী”, (লক্ষ্মী) এই জন্তই হিন্দু সংসারে রমণী দেবীবৎ পূজনীয়া । রমণীর আদর হিন্দুজাতি যেমন বুঝিয়াছেন এমন আর কোনও সমাজে কোনও জাতির মধ্যে কেহই বুঝেন নাই । তাই বলি ভগিনীগণ এ হেন অতুল্য গুণরাশি নষ্ট করিয়া নিজের গৌরব হারাইও না । নিজ নিজ দোষগুলির সংশোধন পূর্বক গুণরাশির বিকাশ করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল কর !!!

মর্সগাথা ও প্রেমগল্পা রচয়িত্রী—বোলপুর ।

পতি-দেবতা । (পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এখন বেক্রপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার ফলে রমণীরা বুঝে যে, “শ্রীলোকও মানুষ, আর পুরুষও মানুষ, তাহারা উভয়েই এক ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রাণী, অথচ কেবল পুরুষেরাই যে সকল পার্থিব সুখ ভোগ করিবে আর তাহারা তাহাতে বঞ্চিত হইয়া পুরুষের সুখ দুঃখের উপর নিজ সুখ দুঃখ নির্ভর করিয়া থাকিবে ইহা কখনই পরম কাকণিক সমদর্শী জগৎপিতার অভিপ্রায় হইতে পারে না ।” পুরুষগুলা তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়া দমনে রাখিবার জন্তই এইরূপ একটা নিয়ম করিয়া লইয়াছে, অতএব একেবারে “ভাতারের দাগী

হয়ে থাকি কি পোষায়? এখন তাহারা বুঝিয়াছে—‘স্বামীও বা’ জীও তা’ । এখন তাহারা স্বামীকে কি নারায়ণ বলিয়া ভাবিতে পারে ? না, স্বামীর হুকুমটার অপেক্ষা করিয়া রাজা মহোৎসব না দেখিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে পারে ? আর রাজামহোৎসব দেখিলেই কি জীলোকের সব যায় ? জীলোক কি এতই হতভাগা জাত? স্বামীর কথায় উত্তর না দিয়া কি এখন ঘেরেরা থাকিতে পারে ? এখনকার কালে কি আর তা চলে ? সেকালের মাগীগুলো দাঁতে মিসি, নাকে নখ, পায়ে আলতা, ও ছেলের মা হ’লেও মাথার এক হাত ঘোমটা দিত, কাজেই তাহাদের পক্ষে ও সকল শোভা পাইত, কিন্তু এখনকার কালে তা’ চলে কি ? এখন এরা শিখছে যে দম্পতী একটা বোটায় দুটি ফুল, তাহাদের মধ্যে আবার উচ্চ নীচ কি, সজ্জন অসজ্জন কি ? একজনের উপর আর একজন প্রভুত্ব করিবে, আর একজন নীরবে তাহা সহিয়া যাইবে, তাহা হইলে কি একপ্রাণতা জন্মে ?

বেখানে ভয় ও মাংসের সহক, গুরুজনের জ্ঞান ব্যবহার, সেখানে কি ভালবাসা—প্রাণে প্রাণে মিশামিশি ভালবাসা—দাঁড়াইতে পার ? বরং উত্তরে উত্তরকে সম্মান চক্ষে দেখিয়া সমান ভাবে চলিতে পারিলে সমানভাবে হৃদয়ে হৃদয়ের ভালবাসা পাইবে। স্বামী রাগিয়া তাড়না করিলেও জীতে কথা কহিতে পাইবে না, এরূপ একটা পক্ষপাতপূর্ণ নিয়ম সেকালে ছিল, আর মাদ্রীগুলার জ্ঞানবুদ্ধি থাকিতে তাহাই মানিয়া চলিত, এ কথা এখন কেহ বিশ্বাসই করিতে পারে না। স্বামী স্বচ্ছন্দে জ্ঞান অজ্ঞান হু কথা বলিয়া যাইবে আর জীলোকে রক্তমাংসের শরীর লইয়া তাই সহ করিয়া থাকিবে, এ কি হয় ! দুটা মুখের কথা কহিয়া স্বামীকে বুঝাইবে না, কি নিজের নির্দোষিতা দেখাইয়া দিবে না ? সেকালে নিয়ম ছিল, পতি দোষ করিলেও পতিকে কিছু বলিতে পাইবে না, যদি পতির অত্যাচার সহ করিতে অশক্তি হয়, তাহা হইলে প্রাণত্যাগ করিবে তবু পতিকে কিছু বলিতে পাইবে না।—এখন এ শিক্ষা কোথায় ? এখনকার কালে এ শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইয়া দেয় এমন শিক্ষকই বা কোথায়—এ রকম আজগুবি নিয়ম যে এক সময়ে প্রচলিত ছিল, আর লোকে তাহা পালন করিত, তাহা হয় ত এখন মাথা কুটিয়া ফেলিলেও কোন রমণীর ধারণাই হইবে না।—এখন ইহা বলিতে

শিখিরাছে, বাপ্ রে ! এমন স্বামী-মাথার থাকুন, স্নানকার কাজনেই স্বামীর ভাত খেয়ে! জীব দিচ্ছেন বিনি, আহার দেখেন তিনি।—ইত্যাদি।—
অবশ্য একালে যে সকলেই একরূপ করে, এমন নয়; তবে শিক্ষার দোষে অধিকাংশের প্রাণে স্বাভাবিক শ্রিততা ও স্বাবলম্বনের, তাই কেনী আশিষ্টা উঠিয়াছে, ইহা ঠিক।

সেকালের রমণীরা কিরূপে "পতি-দেবতা"র শুশ্রূষা করিতেন ও তাহার কল কঁতটা আশা করিতেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত হইল :—

মারদ বমকে পতিব্রতার ধর্ম জিজ্ঞাসা করায়, বম বসিতেছেন "হে বিপ্র ! হে মহামতে ! পতিব্রতা নারীর নিয়ম, তপস্কা, উপবাস, দান ও দম নাই (অর্থাৎ স্বামীসেবাই তাঁহাদের ঐ সকল বিস্ময়ের কল দিয়া থাকে।) হে বিপ্র ! পতিব্রতা নারী বেকরূপ ব্যবহার-যুক্তা হইয়া থাকেন, তাহা শুন।—
পতিব্রতা, স্বামী নিজ্যাগেলে পর নিজে নিজ্যা জন, স্বামী আশিষ্টেই আগরিতা হন, স্বামীকে ভোজন করাইয়া শেষে নিজে ভোজন করেন, কাজেই তিনি বমকে ভয় করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহার বমস্বতনা হয় না। পতি নিশুক থাকিলে পতিব্রতা নিজে কথা কহেন না; স্বামী থাকিলে, তিনি থাকেন; হে বিপ্র ! কাজেই তিনি বম ভয় করিয়া থাকেন, নারীগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা বমস্বতনা এড়াইবার সহজ উপায় আর কিছু দেখিতেছি না। পতিব্রতা রমণী (পুরুষের মধ্যে) পতিকেই দর্শন করেন, পতিতেই তাঁহার মন নিযুক্ত থাকে ও পতির আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া থাকেন, হে তপোধন ! আসিয়া এইরূপ পতিব্রতাকে ভয় করিয়া থাকি, অস্ত্র সকলেও ভয় করে; এরূপ পরম শোভনা সাক্ষী, দেবতাগণেরও পূজ্যা। পতি যদি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে পতিব্রতাকামিনী প্রণতি পূর্বক (মস্তকাবে) তাহার উত্তর দিয়া থাকেন। হে বিপ্রোজ ! পতিব্রতারমণী যদি পতির নিকটে থাকিয়াও তৎকর্তৃক পরিত্যক্তা হন তবুও তিনি পতিকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন কখনও অন্তকে, আশ্রয় করেন না। পতিব্রতারমণী একান্ত ভক্তিতে স্বামীর অনুগতা থাকেন, কাজেই হে ব্রহ্মনন্দন ! তাঁহাকে কমাগরে আশিষ্টে হয় না। এইরূপে যে রমণী পতিশুশ্রূষা করিয়া থাকেন তিনি আমাকে ভয় করিয়া থাকেন, আর তাঁহার নিকট আমাকেও কৃতাজলি হইয়া

খাঙ্কিতে হয়। বে রমণী স্বামীকে খান. করেন, তাঁহার অহুগতা থাকেন, এবং তাঁহার বিবরণই আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে বমালয়ে আসিতে হয় না। পতিব্রতা (পতি কথা বা পতি রূপ-ব্যতীত) গীত, বাহ্য নৃত্য ও অভ্যন্ত দর্শনীয় বৃত্ত ঠমেন না বা দেখেন না সুতরাং তাঁহাকে বমালয়ে আসিতে হয় না। পতিব্রতা রমণী যখন জান করেন, কেশসংস্কার করেন বা অস্ত্র কর্ণে নিবৃত্তা থাকেন, তখনও মনে মনে অস্ত্রের কথা চিন্তা করেন না। দেবতার্জনকালে বা এক্ষণ ভোজন করাইবার সময়েও পতিব্রতারমণী পতিকে চিত্ত বহির্ভূত করেন না সুতরাং তাঁহাকে বমালয়ে আসিতে হয় না। হেতুপোধন! যে নারী স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহ-সার্জন্য করেন তাঁহাকে বমালয়ে আসিতে হয় না। বে রমণীর চক্ষু, দেহ ও স্বভাবসংবৃত্ত হয় অর্থাৎ বাহার চক্ষু পতি তির অস্ত্র পুরুষকে দেখেনা, বাহার দেহ পতিতির অস্ত্রপুরুষে দেখিতে পার না ও বাহার স্বভাব পতি-তির অপরে বৃদ্ধিতে পারে না সে সদাচারিণী রমণীকে বমালয়ে আসিতে হয় না। যে নারী পতিরই মুখ দেখিয়া থাকেন (অপরের দেখেন না), পতির মনোমত কার্য করিয়া থাকেন, এবং স্বামীর মঙ্গলকার্যে নিবৃত্তা থাকেন তাঁহাকে বমালয়ে আসিতে হয় না। হে বিপ্র! পতিব্রতার এই সকল কার্য কলাপ ও নিয়মাদি আমি পূর্বে স্বর্ঘ্যোদয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম এক্ষণে সেই গোপনীয় পতিব্রতা চরিত্ত তোমাকে কহিলাম সকল ধর্ম্মাপেক্ষা রমণীর পক্ষে এই পতিব্রত্যধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি পতিব্রতাকে দেখিলেই পূজা করি।”

এইত শ্রুত্ব যমের কথা। এ কথার বিশ্বাস না করিবার অস্ত্র কোন কারণ দেখিতে পাই না কিন্তু বিশ্বাস করিবার কারণই যথেষ্ট আছে, কারণ যিনি বমালয়ের অধিবর নরকাদি দণ্ডদাতা তিনিই শ্রুত্ব নারদকে বলিতেছেন যে এই সকল কার্য করিলে রমণীকে বমালয়ে আসিতে হয় না — ইহা অপেক্ষা অন্তর বাক্য আর কি হইতে পারে? সেকালেও রমণীরা বৃদ্ধিত, এ কথার বিশ্বাস করিত-কালেই তাহারা এরূপ কার্য করিয়া হিন্দুর সংসার সুখের-সংসার করিয়া তুলিয়াছিল।

(ক্রমঃ)

শ্রীব্যোমকেশ সুস্তম্বী ।

সদাই মনে রেখো ।

মাকে ছুঁইয়ে কোনো ফুল উচিত নয়কো পোকা ।
নারকের তিতর ঢুকতে পারে ফুলের মাঝেয় পোকা ।
মুখের খুঁত দিয়ে বইয়ের উল্টাইওনা পাতা ।
অজানা বিষ থাকলে কিছু বড়ই ভয়ের কথা ।
ছুরী কাঁচি কথার ভুলে; দিওনাক মুখে ।
কাণে কাটা দিবার সময় যায়না যেন ঢুকে ।
পরের বাড়ী যেতে দেখো চোকাই উঁচু নীচু ।
অজানা পথ যেতে হলে যাওয়া জল পিছু ॥
ভিজা বস্ত্রে অনেকক্ষণ থেকে নাক বসে ।
নিমন্ত্রণের বাড়ী কতু খেয়োনাক ঠেসে ।
গাঁড়ী হতে নামিবে বা উঠিবে যখন ।
দেখো যেন নাহি ঘটে দৈব ছর্ষটন ॥
খেতে বসে হলে পরে অধিক অশ্রমনা ।
বিষম্ লেগে কষ্ট পাবে স্বাদও বুঝিবে না ।
শোবার আগে বিছানাটি ভাল করে দেখো,—
চট করে ছিত্ হওয়া দোষ সদাই মনে রেখো ॥

অগ্নি পরীক্ষা ।

দূরে ওই কে সতী রমণী, পতি পাশে দাঁড়া'য়ে নীরবে ?
বিনত কপোল-পরে, শত অঁধি-নীর ঝরে,
হৃদয়ের ব্যথা কত, অবলা কেমনে ক'বে !

চারিদিকে অনতা প্রচুর, দূরে রহে বাহক-শিবিকা,
সম্মুখে দেবর-পতি ; চিন্তায় আকুল সতী,
হৃদয়ে নিরাশ-বহি দেখাই'ছে প্রহেলিকা !

পতি-মুখে, জনক-ছহিতা, ভীম রব শুনিলা আবার,—
 “রাক্ষস-আবাসে রহি, এতকাল গেল বহি”,
 বুঝাও কেমনে, সীতা! বহিঙ্গে সতীত্ব-ভাৱ ?

“কহ এবে, নাশিষ্ঠে সংশয়, আছে তব কোন্ নিদর্শন ?
 নাহি পারো—যাও ফিরে, মিছে ভাস অশ্র-নীরে,
 করিওনা, মায়া-মোহে, আর তিক্ত এজীবন।”

সেই বাণী বজ্রনাদ সম, মৈথিলীর পশিল মরমে ;
 কাতর সরলা বালা, নিরাশায় বাড়ে জালা ;
 স্তব্ধ যত সতীসদ, শোক-অশ্র সমাগমে ।

কহিলেন রঘুপতি পুনঃ— “বুধা বহ কি চিন্তা হৃদয়ে ?—
 নাহি যদি নিদর্শন, মিছে অশ্র বিসর্জন,
 অনলে পরীক্ষা দেহ, নহে তা’র বিনিময়ে !

“ওই জলে বিকাশি’ রসনা, বহিরাশি অনন্ত হৃতাশে,
 পরীক্ষার স্থল সীতা, তব তরে ওই চিতা ;
 আজি তব ভাগ্যা-লিপি গ্রথিত, অনল পাশে !”

শুনি, বাণী এহন কঠোর, রহে সবে নীরব-বিবাদে,
 কি ভীত বিবাদ-রেখা, চারিদিকে যায় দেখা,
 সবারি হৃদয়ে ভীতি, কি দারুণ অবসাদে !

এ পরীক্ষা নহে ত কখন, রাম-চিত্ত বিনোদন-তরে ;
 নহে কতু জানকীর এ পরীক্ষা, আনি স্থির,
 আজি এ পরীক্ষা শুধু, শিখাইতে চরাচরে ;

দেখাইতে জগত-সাক্ষাতে, সতীত্বের প্রভাব-মহিমা ;
 তাই, ত্যক্ত, অশ্র-নীরে, যান সতী ধীরে ধীরে,
 প্রদীপ্ত সের্গচ্ছা-পাশে, — হৃদে শ্রীতি-মধুরিমা।

স্বামী-পদ সেবিত্তে যতনে, • বেইমত অযোধ্যা নগরী—
শুভ ক'রি হাসি মুখে, • আসিলা মনের সুখে,
হুঃখময় বনবাস, পতি-পদ বৃকে স্মরি ;

আজো সতী তেমনি আফ্লাদে, হৃদে ল'য়ে ত্রেমনি উন্নাস,
সেই হাসিটুকু নিরে, • পতি-পদ রাখি' হিরে,
পশিলা অনল-মাঝে ; 'সবে করে হা,হতাশ !

জলে বহি প্রচণ্ড হতাশে, শিখা উঠে ভেদিয়া গগন !—
দীভা ভার মাঝে থাকি, • অমরের কীর্তি মাথি',
রাখিলা সতীস্ব নাম, উজলিতে ত্রিভুবন ।

রূপতি প্রফুল্ল হৃদয়ে, সমাদরে দিলা তারে স্থান ;
সতী-পূত পদ-পাশে, • চারিদিক হ'তে আসে,
ভক্তি-অঞ্জলি-রাশি, হইতে ভকত-প্রাণ ।

জগতের প্রতি ধরে ধরে, তাই প্রতি হৃদয়ের তলে,
আদিভ্য-কিরণ-মত, • সতীত্বের রশ্মি শত,
আজো গো উজলে ধরা, আজো রহে মর্ম্মস্থলে ।

আজো শুনি তাই শত মুখে, সতীত্বের মহিমা প্রচুর ।
স্বতি-পথ দিগে যেতে, • সতী-গাথা মরমেতে,
কে যেন স্তনার আজো দূর হ'তে কি মধুর !
বাচে হেথা' আজো তাই প্রেমিক-পিপাসাতুর !!

শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী ।

ঋষি :

১ম বর্ষের সূচীপত্র ।

(১৩০৫ সালের আষাঢ় হইতে ১৩০৬ শুল্কের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত)

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
ঋষি-বাক্য ...	১	কোমলে ক্লেণ ...	৫৪
দ্রব্যগুণ-বিচার ...	৩	আয়ুর্বেদ প্রচার ...	৫৭
আয়ুর্বেদে প্রেগের কথা ...	১০	দ্রব্যগুণ-বিচার ...	৫৯
কোশলে উপদেশ ...	১৪	(অগস্তি পুশ্ম, অশুরু, অকোট, অজমোদা, অজশৃঙ্গী, অতসী)	
পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা (পদ্য) ...	১৬	সংসার-নাট্য ...	৬৭
স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ...	১৭	স্বয়ংলক্ষ্মী ...	৬৮
শ্লেগের্গ-সঙ্কট (পদ্য) ...	১৯	বুড়া ঠানুদিদি ...	৭১
তান্ত্রিক পূজার সৃষ্টি ...	২০	লক্ষটাকার এক একটা কথা	৭৩
উন্নতি ...	২১	নবজরে পথ্য ...	৭৩
লক্ষ টাকার একটা কথা ...	২৫	ঋষিবাক্য ...	৭৫
গার্হস্থ্য ধর্মোপদেশ ...	২৫	বিশুদ্ধ বায়ু ...	৭৮
সংসার (পদ্য) ...	২৬	রসায়ন ও বাজীকরণ ...	৮০
ঋষিবাণী ...	২৭	দ্রব্যগুণ-বিচার ...	৮৩
প্রতিঃকৃত্য ...	২৯	(অতিবিষা, অনন্তমূল, অপরাজিতা)	
জল ...	৩৫	অজীর্ণ-অতিসারে পথ্য ...	৯১
দ্রব্যগুণ বিচার (অগস্তি) ...	৩৯	শিষ্যদিগের উপযোগী বিষয়	৯২
কোমলে-ক্লেণ ...	৪১	পরমায়ুঃ ...	৯৫
পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা ...	৪৩	লক্ষটাকার কথা (মণি-রত্নমালা)	৯৬
মৃত্যু শয্যা ...	৪৪	উন্নতি না অবনতি ? ...	৯৮
জগদ্ বশীকরণ ...	৪৭	মা ও মেয়ে ...	১০২
গার্হস্থ্যধর্মোপদেশ ...	৪৮	শ্রী শ্রীচণ্ডী—সমালোচনা ...	১০৪
লক্ষ টাকার এক একটা কথা	৪৯	বিজয়া-সম্মিলন ...	১০৭
দশ অবতার ...	৪৯	ভিতরে ও বাহিরে ...	১০৮
হিন্দুধর্ম ও হিন্দু চিকিৎসা ...	৫১		

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
সকলই আপনার ...	১১২
চিকিৎসা ...	১১৪
ঋষি ...	১১৫
অগদীশ্বর মঙ্গলময় ...	১১৭
বেয়েলী আইন ...	১২০
বুড়া ঠান্দিদি ...	১২২
পুরন্দ্রী (পদ্য) ...	১২৭
লজ্জা (পদ্য) ...	১৩০
লক্ষটাকার কথা (মণি-রত্নমালা) ...	৩৩১
দ্রব্যগুণ-বিচার ...	১৩২
(অপামার্গ, অম্ললোণিকা, অম্লবেতস, অম্লিকা,)	
শ্রীশ্রীচণ্ডী—সমালোচনা ...	১৪৭
চরকীর নীতি ...	১৫৫
যমরাজের সাস্ত্রনা ...	১৫৬
দ্রব্যগুণ-বিচার (অর্ক, অর্জুন) ...	১৬৩
আকাজ্জা ও সন্তোষ ...	১৭১
আমাদের স্বাস্থ্যেরতির একটি উপায় ...	১৭৫
(মণি-রত্নমালা)	
লক্ষটাকার কথা ...	১৭৯
শ্রীশ্রীচণ্ডী—সমালোচনা ...	১৮১
সৌন্দর্য ...	১৮৭
সেফালিকার দুঃখ ...	১৮৮
দ্বীজাতির দোষ ...	১৯২
মণি-রত্ন মালা ...	১৯৮
দ্রব্যগুণ-বিচার ...	২০১
(অশোক, অশ্বগন্ধা, অশ্বখ)	
ভক্তি ...	২১১
কামলে কেশ ...	২১৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
রাধা ও প্রজা ...	২১৯
চরকীর নীতি ...	২২৪
লক্ষ টাকার কথা ...	২২৫
দ্রব্যগুণ-বিচার ...	২২৭
(অস্থিসংহার, অহিফেন,)	
আকুল রেদিন ...	২২৮
দরিদ্র দুয়ার ভিখারী ...	২৩০
লক্ষ টাকার কথা ...	২৩৩
দ্রব্যগুণ-বিচার ...	২৩৫
(অশ্বেট, আকনাদি, অক্ষক, আতৃপা, আনারস, আমলকী আর্দ্রক, আলোক-লতা, আত্র)	
শ্রীশ্রীচণ্ডী—সমালোচনা ...	২৫১
পতি দেবতা ...	২৫৫
আদর্শ— ...	২৬০
মদন-গোপাল ...	২৬৪
লক্ষটাকার কথা ...	২৬৮
দ্রব্যগুণ-বিচার ...	২৭১
(আত্র, আরথধ, ইঙ্গুদী)	
মুক রাজকুমার ...	২৮৩
বিখাসের বল ...	২৮৫
লক্ষ টাকার কথা ...	২৮৬
দ্রব্যগুণ-বিচার ...	২৯১
(ইন্দুরকানী, ইন্দ্রবারুণী, ইন্দ্রধব, ইরিমেদ, ইক্ষু)	
পতি-দেবতা ...	২৯৯
আদর্শ ...	৩০২
	হইতে
	৩০৬
	পর্ধ্যন্ত

ঋষি

আয়ুর্বেদ ও ধর্মনীতি বিষয়ক
• মাসিক পত্র।

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ ট্রিট-স্থিত

ডাক্তার আয়ুর্বেদ কলেজ
হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেন্ট উপাধি ও সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,
কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাভিনোদ-কবিশূষণ
সম্পাদিত।

বিষয়—অগস্ত্য ভোক্তব্য, রোগা সম্বন্ধে, জ্যোতিষ-বিচার, পাণ্ডের
মালিন, গতি-দেবতা, সমালোচনা।

১০. ইন্সটিটিউট পাবনাতে স্বাস্থ্যসাধন নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক গঠন।

প্রকৃতির শিক্ষা ।

উৎকৃষ্ট ভাবমণ্ডী পদ্য-পুস্তিকা । ইহাতে সৃষ্টির ক্ষুদ্রমহৎ সমস্ত বস্তুকে, এক নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে পাইবেন। পড়িলে ভাবকের মন প্রকৃতির মনোহর ছবি দেখিয়া উদ্ভূত হয় ও ভক্তের হৃদয় জীবীভূত হইয়া, ভগবানের দিকে স্রোতোরূপে ঝরিয়া যায়। মূল্য ১০ আনা। যক্ষ্মলবাসী ১০ আনা ডাঃ ট্যাম্প কবিরাজ মহাশয়ের ২০২ নং কর্ণওয়ালিসের ঠিকানায় পাঠাইয়া লউন।

“ঋষি”-পত্রিকার নিয়ম ।

- ১। “ঋষি” বাঙ্গালা মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (হলজ্যা বিঘ্ন না হইলে) অবিচলিত-নিয়মে বাহির হইবে। কোন গ্রাহককোন মাসের “ঋষি” না পাইলে তাহার পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জানাইতে হইবে। নচেৎ ইহার অঙ্গ আমরা দায়ী নহি। আকার (অনূন) ডিমাই ৮ পেজী ও ফর্মী।
- ২। মূল্য, অগ্রিম বার্ষিক ১ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১/১।
- ৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ অল্পগ্রহপূর্বক গ্রাহক-নম্বর-সহ নাম-ধাম-আদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। নূতন গ্রাহকগণ “নূতন” এই কথাটির উল্লেখ করিবেন।

ফুলের বাগান—প্রসিদ্ধ লেখক বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিতকৃত-মূল্য ১/। অতীব সুন্দর। গল্প, উপভাস, প্রবন্ধ ও সমালোচনা একাধারে। একটু পড়িলে সমস্ত না পড়িয়া থাকি যায় না। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্য।

প্রবাস চিত্র—বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখক শ্রীজলধর সেন প্রণীত। অমূল্য অতুল্যপুস্তক। মনের আবেগে সন্ধানি-বেশে দুর্গম পাহাড় অঙ্গল ঘুরিয়া গ্রন্থকার অপূর্ব ঘটনা ও দৃশ্যাবলি চিত্রিত করিয়াছেন, পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়। মূল্য ১/ টাকা। প্রাপ্তির ঠিকানা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান।

ক্ষেত্রমোহন দে এণ্ড কোং

৪৫ নং রথাবাজার, কলিকাতা।

ক্রীড়োপযোগী নানাবিধ বস্তাদি আমদানি করা হইয়াছে। ক্রীড়ামোহন উৎকৃষ্ট ছিটের কাপড় প্রভৃতির নমুনা ও মূল্যাদি, পত্র পাইলে পাঠান হয়। আসাম সিং এখানে পাওয়া যায়। অর্ডার পাইলে অল্প সময়ের মধ্যে পোষাক তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়।

Civil and Military Tailors, Army Contractors &c. &c.

ঋষিঃ

২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা । } { শ্রাবণ, ১৩০৬। জুলাই, ১৮৯৯ ।

জগন্নাথ-স্তোত্রম্

(শ্রীচৈতন্যদেব-রচিতম্)

যিনি মৌন-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলয়-জল-নিমগ্ন বিলুপ্তপ্রায় চতুর্দেবের উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন ; যিনি কুর্শ্ব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই অনন্ত-হৃৎ-প্রপীড়িত ত্রিভুবন পৃষ্ঠে বহন করিয়া তাহার স্থিতি সম্পাদন করিয়াছিলেন ; যিনি বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই প্রলয়-জল-নিমগ্ন অনন্ত ধরণীকে দস্তে করিয়া উর্দ্ধদেশে উত্তোলন করিয়াছিলেন ; যিনি নৃসিংহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্তম্ভ নখ দ্বারা সেই বৈষ্ণব-বিষেযী হিরণ্যকশিপুর বক্ষোবিদারণ পূর্ব্বক ভক্ত-কুল-চুড়ামণি নিঃসহায় বালক প্রহ্লাদের পরম সহায় হইয়াছিলেন ; যিনি বামন-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ত্রিপাদ-ভূমি-ভিক্ষা-চ্ছলে সেই গন্ধিত বলি-স্বাজের দর্পন নষ্ট করিয়া তাহাকে পাতালপুরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; যিনি পরশুরাম-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তেজঃপুঞ্জশালী সমরকুশল ক্ষত্রিয়গণের বধসাধন পূর্ব্বক পৃথিবীকে একবিংশতি বার নিঃক্ষরিয়া করিয়াছিলেন ; যিনি শ্রীরাম-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দুর্জয়-প্রতাপ ভৃত্য-স্বরূপ লঙ্কাধিপতি রাবণের প্রাণসংহার পূর্ব্বক দেবতাগণের অশান্তচিত্তে শান্তি-সুখা-রস সেচন করিয়াছিলেন ; যিনি বলরাম-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রনষ্টপ্রায় পৃথিবীর উপর হল-চালন করিয়া তাহার উৎকর্ষসাধন ও মহারাজ জরাসন্ধকে উৎপীড়িত করিয়াছিলেন ; যিনি বৃদ্ধ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, লুপ্তপ্রায় বেদবিহিত ধর্ম্মকার্যের পুনরুত্থার করিয়াছিলেন ; যিনি ককি-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সনাতন-ধর্ম্ম-বিষেযী দুর্ভাগ্যের বধসাধন হেতু দেবগণ-প্রদত্ত অশ্ব ও অসির সাহায্যে তাহানিগের প্রাণসংহার পূর্ব্বক এই পৃথিবীতে পুনরীকার সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন ; যাহাকে দোলমঞ্চে দর্শন করিলে মানবের পুনর্জন্ম হয় না ; যাহাকে রাসমঞ্চে নিরীক্ষণ

করিলে এই অসার সংসারে আর আশিতে হয় না ; ঋষিহাকে রথমঞ্চে অবলোকন করিলে গর্ভবাস-জনিত^১ ভীষণ যন্ত্রণা আর সর্ষ করিতে হয় না, সেই পরম পুরুষ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন জর্ঘমাথ দেবের শুভ রথযাত্রা উপলক্ষে, এস ভাই ! অদ্য আমরা একবার তাঁহার স্তুতিগান করিয়া জীবন সার্থক করি :—

(১) কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসঙ্গীতকরবো

মুদাভীরীনারীবদনকমলাশ্বাদমধুপঃ ।

রমাশস্ত্রব্রহ্মারপতিগণেশার্চিতপুদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥

প্রক্ষুটিত-পদ্ম-মুখী যত গোপীগণ

বসতি করিত বৃন্দাবনে অমুকর্ণ,

তাহাদের মুখ-মধু ভ্রমর হইয়া

আক্ষাদে করিব পান বিরলে বসিয়া,

ইহা ভাবি একদিন যিনি মনে মনে

যমুনার তীরবর্তী কোন এক বনে,

একবার স্মধুর করি বংশীধ্বনি

আনিয়াছিলেন যত গোপের রমণী ;

ব্রহ্মা, শঙ্কু, ইন্দ্র, লক্ষ্মী আর গণপতি

সেবেন ত্রীপদ যার হয়ে একমতি,

সেই দেব জগন্নাথ দিন দরশন

যখন বে দিকে আমি ফিরাই নয়ন !

(২) ভূজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে

হুকুলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষং বিদধতে ।

সদা শ্রীমদ্ভাবনবসৃতিলীলাপরিচয়ো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥

নিভা শোভা পায় বেণু যার বাম করে,

শিখিপুচ্ছ শোভে যার মস্তক উপরে,

কটিতটে শোভে যার হুকুল স্মদর,

নয়নে কটাক্ষ যার শোভে নিরন্তর,

বৃন্দাবনে যিনি নিত্য-গোপীগণ সনে
করেন বিবিধ লীলা অতি হৃষ্টমনে,
সেই দেব জগন্নাথ দিন দরশন
যখন যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন !

(৩) মহাশৈলোদ্ভেদীয়ে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন প্রাসাদীভূতঃ সহস্রবলভদ্রেণ বলিনা ।

সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলস্বরসেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥

মহাসমুদ্রেয় তীরে সুবর্ণ সমান
নীলাঙ্গ্রিশিখর-গৃহে যার অধিষ্ঠান,
রাখি যারে এক পার্শ্বে অত্র পার্শ্বে হলী
রহেন সুভদ্রা দেবী হয়ে কুতূহলী,
পাইবেন অবসর পূজার কারণে
ইহা ভাবি যিনি তাহা দেন দেবগণে,
সেই দেব জগন্নাথ দিন দরশন
যখন যে দিকে আমি ফিরাই নয়ন !

(৪) কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিকুচিরো
স্রমাবাগীরামঃ ক্ষু র্দমলপদ্মেক্ষণমুখৈঃ ।
সুরেন্দ্রৈরারাদ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥

কৃপাসিদ্ধু বলি যারে গণে জিভুবন,
সজল জলদ সম যাহার বরণ,

লক্ষ্মী আর সরস্বতী উভয়েরি সনে
বিহার করেন যিনি অতি হৃষ্টমনে,
অমল-কমল-সম-মুখ-চক্ষু-যুত
দেবগণ সেবিছেন যারে অবিরত,
চতুর্বেদ-চূড়ামণি যে বেদান্ত ধন
তাহারি মহিমা যিনি করেন কীর্তন,

ସେହି ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିନ ଦର୍ଶନ

ବଧନ ସେ ଦିକେ ଆମି କିରାହି ନୟନ !

- (୧) ରୁଧୀକ୍ଳଠୋ ଶେଷନ୍ ପଥି ମିଳିତଭୂଦେବପଟୈଃ
 ସ୍ତୁତିପ୍ରାହୁର୍ଭାବଃ ପ୍ରତିପଦୟୁପାକର୍ଣ୍ୟା ମଦନ୍ତଃ ।
 ଦୟାସିଦ୍ଧୁର୍ବଦ୍ଧୁଃ ସକଳଜଗତାଂ ସିଦ୍ଧୁହୃତମ୍ ।
 ଜଗନ୍ନାଥଃ ସ୍ଵାମୀ ନୟନପଥଗାମୀ ଉବତୁ ମେ ॥

ରଥେ ଆରୋହିୟା ସାର ଗମନେର କାଳେ

ପଥମଧ୍ୟୋ ମିଳି ସତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସକଳେ

ସ୍ତୁତିଗାନ କରେ ସାର ହୈରା ଉନ୍ମୟ,

ସିନିଓ ସ୍ତନେନ ତାହା ହୈରା ମଦୟ,

ଜଗତ୍ତେର ବଦ୍ଧୁ ସିନି, ଦୟାର ମାଗର,

ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନେ ଅବସ୍ଥିତି ସାର ନିରନ୍ତର,

ସେହି ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିନ ଦର୍ଶନ

ବଧନ ସେ ଦିକେ ଆମି କିରାହି ନୟନ !

- (୬) ପରବ୍ରହ୍ମାପୀଠଃ କୁବଳୟମଲୋଂକୁଲ୍ଲନୟନୋ
 ନିବାସୀ ନୀଳାଦ୍ରୌ ନିହିତଚରଣୋହନସ୍ତମ୍ଭିରସି ।
 ରସାନନ୍ଦୋ ରାଧାସରସଦ୍‌ପୁରାଲିଙ୍ଗନସ୍ତୁଧୋ
 ଜଗନ୍ନାଥଃ ସ୍ଵାମୀ ନୟନପଥଗାମୀ ଉବତୁ ମେ ॥

ସିନିହି ପରମ-ବ୍ରହ୍ମ, ନେତ୍ର ହୁଟା ସାର

ଐକ୍ଷୁ ଡିତ-ପଦ୍ମ-ମମ ରମ୍ୟା ଅନିବାର,

ନୀଳାଦ୍ରି-ପର୍ବତେ ସାର ବାସ ଅନୁକମ୍ପ,

ଅନନ୍ତ ସାଧାର ଧରେ ସାର ଶ୍ରିଚରଣ,

ରାଧାର ସରସ ଦେହ ସିନି ଆଲିଙ୍ଗିୟା

ପଢ଼େ ରନ୍ ଶ୍ରେୟତରେ ବିଭୋର ହୈରା,

ସେହି ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିନ ଦର୍ଶନ

ବଧନ ସେ ଦିକେ ଆମି କିରାହି ନୟନ !

- (୨) ନ ସାଚେହଂ ରାଜ୍ୟାଂ ନ ଚ କନକମାଣିକ୍ୟାବିଭବଂ
 ନ ସାଚେହଂ ରମ୍ୟାଂ ନିଧିଲଜନକରାମ୍ୟାଂ ବରବଧମ ।

সদা কালে কালে প্রমথপতিম্। গীতচরিতো

অগ্ন্যর্থঃ স্বামী নরনপথগামী ভবতু মে ॥

রাধ্যা-ভোগ-স্বথ, মনি, স্বর্ণ-অলঙ্কার,

এ সখীর তরে মন না যায় আমার ;

য়ে নারীর তরে ব্যস্ত এই ত্রিভুবন,

তাহারেও পেতে মোর নাহি যায় মন ;

উন্নত হইয়া গিয়া দেব দিগম্বর

• স্তুতিগান করিছেন যার নিরন্তর,

সেই দেব অগ্ন্যর্থ দিন দরশন

যখন যে দিকে আমি ফিরাই নরন !

(৮) হর স্বং সংসারং ক্রততরমসারং সুরপতে

হর স্বং পাপানাং বিততিমপরাং বাদবপতে ।

অহং দীনানাথো নিরতমচলোনিশ্চিতমিদং

অগ্ন্যর্থঃ স্বামী নরনপথগামী ভবতু মে ॥

অসার সংসারে আর আসিতে না হর,

এইটা করিয়া দাও, ওহে দয়াময় !

করেছি কতই প্যুপ সংসারে সদাই,

আর না করি হে তাহা, এই তুষ্টি চাই !

আমি অতি দীন হীন, অড়পিও-প্রায়

সত্য সত্য কহিতেছি, ওহে কৃপাময় !

যখন যে দিকে আমি ফিরাই নরন,

সে দিকেই পাই যেন তব দরশন !

অগ্ন্যর্থার্থকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রবৃত্তঃ শুচিঃ ।

সৰ্বপাপবিনিমুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

পরম-সংবৃত্ত শুচি হইয়া যে জন

এই অগ্ন্যর্থ-স্তব করে উচ্চারণ,

বৃত্ত কিছু পাপ তাঁর সকলি পলায়,

বিষ্ণুলোক যেই জন অনায়াসে পায় !

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ

• রাজা ময়ূরধ্বজ !

অতিথি-প্রত্যাখ্যান মহাপাপ। অতিথিসংকার হিন্দু গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য। ইহার কিকিছাত্রে ব্যতিক্রম হইলে গৃহস্থকে নিরয়গামী হইতে হয়। “সৰ্বদেবময়োহতিথিঃ” অর্থাৎ অতিথি সৰ্বদেবময়। “বে গৃহে এই অতিথির অপমান বা প্রত্যাখ্যান হয়, সে গৃহ হইতে মুখ শান্তি চিরবিদায় গ্রহণ করে।

ব্রাহ্মণ বড় বিপদগ্রস্ত। তাই বড় আশায় বৃদ্ধ বাধিরা রাজার স্রবণঃ শুনিয়া অতিথি হইয়াছেন। অতিথির মনোরথ পূর্ণ হইবে কি ? রাজার দিগন্তব্যাপিনী কীর্তি অক্ষত থাকিবে কি ? আজ রাজার অতিথিসংকারের বিবম পরীক্ষা ; এ ভীষণ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন কি ?

ময়ূরধ্বজ অন্তঃপুর মধ্যে পূজার্চনার নিযুক্ত। এমন সময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার শিশুপুত্র সমতিব্যাহারে রাজঘারে উপস্থিত। রাজার নিকট তাঁহার প্রয়োজন, একমাত্র তাঁহার নিকটেই তিনি ভিক্ষাপ্রার্থী। ভিক্ষা শীঘ্রই চাই, বিলম্বে ব্রাহ্মণের অমূল্যধন ধ্বংসনের হানি হইবে। অন্তঃপুর মধ্যে সংবাদ দেওয়া হইল। পূজা সমাপনান্তে শীঘ্র আগিয়া রাজা ব্রাহ্মণের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন বলিয়া পাঠাইলেন। শ্রবণ মাত্র ব্রাহ্মণ ক্রোধে অধীর হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণগোচর করিবামাত্র রাজা শশব্যস্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বহু অনুনয় বিনয় করিয়া ব্রাহ্মণের ক্রোধানল নির্মাণ করিলেন,—প্রাণপণে তাঁহার প্রার্থনী পূরণ করিতে প্রতিজ্ঞিত হইলেন। আজ প্রাতঃকালে অদ্বৈতীচরণপ্রদেশ দিয়া আগমন কালে তিনি এক সত্যে আবদ্ধ হইয়াছেন। সে সত্য রক্ষা করিতে রাজারই অমুকম্পা আবশ্যিক। রাজাই সেই সত্য-সাগর পার হইবার একমাত্র তরণী।

আহারাদি সমাপনান্তে অতিথি প্রাতঃকালের ঘটনা প্রকাশ করিলেন। বলিলেন,—মহারাজ ! এই শিশু জ্ঞানদের বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সম্ভান, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম। ইহার বিচ্ছেদে আমরা কণকালও জীবন-ধারণ করিতে পারি না। ইহাকে স্নদরে ধারণ করিয়া শতশত বিপদ, ভীষণ দারিদ্র্যবরণা প্রভৃতি অক্লেশে সহ করিরাছি। রাজন্ ! বলিতে কি, ইহার অমুকম্পে তিনটা প্রাণীর অমঙ্গল, ইহার মৃত্যুতে তিনটা জীবের মৃত্যু, ইহার

হিংসার তিনটা প্রাণীহিংসা। রাজন্! আজ এই শিশু, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অন্ধা-
ব্রাহ্মণী এই তিনটা প্রাণীর জীবন রক্ষা করিয়া অতুলকীর্তি লাভ করুন,
ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

প্রাতঃকালে বন মঞ্চ দিয়া আগমন কালে এক সিংহ আমার এই শিশু-
টাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। আমার কাতরপ্রার্থনার শিশুর জীবন রক্ষা
হইল বটে কিন্তু ইহার পরিবর্তে সিংহ-রাজার অর্ধশরীর প্রার্থনা করিল।
কি করিব, সেই বিষম চূর্দ্দেবের সময় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া “তাহাই
হইবে” বলিয়া ইহার প্রাণ বাঁচাইলাম। রাজন্! এখন যথাকর্তব্য-বিধান
করিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করুন। ময়ূরধ্বজ প্রফুল্লবদনে তাহাতেই সম্মত
হইলেন। তাঁহার সেই অসার অনিত্য পরিণাম-ভঙ্গ দেহ আজ পরোপকারে
লাগিবে ভাবিয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন।

সিংহের প্রার্থনা অমুরূপ সমস্তই তৎক্ষণাৎ আয়োজন করা হইল।
রাজপুত্র ও রাজপত্নী উভয়ে অস্ত্রহস্তে দুই দিকে দণ্ডায়মান, মধ্যস্থলে ময়ূরধ্বজ
প্রফুল্লবদনে শয়ান। রাজ-আজ্ঞা পাইবামাত্র স্ত্রীপুত্র উভয়েই অস্ত্র ধরিয়া
কাটিতে আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ রাজার মনোভাব পরিবর্তিত হইল, তাঁহার
নয়নধর অশ্রুজলে প্লাবিত হইল! দেখিয়াই ব্রাহ্মণের ক্রোধানল আবার
জলিয়া উঠিল। “রে পাপিষ্ঠ নরাদম! যদি নখর শরীরের মায়ী পরিত্যাগ
করিতে না পারিবি, তবে এ কপটতার প্রয়োজন কি?” বলিয়া ব্রাহ্মণ
শাপার্থ বল গ্রহণ করিলেন। রাজা করণোড়ে বিনীতভাবে বলিলেন “দেব!
আমার এই শরীরার্দ্ধ পরোপকারে ব্যয়িত হইবে, কিন্তু অপরাধ বৃথা হইল
এই ভাবিয়া আমি মর্দাহত হইয়াছি, তজ্জন্তু আর অশ্রু সংবরণ করিতে
পারিতেছি না।” ওনিয়া শ্রীকৃষ্ণ আর থাকিতে পারিলেন না,—নিজরূপ
পরিগ্রহ করিলেন। *

কি ভীষণ পরীক্ষা! এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারেন তিনি, বিনি একমাত্র
শ্রীকৃষ্ণচরণে সমস্ত সমর্পণ করিয়াছেন। দেহ মনঃ প্রাণ স্ত্রীপুত্র পরিবার
ধন জন স্বেচন—সমস্ত তাঁহারই, আধার কিছুই নহে, এইরূপ ভাবিয়া
নিজ কর্তব্যবোধে গার্হস্থ্য ধর্ম প্রতিপালন করাই কর্তব্য। তাঁহার জিনিস,
তিনিই এই সমস্তের অধিকারী, ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই;

আমরা উপলক্ষ্যমাত্র তাঁহার আদেশই একমাত্র অবলম্বনীয় । তৎপ্রদর্শিত পথ
তির অস্তপথ অবলম্বন করিবার অধিকার আমাদের কিছুমাত্র নাই । সে পথ-
প্রদর্শয়িতা তৎস্বরূপ "ত্রীশ্রী গুরুদেব" । শাস্ত্রে তির তির মূনির তির তির
মত্ত থাকিলেও মূলে এক, তাহা জানিবার অস্ত্র ত্রীশ্রী গুরুচরণাঙ্গর কর্তব্য ।

ময়ুরধ্বজ ত্রীকৃষ্ণের ত্রীচরণাঙ্গিত ; নিম্পৃহভাবে তিনি সর্বকর্ম তাঁহারই
ত্রীচরণে অর্পণ করেন, তাই এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন ।

কেহ কহে মৌরধ্বজ দানশীল হয়,
কেহ কহে জানী কেহ ভগ্নহী কহয় ।

অন্তএব বার বতদূর দৌড় হয়,
বপাধ না জানি নিজ মত্ত সেই লয় ।

মৌরধ্বজ কৃষ্ণ ভক্ত জামিহ নিত্যত,

‘পর উপকারে বখা দখিষ্টি মহাস্ত ॥ ত্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ ॥

আগর সময় উপস্থিত । জী পুত্র উভয়ে অল্প প্ররোপ করিতেছেন । ব্রাহ্ম-
ণের অস্ত্র প্রাণ দিতেছেন, ক্ষণকাল পরেই প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে তখনও
“অর্দ্ধ শরীর বিকল গেল কাহারও উপকারে আসিল না !” এই ভাবিতেছেন
আর তজ্জন্ত অশ্রু-বিসর্জন করিতেছেন ! কি মহৎ পরোপকার ব্রত ! কি
মহান উচ্চর্ভাব ! আবার ত্রীকৃষ্ণের পরীক্ষা শেষ হইলে যখন বর দিতে উদ্যত
হইলেন তখন ময়ুরধ্বজ বলিলেন “প্রভু ! যদি প্রসন্ন হইয়াছেন, যদি নির্জঙ্গমে
দাসের প্রতি এতই কৃপা হইয়াছে, তবে এই বর দিন যেন এরূপ পরীক্ষা আর
কাহাকেও না করেন ।” তখন ত্রীকৃষ্ণ শিশুরূপী অর্জুনকে বলিলেন “সখে !
একবার দেখ তগবদ্বক্তের কি মূন্দর অন্তঃকরণ ! কিরূপ পদার্থজীবন !
ময়ুরধ্বজ আজ ভক্ত হৃদয়ের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন ।” “প্রিয়তম ময়ুরধ্বজ !
তোমার ভক্তিরজ্জ্বলে আমি অনেক দিন বাধা পড়িয়াছি, আজ অগৎ
শিক্ষার অস্ত্র, ভক্তের হৃদয় অগৎকে দেখাইবার অস্ত্র তোমার হৃদয় সর্বসম্মুখে
একবার পরীক্ষা করিলাম । বৎস ! এখন নিশ্চিন্ত চিন্তে বীর কর্তব্য পালন
কর, ভবলীলায় সমাধান হইলে তোমার চির অভিলাষ পূর্ণ হইবে ॥

ত্রীশ্রীপদ যোগ-বিশারদ ।

দ্রব্যগুণ-বিচার ।

। এরণ্ড পত্রের গুণ ।

এরণ্ডপত্রঃ বাতশ্লঃ কফক্রিমিবিনাশনম্ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রহরকাপি পিত্তরক্তপ্রকোপণম্ ॥

বাতার্থ্যগ্রহণঃ শূল্যবস্তিশূলহরং পরম্ ।

কফবাতগদান্ হস্তি বৃদ্ধিঃ সপ্তবিধামপি ॥

এরণ্ড পত্র—বাতশ্ল (আভ্যন্তরিক ও বাহ্যপ্রয়োগে), কফ ও ক্রিমির (কাথ সেবনে), মূত্রকৃচ্ছ্রহর, পিত্ত ও রক্তের প্রকোপ কারক । কচিপাতা—শূল্য ও বস্তিশূলের উৎকৃষ্ট প্রতিকারক, বাতশ্লৈষ্ম জনিত সমস্ত রোগ এবং সপ্তপ্রকার বৃদ্ধিরোগ নিহত করে ।

এরণ্ড বীজের গুণ ।

এরণ্ডফলমত্যাফং শূল্যশূলানিলাপহম্ ।

বক্তং প্রীহোদরার্শোয়ঃ কটুকং দীপনং পরম্ ।

তষ্মন্মজ্জা চ বিড়্তেদী বাতশ্লৈষ্মোদরাপহঃ ॥

এরণ্ডফল (খোসা সহিত বীজের কাথ) অত্যন্ত উষ্ণ, শূল্য শূল ও বায়ু-নাশক, বক্তং, প্রীহা, উদররোগ ও অর্শঃপ্রশান্তিকর, কটু ও পরম দীপন; ইহার মজ্জা (বীজের শাঁস) মলভেদক, বাতশ্লৈষ্মা ও উদর রোগনাশক ।

এরণ্ড তৈলের গুণ ।

রাজবল্লভ মতে—এরণ্ডতৈলং মধুরং গুরু শ্লেষ্মাভিবর্দ্ধনম্ ।

বাতাস্থগ্ শূল্য হৃজোগ জীর্ণজ্বরহরং পরম্ ॥

অর্থাৎ এরণ্ড তৈল মধুর, গুরু, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বাতরক্ত, শূল্য, হৃজোগ ও জীর্ণজ্বর নাশক ।

মতান্তরে—

এরণ্ডতৈলং কৃমিদোষনাশনং বাতাময়শ্লঃ সকলাজ-শূলহং ।

কূষ্ঠাপহং স্বাহ রসায়নোত্তমং শ্লেষ্মপ্রকোপং কুরুতেহতিদীপনম্ ॥

এরণ্ড তৈল কৃমিদোষ নাশক, বাতব্যাধির, সকলাজের শূলহর, কূষ্ঠর, স্বাহ, রসায়ন, শ্লেষ্মপ্রকোপকর ও অগ্নিদায়ক ।

প্রয়োগ—ঔষধার্থ ইহার বীজ, বড় পাতা, কচি পাতা, ছাল, কচি মূল ও বড় মূলের ছাল ব্যবহৃত হয়। ইহার বীজ হইতে নীলাভ সাদা, গাঢ়, জ্বৎস্না হুর্গন্ধ তৈল পাওয়া যায়; বীজকে উত্তম্ব করিয়া নিষ্পেষিত করিলে শতকরা ৩৫ ভাগ এবং বিনা উত্তাপে নিষ্পেষণ করিলে ২৫ ভাগ তৈল বাহির হয়। এই তৈল রাত্রে শ্রদীপে পোড়ান হয়; ইহার আলো স্নিগ্ধ ও অধিক-ক্ষয় স্থায়ী কিন্তু অল্প তৈলের আলো অপেক্ষা একটু নিস্তেজ। ঐহাদের মাথা গরম বা বায়ুপিত্তের খাতু তাঁহাদের এই তৈলের আলো ব্যবহার করা উচিত। এই তৈল উত্তম্বরূপে পরিষ্কৃত হইয়া বোতলে ডাঁড়ার খানায় ক্যাষ্টারঅয়েল নামে বিক্রীত হয়, এই তৈলের জ্বালাপি রূপে ব্যবহার সকলেই জানেন। এই জ্বালাপি বেশ সুস্থ; বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী সকলেই নিরাপদে সেবন করিতে পারে, এই জ্বালাপের সাধারণ মাত্রা ২।৩ তোলা। উষাকালে গরম জলে বা পাতলা বলাকা গরম দুধের সহিত সেবন করিতে হয়। যত তৈল তাঁহার অর্দ্ধাংশ আদার রস, অপর অর্দ্ধাংশ গরম জল মিশাইয়া খাইলে, হুর্গন্ধ কম বুঝা যায়, কফহুই মলও উত্তম্বরূপে নিষ্কাশিত হয়। ঐহাদের চিরস্থায়ী অত্যধিক কোষ্ঠবদ্ধ, তাঁহাদের মধ্যে মধ্যে রাত্রে শয়নকালে গরম দুধের সহিত ১ বা ২ কাঁচা (বা আবশ্যক মত ততোধিক) এই তৈল সেবন করা ভাল। কচি শিশুর দাঁত করাতে হইলে এই তৈল জ্বৎস্না করিয়া পেটে মালিশ করিলেই যথেষ্ট।

এরও তৈল বাতরোগের পক্ষে বড় উপকারী, প্রান্তে বলে—

“আমবাত গজেজ্ঞস্ত শরীরবনচারণঃ ।

এক এব নিহস্তাহনৌ এরওব্বেহ-কেশরী ॥”

অর্থাৎ এই দেহ কাননে বিচরণকারী আমবাতরূপ হস্তীর একমাত্র নিপাতকারী এই এরও তৈল রূপ মহাকেশরী। কিন্তু সাধারণতঃ বাতব্যথা নিবারণের জন্য শুধু এরও তৈল ব্যবহার হয় না। ইহার সহিত কিছু মিশ্রণ আবশ্যক হয় যথা,—

“দশমূলীকষায়ণ পিবেদ্ বা নাগরাস্তসা ।

কুন্ধিবন্তিকটীশূলে তৈলমেরওসম্ভবম ॥”

অর্থাৎ দশমূল বা শুক্রীর কাথের সহিত এরও তৈল সেবন করিলে কুন্ধি,

বন্তি ও কোমরের (lumbago) ব্যথা নিবাসিত হয়। বাতরোগে এই তৈলের মালিশও অত্যন্ত উপকারী;—/০ ছটাক এরও তৈলে ১ ভরি স্থন্ন সৈন্ধব চূর্ণ মিশাইয়া যোজ্জ্বল করিয়া মর্দন কর্তব্য।

(১) পাকা এরও পাতা, বেলপাতা ও সৈন্ধবলবণ পিষিয়া কাগড়ের পুটলীতে গরম ঘেদ দিলে বাতব্যথা দূর হয়। (২) কচি এরও পত্র মূত্র-ক্লেচ্ছ (ফোঁটা ফোঁটা বা সরু ধারের প্রস্রাবে) উপকারী। এই রোগে ইহার রস উপযুক্ত বটিকার অম্বুপান স্বরূপ দেওয়া হইয়া থাকে, অথবা এই পাচন ব্যবহার্য্য ব্যথা—কচি এরও পত্র, কুলথ কলার, গোক্ষুর বীজ, ইক্ষুমূল ও বেণামূল সাকল্যে ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেব অর্দ্ধপোয়া; ইহাতে ছোট পাথরী পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়ে। (৩) এরও তৈলে চূণের দল ফেণাইয়া দিলে পোড়া বা ভাল হয়। শুধু এরও তৈল লাগাইলেও পোড়ার জ্বালা শব্দ হয়। (৪) এরওমূলের রস আমবাত রোগে ঔষধের অম্বুপান স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

কবিরাজগণ এরও মূলকে প্রধানতঃ শূল ও বাতব্যাদি রোগের চিকিৎসায় পাচনের উপকরণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; শাস্ত্রোক্ত কতিপয় শূলনাশক যোগ ব্যথা—

বলা পুনর্নবৈরও বৃহতীঘর গোক্ষুরৈঃ ।

সহিঙ্গু লবণোপেত্তং সদ্যো বাতরুজাপহম্ ॥ •

বেড়েলা, পুনর্নবা, এরওমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুরের কাথ একটু হিং ও সৈন্ধবলবণ সহ সেবন করিলে বাতশূল নিবাসিত হয়।

বিশ্বমেরুজং মূলং কাথরিদ্বা জলং পিবেৎ ।

হিঙ্গুসৌবর্চলোপেত্তং সদ্যঃ শূলনিবারণম্ ॥

শুঠ ও এরওমূল মিলিত ২ তোলা, ইহার কাথ হিং ও সচললবণ সহ পান করিলে সদ্য শূল নিবারণ হয়।

তদ্বজ্রবৃষবকাথো হিঙ্গুসৌবর্চলান্বিতঃ ।

এরওমূল ও ঘবের কাথ, হিঙ্গু ও সৌবর্চললবণযোগে শূল নাশ করে।

বিশ্বমূল তিলৈরওং পিষ্ট্য চান্নভবাস্তসা ।

শুড়িকাং ভ্রাময়েদ্ উষ্ণাং বাতশূলবিমাশিনীম্ ॥

বিষমূল, তিল ও এরওমূল একত্রে ঔষুকাজিতে পেষণ করিয়া শুড়িকা

প্রস্তুত করিবে ; এই শুভিকার্ত্তিক করিয়া অষ্টরোপরি ভ্রমণ করাইলে বাতশূল প্রশান্ত হয় ।

বিষমূল মধৈরঙং চিত্রকং বিষভেষজম্ ।

হিঙ্গু সৈন্ধব সংযুক্তং সদাঃ শূলনিবারণম্ ॥

বিষমূল, এরঙমূল, চিতামূল ও শুঠের কাথ, হিং ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে ককবাতক শূল নিবারণিত হয় ।

আমবাত ও বাতব্যাধি নাশক কতিপয় শাস্ত্রাজি বোগ, যথা—

দশমূল্যমূতৈরঙ রাস্না নাগর ক্ষরুতিঃ ।

কাথো রুব্বকতৈলেন সামং হস্তানিলং গুরুম্ ॥

দশমূল, গুলক, এরঙমূল, রাস্না, শুঠ, দেবদারু—ইহাদের এরঙ তৈলের সহিত পান করিলে আমবাত উপশমিত হয় । এই পাচনের নাম রাস্নাদি দশমূল ।

রাস্নানুভারথধদেবীদারু ত্রিকটকৈরঙ পুনর্ণবামাম্ ।

কাথং পিবেন্নাগরচূর্ণমিশ্রং ভজ্জ্বারুপার্শ্বত্রিকপৃষ্ঠশূলী ॥

রাস্না, গুলক, সোঁদাল আঠা, দেবদারু, গোকুর বীজ, এরঙমূল ও খেত-পুনর্ণবার কাথ, শুষ্কী চূর্ণের সহিত সেবন করিলে জজ্বা, উর্ক, পার্শ্ব, ত্রিক ও পৃষ্ঠের বেদনা প্রশমিত হয় ।

রাস্নাং গুড়ু চীষেরঙং দেবদারু মহৌষধম্ ।

পিবৎ সার্কাজিকে বাতে সামে সর্কান্ধিমজ্জগে ॥

রাস্না, গুলক, এরঙমূল, দেবদারু ও শুঠ—ইহাদের যথা-প্রস্তুত কাথ সন্ধিগত, অস্থিগত, মজ্জাপ্রিত ও সার্কাজিক আমবাতে সেবনীয় ।

ধুতুরৈরঙ নিওঁতী বর্ষাতু শিগু সর্ষটৈঃ ।

প্রলেপঃ শ্লীপনং হস্তি চিরোথর্মাপ দারুণম্ ॥

কনকধুতুরা, এরঙ পত্র, নিশিন্দা, পুনর্ণবা, সজ্জেনমূলের ছাল ও খেত-সর্ষপ একত্র (অন্ন জলসহ) বাটির প্রলেপ দিলে চিরকাল দারুণ শ্লীপদ আরোগ্য হয় । এই প্রলেপ বাতের, কোলা-ব্যথাও সফর উপশম করে ।

রাস্না যষ্টামূতৈরঙ বলা গোকুর সাধিতঃ ।

কাথোহস্তরুচি হস্তাগু রুব্বতৈলেন মিশ্রিতঃ ॥

রাশ্মি, ষষ্টিমধু, গুলক, এরণ্ডমূল, বেড়েলী, গোকুর—এই সমূহায়ের যথাক্রমে কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অগ্নিবৃদ্ধি উপশান্ত হয়। এই পান আমবাত বা বাতব্যাধিরও উপকারী।

এরণ্ডঘটিত নানাবিধ রোগের আরো করেকটা শাস্ত্রোক্ত মুষ্টিযোগ,—

(১) নবমমাসে গর্ভবেদনা আরম্ভ হইলে এরণ্ডমূল ও কাঁকলা শীতল জল সহ বাটরা গুঠরোপরি লেপ দিলে ঐ বাতনা নিবারিত হয়। (২) ছাগছত্বেসহ এরণ্ডবীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তের উপশম হয়। (৩) এরণ্ডের পত্র, মূল বা শুষ্ক ছাগছত্বে সহ পাক করিয়া তদ্বারা চক্ষুঃসেচন করিলে দাহযুক্ত নেত্রোজ্জ্বল (চোকুউঠা) ভাল হয়। (৪) বৃহতী, এরণ্ডমূলের ছাল ও সৈন্ধবলবণ ছাগছত্বে বাটরা বটি প্রস্তুত করিলে; ইহা ঘষিয়া চক্ষুর পাতার অঙ্গন দিলে বায়ুজনিত নেত্রোজ্জ্বল প্রশমিত হয়। (৫) বৃহতী, মুণ্ডী (ভূঁইকদম), এরণ্ডমূল ও কণ্টকারীর কাথে সর্বপতৈল সংযুক্ত করিয়া গণ্ডুব করিলে ক্রিমিদস্তকের (দাঁতে পোকা হওয়ার) বেদনা ভাল হয়। (৬) এরণ্ডনাল চূর্ণ করিয়া ঘর্ষণ করিলে মশক (মুখে বা অন্ত্রে ছোট কাল দাগ) আরোগ্য হয়। শাস্ত্রে বথা—‘কবুনালাৎ তু চূর্ণেন ঘর্ষো মশকনাশনঃ।’ এই পাঠের উক্তরূপ বাতলা অম্বুবাঈ ত্রিযুক্ত বিনোদলাল সেন করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ অম্বুবাঈ ঘন সঙ্গত বোধ হয়, বথা—এরণ্ড নালের দ্বারা চূর্ণ ঘষিয়া ঘষিয়া দিলে মশকরোগ আরোগ্য হয়। ডাঃ স্ট্রট বলেন—এরণ্ড পত্র গরম করিয়া প্রস্তুতির স্তনে বাধিয়া রাখিলে স্তনস্থলের স্রাব হইতে থাকে।

শাস্ত্রে একরূপ আদেশ আছে যে, বাতব্যাধির কৃষ্ণচতুর্ভুজ ও যোগেন্দ্র রস নামক বাটিকা প্রস্তুত করিবার সময় উহার ধাতুঘটিত উপকরণগুলি বৃত্ত-কুমারীর রসে মাড়িয়া এরণ্ডপত্র দ্বারা বেটন ও বন্ধন করিয়া ৩ দিন ধাতুপূর্ণের মধ্যে অবস্থাপিত করিবে। ইহা বড়ই আশ্চর্য ও প্রশিধান-যোগ্য যে, এরণ্ড পত্রের সংস্পর্শে ধাতুগুলির মধ্যে গুণাধিক্য সঞ্চারিত হয়।

শাস্ত্রোক্ত বিকুতৈল, মহানারায়ণ তৈল, গন্ধকহস্ত তৈল, মহাটৈতস স্ত, বলারিষ্ট প্রভৃতির মধ্যে এরণ্ড প্রযুক্ত হয়।

এলবালুক ।

বালুনা নাম—ঐ ; হিন্দী—এলুরা ; ইংরাজী নাম জানা যায় নাই ; সংস্কৃত-পৰ্য্যায় :—এলবালুক মৈলৈয়ঃ স্নগন্ধি হরিবালুকঃ । এলবালুক মেলালু কপিথপত্র মৌরিতম্ । সংস্কৃত নাম—এলবালুক, ঐলৈয়ঃ স্নগন্ধি, হরিবালুক, এলবালুক, এলালু, কপিথপত্র । ইহার আরো কয়টা নাম এই—আলুক, গন্ধদ্বক্, কুষ্ঠগন্ধি, কপিথ ।

শাস্ত্রে ইহার যে কিস্কিৎ বর্ণনা আছে, তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহা এক প্রকার শৌরভযুক্ত ষক্, কতকটা নালুকার মত । ঐ ষকে কুড়ের ডার গন্ধ আছে, কিন্তু গন্ধটা ভদ্রপেক্ষা তীব্র । ইহার স্নগন্ধি, কুষ্ঠগন্ধি, গন্ধদ্বক্ প্রভৃতি নামগুলি দ্বারাও এ কথাই আভাস পাওয়া যায় । ইহা ভাবমিশ্র কর্তৃক কর্ণুরাদিবর্গের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে ; এতদ্বারাও ইহার স্নগন্ধিও প্রমাণিত হয় । “কপিথপত্র” এই পর্য্যায়ের দ্বারা মনে হয় যে, এই গাছের পাতা কয়েংবেলের পাতার মত । কিন্তু আজকাল “এলবালুক” নামে যে পদার্থ বণিকের দোকানে বিক্রীত ও কবিরাজ সস্ত্রদারের মধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে তাহাতে উক্তরূপ বর্ণনানুসারিক রূপ রসাদির লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না । কবিরাজগণ বাহা এলবালুক বলিয়া ব্যৱহার করেন তাহা একপ্রকার স্নগন্ধ সূক্ষ্ম কাল বীজ—দেখিতে যুগের শুঁড়ার (কাঠে যুগ নামক পোকা ধরিলে বেক্রম কুজ কুজ শুঁড়া ধাঁহির হয় তাহার) মত—কিন্তু কুচকুচে কাল ও মন্থন । এই বীজ বাস্তব (বেথো বা বাধুরা) শাকের বীজ বলিয়া অনুমিত হয় ।

কতদিন হইতে যে ঐ শাস্ত্র-বর্ণিত এলবালুকের স্থানে এই কুজ বীজ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহা জানা যায় না, যেহেতু ৬গঙ্গাপ্রসাদ ৬রসাসিধি প্রভৃতি মৃতসহস্রাদিগের প্রণিতামহ কবিরাজগণও না কি ইহাই ব্যবহার করিতেন ।

এই বীজের বহুকাল হইতে প্রচলন দেখিয়া মনে হয়, স্নগন্ধি ষক না হইলেও ইহার তৎসহ গুণ-সাদৃশ্য বীকৃত হইয়াছিল নতুবা প্রতিনিধিত্বপে প্রেরণিত হইল কেন ? অথবা এমনও হইতে পারে না কি যে, এলবালুককে

প্রক্রমে বালুকার (বালির) মত জ্ঞান করিয়া প্রথমে কেহ ব্যবহার করিয়া ছিলেন এবং বাঙ্গালীরা যতাবস্থলত অমুসন্ধিসাহীন গভ্রানুগতিক বিধি অমুযায়ী উহাই তদবধি ব্যবহার হইয়া আসিতেছে ? বাহা হউক আমাদের ধারণা এই—শকত এলবালুক, বচ, কুড়, লবঙ্গ প্রভৃতির সমভাতির জিনিস ; সম্ভবতঃ ইহা শান্তোক্ত নানা প্রকার তৈলের মধ্যে উপকরণ-স্বরূপ রহিয়াছে দেখা যায় ; সম্ভবতঃ প্রধানতঃ সৌগন্ধের জন্যই অন্তর্ভূত থাকে । কোন কোনও ঔষধেও ইহা আছে, যেমন—বাসা কুম্মাওখণ্ডের মধ্যে দৃষ্ট হয় । এরূপ প্রসঙ্গে প্রচলিত রসগন্ধহীন ক্ষুদ্রবীজ না দিয়া বচ, কুড় লবঙ্গাদির মধ্যে কোনও একটি বিবেচনাপূর্বক ব্যবহার করাই উচিত ; সম্ভবতঃ বাসা কুম্মাওখণ্ডে তৎপরিবর্তে কুড় দেওয়াই প্রেরঃ মনে হয় । আশা করি চিন্তাশীল স্বাধী-ব্যক্তি এ বিষয়ে প্রনিধান ও অমুসন্ধান করিবেন এবং সঙ্গতমীমাংসার উপনীত হইলে আমাদেরকে জানাইয়া বাধিত করিবেন ।

এলালু কটুকং পাকে কবারং শীতলং লঘু ।

হস্তি কণ্ড ব্রণছর্দি তৃটকাসাকচি হৃক্ষজঃ ।

বলাস বিষপিভ্রাশ কুষ্ঠ মূত্র গদ ক্রমীন্ ।

রস—কবার ; বিপাক—কটু ; বীর্য—শীতল ; গুণ—লঘু, কণ্ড, ব্রণ, ছর্দি, তৃক্ষা, কাস, অকচি ও কফনাশক, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ ও ক্রিমিহর ।
প্রভাব—মূত্ররোগ, হৃদ্রোগ ও বিষনাশক । প্রয়োগ—ওষু এলবালুকের প্রয়োগ আমরা কুজাপি দেখি নাই ; ইহা প্রধানতঃ বায়ুরোগের তৈলে নিক্ষিপ্ত হয় । রক্তপিত্তের বাসাকুম্মাওখণ্ডে এলবালুক আবশ্যক হয় ইহা উক্ত হইয়াছে ।

এলা ।

বাঙ্গালা নাম—এলাচ বা এলাইচ ; হিন্দী—ইলাইচী ; ইংরাজী—Cardamum. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—(বড় এলাচের) এলা স্থলা চ বহলা পৃথীকা ত্রিপুটাপিচ । ভট্টেরলা বৃহদেলা চ চন্দ্রবালা চ নিফুটিঃ । (ছোট এলাচের) হৃক্ষোপেক্ষিকা হৃক্ষা কেত্রদী জম্বিভী ক্রটিঃ । বড় এলাচের সংস্কৃত নাম—এলা, স্থলা, বহলা, পৃথীকা, ত্রিপুটা, ভট্টেরলা ; বৃহদেলা, চন্দ্রবালা ও নিফুটি ।

ছোট এলাচের সংস্কৃত নাম—ইন্দ্রা, উগকুকিকা, তুখা, কোরদী, ত্রাখিড়ী
একটি ।

আকুর্বেদীর ব্যবস্থা গ্রন্থে ফুলেলা ও ফুলেলা এই দুই নামে বড় ও ছোট
এলাচ অভিহিত হইয়াছে । শুধু 'এলা' বলিয়া উল্লেখ থাকিলে বড় এলাচই
বুঝিতে হইবে ।

বড় এলাচ কাবা, সুমাত্রাধীপে এবং ভারতবর্ষের পার্শ্বভাগে প্রমুখ্যে জন্মে ।
ইহা এক প্রকার আলাকাতীর ন্যায়দীর্ঘ গাছের কল । আর ছোট এলাচ বাহা
ভাষ্যভাষী নামে প্রসিদ্ধ সে গুলি মালাবার অঞ্চলের পূর্বভাগে, ত্রিবান্দুর ও
মাদ্রাজের পশ্চিমকূলস্থ পার্শ্বভাগে জন্মিয়া থাকে । ইহাও এক প্রকার ঐ জাতীর
জন্মের কল । উক্ত জন্মের পত্র পুষ্প উভয়ই স্নিগ্ধগন্ধি । ঐ পুষ্প হইতে
জ্ববেক জ্ববেক বে সকল শিথী জন্মে তাহাই এলাইচ । এলাইচের গাছ মূল
হইতে জন্মে, গাছ হইতে নহে ।

বড় এলাচের গুণ ।

ফুলেলা কটুক পাকে রসে চানলক্কলমুঃ ।

ক্কোফা স্লেয়াপিভ্যস কণ্ডু খাস তুখাপহা ।

হল্লাস বিববন্ত্যাশিরোরুগ্ণ বনি কাসমুঃ ।

বড় এলাচের রস—কটু ; বিপাক—কটু ; বীৰ্য্য—ক্কোফা ; গুণ—
লঘু, অগ্নিকর, স্লেয়া, রক্তপিত্ত, কণ্ডু, খাস, তুফা, হল্লাস (শ্বা বনি-বনি)
বিবদোষ, বস্তি, মুখ ও মস্তকের রোগ এবং বনি-কাসিহর ।

রাজ-নির্ঘণ্ট মতে—বড় এলাচ শীতল তিক্ত উষ্ণ স্নিগ্ধ পিত্ত
কফ মল আর্দি বাস্তিনাশক ও উত্তেজক ।

ছোট এলাচের গুণ ।

এলা ইন্দ্রা ককু খাস কাসার্শো মূত্রক্কলমুঃ ।

রসে কু কটুকা শীতা লঘী বাতহরী মতা ।

ছোট এলাচের রস—কটু ; বিপাক—কটু ; বীৰ্য্য—শীত ; গুণ—
লঘু, ককু, খাস কাস অর্শ : ও মূত্রক্কলমুঃ নাশক ও বায়ুনাশক (কোষ্ঠাশ্রিত
ক্কোফাশ্রিত আক্ষেপায়ক বায়ুনাশক) ।

পাগলের নালিশ ।



ভগবান্ ! তোমার কাছে আমার একটা বড় নালিশ আছে । তোমাকে ভ দেখতে পাই না !—পাবার আশাও নাই ; কেননা তুমি খোসামুদের বশ । যারা তোমার খুব গুণ গায়, তাদের কাঁছেই তোমার দরজা খোলা । আমি পাগল মানুষ ! খোসামোদ টের দ আমার বড় আসে না ; কালে ভজ্রে যদিও একটু হাঁটুগেড়ে ব'সে তুমি, হস্তা, তুমি, কস্তা—ইত্যাদি বোল চালের ঘোপাড় করিতে যাই, অমনি আমার উনপঞ্চাশ আসিয়া সব উল্টা পাণ্টা করিয়া দেয় । সুতরাং বেশ বুঝেছি, তোমাকে দেখা পাবার আশা আমার নাই ; আর একটা কয়েদা করেছ ভাল ! বল দিয়েছ কম, শ্রোত করেছ উন্নানক । আরো বলিতেছ—ওরে-পাগলা ! আমি এই নদীর পারে আছি । যদি শ্রোত কাটাইয়া উজানে গায়ের ধোরে আমার দিকে আসিতে পারিশ, তা হলেও আমার কাছে পৌঁছিতে পারবি । ও বাপ ! ফরমাসটা মন্দ নয় । শ্রোত ঠেলিয়া পৌছান দূরে থাকুক, জলে পা দিলেই হাজর-কুমীর সাপ অজাগর হাঁ করিয়া আসে । আমা যারা বাপু, এ কাজ হবে না । এত কল্পে, তবে দেখা পাব ? সাক্ বলেই হয়, যে দেখা দেব না । বা হোক বুঝেছি, তোমাকে দেখা পাবার আশা আমার নাই । তাই, এই পত্র লিখিতেছি ।

বলি, ওগো ঠাকুর ! তোমার এই জগদ্বোড়া কারখানাটির মধ্যে এত ভাত-কাপড়ের কষ্ট কেন ? তুমি সোণা, রূপো, তামা, পিতল, কোক্করলা ছাঁইডম্ব এত জিনিসের খনি মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছ । আর তার পেটের জ্বালার দিকে রূপাদৃষ্টি করিয়া ভাত-রুটির খনি করিয়া দিতে পার নাই ?—বেশ একটু মাটা খুঁড়িলেই খালাখালা ভাত উঠিবে এমন বন্দোবস্ত করিলে তোমার পক্ষে কি লোস্কান্ ছিল ? পণ্ড পক্ষীকেও আমার চেয়ে ভাল-বেসেচ—ওরা যেদিকে চোক্ চায় সেই দিকে গিয়ে দাঁড়ালেই ছটো খেতে পায়—আন্ত কালকার ভাবনাটা ভাবতে হয় না ! আবার আমার শরীরটা এমন করে গড়েছ যে একটা ঢাকনা দিলে চলে না,—না দিলে লোকে খুখু দেয়, গালী দেয়, মারে । তা বাপু, ভাল গাছ, তমাল গাছ, এত বাজে গাছ

গড়তে পেরেছ আর কাপড়ের একটা গাছ করতে পার নাই—বেশ অমূল্য কাপড় খুলে খুলে থাকত, টান দিয়ে দিয়ে নিভুম। ঐ বিষয়েও দেখি পশু-পাখীকে অধিক খাতির করেছ। সে যাক, পেটে খারান, পরণে কাপড়, নাই বা রছিল। আমার শরীরে যে এত বায়ুর একোপ, এর কি ঔষধ তোমার তাঁড়ে কিছু নাই? দেখ, বায়ুতে আমার সর্কাজেই শূন্যাতনা। সর্কাজে ত বড় চক্ষুশুলে ভুগিতেছি—পরের স্ত্রী, উন্নতি, সুখ দেখিলে ওটা বড়ই বাড়ে, যেমনা অসহ হয়। পৃষ্ঠশূলটা বারপরনাই কষ্ট দেয়। নিজের কাজ হাজার হাজার করিতে পারি, পরের ভার পড়িলেই পিঠের ব্যথাটা অসামাল হইয়া উঠে। তার পরে কর্ণশূল—ও বাবা! সংকথা ও হরিনামের ঠাণ্ডা বাতাস বহিলেই ঐ ব্যথাটা অভ্যস্ত বাড়ে, তখন মুখ ফিঙ্কাইয়া কাণে তুলো না গুলিলে থাকতে পারি না। আর সব চে' কষ্টকর সেই মাথাঘুরনি, এই ঘুরনিতেই আমাকে সান্নে—পর-সুবতীর আধো-ঘোমটা-ঢাকা মুখখানি দেখিলেই মাথা ঘুরিয়া যায়। বাপু-বাপু! ঘোমটার ভিতরে কি শত সূর্যের বাস? নইলে দৃষ্টিমাত্র প্রচণ্ড রোক্তুরের মত মাথাটা অমন করিয়া উঠে কেন? বা হ'ক, এর ঔষধ তোমাকে আমার দিতেই হইবে। নহিলে ছাড়িব না। ভাল কথা!—আর এক সূক্ষ্মবায়ু আমার আছে, তাতে হাত-পা খেঁচিয়া, চোক লাগ করিয়া কত কি বক্রিয়া অধির হইয়া, পড়ি—লোকে বলে পাগলা চটেছে! তা নয় ঠাকুর, ও আমার প্তয়ানক রোগ, ওরও একটা ঔষধ চাই। আরো অনেক রোগ আছে তা তোমাকে দ্বিতীয় পত্রে জানাব। এখন পত্রপাঠ এই গুলির বন্দোবস্ত আগে কর। তোমার পারে খরি এই গুলি আগে কর। ভাল কথা, পত্র খানি বিব কোন পোষ্টাকিসে? কোথায় দিলে তুমি পাবে! তুমি যে নদীর পারে আছে বলেছ, সে বাড়ীর নদীর কত? খোলসা না লিখিলে চিঠি পৌঁছাবে না! শুনেছি গৌরান্দ-মুনসী ডাক-ঘরে পত্র দিলেই হবে, কিন্তু আমার ত টিকিটের পরমা নাই! ঠাকুর, একটু বলিয়া দিবে কি?

পাত-দেহতা ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাতবিক সেকালের রমণীরা এইরূপ নিয়মে চলিত কিনা, তাহার একটা সাক্ষ্য চাই। তজ্জন্ত সীতা ও দ্রৌপদীর কথা নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বনগমনকালে রামচন্দ্র পথে অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হন। অননুহা (অত্রিপত্নী) সীতাকে রামচন্দ্রের সঙ্গে বনবাসে আগতা দেখিয়া তাঁহার কার্য পতিব্রতোচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়া কথাগুলো তাঁহাকে পতিব্রতের ধর্ম সর্বদা প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিলেন। সীতা সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,— “আর্য্যো, আমাকে আপনি যে সমস্ত উপদেশ দিলেন, ইহা আমার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে, পতিই যে স্ত্রীর গতি ইহা আমার জানা আছে। আমার স্বামীর কুৎসিত আচার হইলেও, যখন তিনি আমার নিয়তপূজ্য; তখন গুণস্বাভা, দয়াবান, জিতেন্দ্রিয়, স্থিরাত্মরূপ, ধর্ম্মায়া, পিতামাতার সদাশ্রিত আমার স্বামীকে যে আমি পূজা করিব, ইহাতে আর বিচিহ্ন কি? রমণীর যে পতিশ্রদ্ধা ব্যতীত অন্য তপস্তা নাই তাহা আমার বিশেষ জানা আছে।”

তাহার পর দ্রৌপদীর কথা,—সত্যতামা একদিন দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“দ্রৌপদী, তুমি কেমন করিয়া এই বায়ু চন্দ্র বরুণের মত তোমার পাঁচটি স্বামীকে বশ করিয়াছ? তাঁহাদের সঙ্গে তুমি কি রকম ব্যবহার কর যে, তাঁহারা কখন তোমার উপর রাগ করেন না? তাঁহারা সর্বদা তোমার মুখ চাহিয়া থাকেন, কখন তোমার মতের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করেন না, ইহা কিসে হইল? তুমি কি কোন ব্রত করিয়া এইরূপ করিয়াছ, না কোন মন্ত্রজপ করিয়া এরূপ করিয়াছ, না তোমার কোন ঔষধ জানা আছে, তাহা দ্বারা এরূপ করিয়াছ? অথবা তুমি কোন মন্ত্র পড়িয়া স্নানাদি কর বলিয়া এরূপ হইয়াছ! কিন্তু এরূপ হইল, আজ তাহা আমাকে বলিতে হইবে। বাহাতে কৃষ্ণ আমার বশীভূত হন, তাহার উপায় তুমি বলিয়া দাও।

সত্যতামা দ্রৌপদীকে দ্বাধী জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার উত্তর শুনিতে বোধ হয় এখনকার সকল স্ত্রীলোকই বাস্তব হইবেন, কিন্তু দ্রৌপদী বাহা বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা করিয়া সত্যতামা শ্রীকৃষ্ণকে বশ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু এখনকার রমণীরা সে উপদেশ মত কাজ করিয়া আপন আপন স্বামীকে বশ

করিতে পারিবেন কি ? বাহা হঁড়ক জ্যোপদী বাহা উত্তর দিয়াছিলেন তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ঈশ্বরেচ্ছায় জ্যোপদীর পুঁচটি স্বামী ছিল, কিন্তু সত্যভামার এক স্বামী ; তবে সত্যভামার সপত্নী অনেকগুলি ছিল, কাজেই সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে প্রায় পাইতেন না, একজন জ্যোপদীর নিকট স্বামীকে বশ করিবার উপায় শিখিতে চাহিয়াছিলেন। জ্যোপদীর নিকট ইহার উপায় জিজ্ঞাসা করিবার একটু বিশেষ কারণও ছিল। সত্যভামা বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার একটি স্বামী, তাহাকেই তিনি বশ করিতে পারেন না, আর জ্যোপদীর পাঁচটি স্বামী, তিনি কিন্তু পাঁচজনকেই বশ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার উপর জ্যোপদীর যে সপত্নী ছিল না এমন নহে ; সেই সকল সপত্নী থাকিলেও যে জ্যোপদী পাঁচটি স্বামীকে সেরূপ বশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইয়া সত্যভামা স্বামী বশ করিবার জন্য জ্যোপদীকেই স্বার্থ গুরুমহাশয় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন এবং একদিন তাঁহাকে লাজ লজ্জার মাথা খাইয়া ঐ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন। সত্যভামার প্রশ্ন শুনিয়া জ্যোপদী বলিলেন,—

“অসৎ স্ত্রীণাং সমাচারং সত্যে মামমুপুচ্ছসি ।

অসদাচরিতে মার্গে কথং শ্রাদমুকীর্তনম্ ॥

অমুপ্রশ্নঃ সংশ্লিষ্য বা নৈতস্বয়ুপপদাতে ।

যথা হুপেতা বুদ্ধ্যা স্বং কৃষ্ণস্ত মহিবী শ্রিয়া ॥

যদৈব ভর্তা জানীয়ামন্ত্রমূলপরাং স্ত্রিয়ং ।

উদ্বিজেত তদৈবাত্মাঃ সর্পাদেশগতাদিব ॥

উদ্বিগ্নস্ত কূতঃ শাস্তিঃশাস্তস্ত কূতঃ স্মৃৎ ॥

ন জাতু বশগা ভর্তা স্ত্রিয়াঃ শ্রামস্তকর্ষণা ॥

জলোদরসমায়ুক্তাঃ যিত্রিণঃ পলিতান্তথা ॥

অপুমাংসঃ কুতাঃ স্ত্রীভির্ভড়াঙ্কবধিরাত্তথা ॥

পাপামুগান্ত পাপান্তাঃ পতীহুপস্বজন্তাত ॥

ন জাতু বিপ্রিয়ং ভর্তুঃ স্ত্রিয়াকার্যাং কথঞ্চন ॥ (মহাভারত)

সত্যভামা, তুমি জানিয়া শুনিয়া অসত্য স্ত্রীদিগের ব্যবহারের কথা আমার জিজ্ঞাসা করিতেছ। অসৎ লোকের আচরণের কথা আলোচনা করিতেছ

কেন ? এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা বা তাহার কিছুই উত্তর দেওয়া উচিত নয়। তাহাতে আবার তুমি বুদ্ধিমত্তা ও ক্রমের শ্রিয়মহিবী। স্ত্রী মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা, ঔষধগালা দ্বারা স্বামীকে বশ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, এ কথা যে দিন হইতে স্বামী জানিতে পারিবেন সেই দিন হইতেই সেই স্ত্রীকে গৃহস্থিত সর্পের মত ভাবিয়া শঙ্কিত থাকিবেন। সত্যভামা, বাহারা শঙ্কিত থাকে, তাহাদের শাস্তি থাকে না, বাহারা অশাস্ত্য তাহাদের সুখ হয় না। আর স্বার্থ পক্ষে মন্ত্রতন্ত্র বা ঔষধে স্বামী কখন বশ হন না। অনেক স্ত্রী ঔষধের দোষগুণ না জানিয়া স্বামীকে বশীভূত করিবার জন্য তাঁহাকে উদরী, ধবল প্রভৃতি পীড়ায় চিরকুণ্ড, জড়, অন্ধ, বধির, পুংস্বহীন ও অকালবৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ পাপিষ্ঠা রমণীরা কেবল স্বামীর অনিষ্টই করিয়া থাকে।”

দ্রৌপদী এইরূপে সত্যভামার কথায় উত্তর দিবার আগেই তাঁহাকে বেশ দুঃখা মিটাকড়া শুনাইয়া দিলেন ; তাহার পর বলিলেন,—

“বর্তমান্যহস্ত বাৎ বৃত্তিং পাণ্ডবেষু মহাশ্বই ।
 তাং সর্বাং শৃণু মে সত্যং সত্যভামে বশস্বিনি ॥
 অহঙ্কারং বিহারাহং কামক্রোধৌ চ সর্কদা ।
 সদারান্ পাণ্ডবান্নিত্যং প্রবতোপচরাম্যহং ॥
 প্রণম্য প্রতिसংহৃত্য নিধারাম্মানমাশ্বনি ।
 শুক্রবুর্নিরতিমাণা পতীনাং চিত্তরক্ষিণী ॥
 দুর্ক্যাহত্বাচ্ছকমানা দুঃস্থিতান্দুবেক্ষিতাং ।
 দুর্বাসিতান্দুত্রিভিত্তাদিত্তিতাধ্যাসিতাদপি ॥
 সূর্য্য বৈশ্বানরসমান্ সোমকল্পমহারথান্ ।
 সেবে চক্ষুর্হণঃ পার্শ্বানুগ্রবীর্ষা প্রতাপিনঃ ॥
 দেবো মনুষ্যো গন্ধর্কো যুবা চাপি স্বলঙ্কতঃ ।
 দ্রব্যবানভিক্রপো বা ন মেহুন্তঃ পুরুষোমতঃ ॥”

সত্যভামা, পাণ্ডবগণের সঙ্গে আমি যে রূপ ব্যবহার করি, তাহা বলিতেছি তুমি। আমি অহঙ্কার, লখ, রাগ এ সমস্ত দূর করিয়া সস্ত্রীক পাণ্ডবগণের সর্কদা সেবা করিয়া থাকি। (স্বামীর অন্য স্ত্রীর প্রতি ঘেব করিলে স্বামী সন্তুষ্ট হন না বরং সপত্নীকে আদর করিলে স্বামী অসন্তুষ্ট হন) চক্ষুজ্ঞান পতিয়াও

আদর করিয়া থাকেন) । আমি স্বামীকে ভালবাসি, ইহা বুঝিরা, স্বামীর মিকট হইতে আদরের আশা না করিয়া মনকে শান্ত রাখি আর অভিমান ত্যাগ করিয়া সর্বদা সেবা করিয়া পতির মনরক্ষা করিয়া থাকি । মন্দ আলাপ, নির্লজ্জ বা নিন্দনীয় ভাবে থাকা, মন্দভাবে বা সজ্জাতাবে দেখা, নির্লজ্জভাবে বসা, নির্লজ্জভাবে বা নিন্দনীয় স্থানে যাওয়া অথবা মনোগত অভিপ্রায় জানাইবার জন্য আড়নরনে ইসারা করা ইত্যাদিকে আমি বিড়ম্বিত করিয়া চলি এবং কখন করি না । ঐ সকল বিষয়ে সতর্ক হইরা সর্বদা স্বামিসেবা করিয়া থাকি । কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি গন্ধর্ব, কি সুন্দর বেশভূষাধারী, কি ধনবান, কি স্নগদান স্বামীতির অন্য কোন পুরুষকে আমি ভাবি না, চাহি না ।

“না ভুলবতি না স্নাতে না সখিহৈ চ তর্করি ।

ন সংবিশামি না স্নামি সদা কন্দকরেষপি ॥

কোদ্রোহনাশা গ্রামাশা তর্ভারং গৃহমাগতং ।

প্রভাখারীতিনল্লামি আসনেনোদকেন চ ॥

প্রমুহুতাণ্ডা মুষ্টানা কালে ভোজনস্মারিনী ।

সংযতা গুণধাত্তা চ স্নসংমুষ্টনিবেশিনা ॥

অতিরিক্তসজ্জা চুঃস্মিরো নাসুসেবতী ।

অসুকূলবতী নিত্যং ভবামানলসা সদা ॥

‘অনর্শচাপি হসিতং দ্বারিস্থানমভীক্লশঃ ।

অবস্বরে চিরস্থানং নিকুটেবু চ বর্জয়ে ৬

অতিহাস্যতিরোধৌ চ ক্রোধস্থানঞ্চ বর্জয়ে ॥

নিরতাং সদা সত্যে তর্জুণামুপসেবনে ।

সর্বথা তর্জুরহিতং ন মমেষ্টঃ কথকন ॥”

স্বামী না স্নান করিলে, না আহার করিলে, না সুমাইলে আমি স্নান করি না, আহার করি না, সুমাই না । স্বামী কেত্র, বন, প্রাম হইতে বাড়ী আসিলে (অর্থাৎ বেড়াইরা-চেড়াইরা অথবা কন্দহাস হইতে কিরিয়া আসিলে) আমি উঠিয়া তাঁহাদিগকে পা সুইবার জল ও বসিবার আগুন দিয়া থাকি । ঘরের কোজন-পাত্রাদি (খালা স্টিবাটী গেল্লাস ইত্যাদি) সর্বদা পরিষ্কার করিয়া রাখাইরা রাখি, খালাত্রয় সকল বস্তু করিয়া বিড়ম্ব রাখি (অর্থাৎ ঢাকা দিরা

ওহাইরা মাধি), খাতাদি, নষ্ট না হয়, এরূপে লক্ষ্য করি, ভোজননের উচিত সময়ে তাঁহাদিগকে আহ্বানাদি দিয়া থাকি (ইহা দ্বারা এমন বোধ হয় না যে দ্রোণদীকে বাসন মাজিয়া তাত খাইতে হইত, খাদ্য ভানিয়া খণ্ডর ঘর করিতে হইত।) আমার তিরস্কার করিলে তাহার উত্তর দিই না, মন্দবতাব ত্রীলোকের সেবা করি না, আলস্য না করিয়া স্বামীর মনে সর্বদা চলিয়া থাকি। পরিহাস ভিন্ন হাসি না, বরের বা বাড়ীর দরজার অধিকক্ষণ থাকি না, মলমূত্র ত্যাগের অস্থিলায় বাহিরে বা বাড়ীর পার্শ্ববর্তী বাগানে (বাড়ীর খোলা ছাদে রাস্তার ধারের জানালার কথা একালে বলিতে পারা যায়) অধিকক্ষণ থাকি না। অধিক হাস্য, অধিক রাগ ও অধিক রাগের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া থাকি। আমি সর্বদা স্বামীর সেবা করি। স্বামীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে আমার কখন ইচ্ছা হয় না।”

(ক্রমসঃ)

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী ।

সমালোচনা ।

প্রেম গীতা—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী প্রণীত, মূল্য ১। কাগড়ের মলাট, ১।০। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতে বিলক্ষণ পরিচিতা হইয়াছেন। তিনি প্রকৃত স্বভাব-কবি—তাঁহার প্রায় সকল লেখাই অবদ্বন্দ্ব-সম্ভূত, নির্মল-শ্রেণতঃপ্রবাহের জ্বর বেধিতে পাই; আজকাল অনেক নবীনা লেখিকা শুধু কবিতাই লেখেন—এমন সব কবিতা বাহাতে কথা সাজানো বেশী, ভাব কম—নিংড়াইলে জলময় তরমুজের মত একটুখানি শাঁসমাত্র থাকে। স্নেহের বিষয় ইনি সে শ্রেণীর উপরে অবস্থিত। অধিকন্তু নবীনা দিগের গদ্যপ্রবন্ধে যেন “প্রবেশ নিবেধ”, কিন্তু শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা এতাদৃশ যুক্তি-গর্ভ গাভীর্ঘ্যপূর্ণ উচ্চদরের প্রবন্ধ সমুদায় লেখেন বাহা উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষের লেখা হইলেও মহা প্রশংসা-বোগ্য হইত, এইরূপ সিদ্ধহস্তা লেখিকার প্রেমগীতা যে অতি সুন্দর ভিনিস হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পুড়িয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি ও লেখিকাকে মনে মনে শত শত আশীর্বাদ করিয়াছি—হতাশের আক্ষেপ, নিঃস্বার্থ প্রেম, প্রভাতসদীত, এসনা, বিরোধিনী বিকুঞ্জিরা, তারিকা, বিদায়োগঁহার, পাগলিনীর চেয়ে থাকা, রবির

জতি কমলিনী, নবীন তপন, হতানুপ্রণয়ী, স্বপন, প্রত্যাহিত প্রেম, ছায়াবাদী, নীরবমেহ, মহাপ্রেম।

নগেন্দ্রবালা বেধুন-কহেঁজে গড়া, বিলাস-ব্যাপ্তা, গৃহকর্মবর্জিতা আধুনিক ছাঁচের স্রীলোক নহেন, ইনি গৃহস্থালী-নিমগ্না, স্বামিপদাশ্রিতা, পূজা-সদাচার-নিরতা, অতীব সাধিক প্রকৃতি, শাস্ত্রশীল্য রমণী অথচ কৈশোর-বরুণা। অবস্থা-সাজুলা সবে নিজহৃৎ রন্ধনাদি প্রত্যেক গৃহকর্ম করেন—কাগজ কলম একত্র করিবার সময় ইহার বড়ই কঁম, তহুপরি আবার ইনি অভ্যস্ত রোগজীর্ণ, স্বাস্থ্যস্থখে একান্ত বঞ্চিত—এরূপ অবস্থায় যে ইনি এরূপ লেখেন এটা কম গুণপনার কথা নয়। আশা করি সন্দেহ সঙ্কুচিত ব্যক্তিমাঝেই 'প্রেম পাখা' পড়িয়া দেখিবেন।

ভারত-দর্পণ—শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় কৃত। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর যোকানে বা ১৭৩১ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট গ্রন্থকারের নিকটে পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি ভগিউন্ (১২ খণ্ড) গ্রাহকের পক্ষে ৩, অপরের পক্ষে ৫। ইহা রাধিকাবাবুর এক মহানু কীর্ত্তিস্তম্ভ ! রত্নগর্ভ ভারতের স্নন্য অমূল্য রত্নাবলি ইহাতে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ভূগোল ও ইতিহাস, দ্রব্য ও বনোষধি এবং জাতি ও সম্প্রদায় এই চারি বিভাগে সুন্দর পারিপাটা সহ এই গ্রন্থ স্থিখিত হইতেছে। লেখা, সরস, সুগম, সুশৃঙ্খল ও মনোহর; সুতরাং আমাদের বিশ্বাস বাহাদের সঙ্গ্রহ পড়ার নেশা আছে, তাহারা এই সুধানুজে ডুবির আনন্দে আস্থহার্য হইবেন; নতেন-প্রিয়া ব্যক্তিরাজ ইহার অভ্যস্তরহ পুরাণ ইতিহাসাদির মনোরঞ্জন চিত্রে উপভাস-পিপাসা মিটাইতে পারিবেন। এ গ্রন্থ পড়িলে বিজ্ঞ হওয়া যায় ও নানা জ্ঞানের কথা বলিয়া মজুলিস্ জম্বকানো যায়। পঞ্জিকা ও রামায়ণ-মহাভারতের মত ইহা ঘরে ঘরে বিরাজমান হওয়া উচিত। গ্রন্থখানি লিখিয়া রাধিকাত্বা প্রত্নতত্ত্ববিনোদ উপাধি পাইয়াছেন।

প্রশ্নাস—মাসিক পত্র, বার্ষিক ১।০, লেখকগণ নাকি নবীন, কিন্তু দেখা দেখিলে তাহা মনে হয় না। অবদুলি, সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ।

কানা—৩২৭ বীডন স্ট্রীট।

ধার্মিক

আয়ুর্বেদ ও ধর্মনীতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট-স্থিত

আর্য্য আয়ুর্বেদ কলেজ

হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেন্ট উপাধি ও সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিশূষণ

সম্পাদিত।

বিষয়—বিবিধ সংবাদ, ভাবানুবাদ, জীবন বিচার, শ্রীশ্রীরামচন্দ্র-
কথামৃত, লোক টাকার কথা, জাতিভেদ লম্বকে ছ'চারিটি কথা, চিকিৎসা-
সংবাদ, গণবক্তার প্রশংসা।

১০ ট্যাল পাইসে বিক্রয়। স্বাস্থ্যসাধন নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক লউন।

প্রকৃতির শিক্ষা ।

উৎকৃষ্ট ভবিষ্যী পদ্য-পুস্তিকা । ইহাতে সৃষ্টির কুত্রমহৎ সমস্ত বস্তুকে, এক নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে পাইবেন । পড়িলে ভাবকের মন প্রকৃতির মনোহর ছবি দেখিয়া উন্মত্ত হয় ও ভক্তের হৃদয় স্রবীভূত হইয়া, ভগবানের দিকে শ্রোত্রোরূপে বহিরা যায় । মূল্য ১০ আনা । মফস্বলবাসী ১০ আনা ডাঃ ষ্ট্যাম্প কবিরাজ মহাশয়ের ২০২ নং কর্ণওয়ালিসের ঠিকানায় পাঠাইয়া লউন ।

“ঋষি”-পত্রিকার নিয়ম ।

- ১। “ঋষি” বাঙ্গালা মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (ছলজ্বা বিঘ্ন না হইলে) অবিচলিত-নিয়মে বাহির হইবে । কোন গ্রাহক কোন মাসের “ঋষি” না পাইলে তাহার পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জানাইতে হইবে । নচেৎ ইহার জন্ম আমরা দায়ী নহি । আকার (অনুান) ডিমাই ৮ পেজী ও ফর্ম্মা ।
- ২। মূল্য, অগ্রিম বার্ষিক ১ টাকা । প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৮০ ।
- ৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক-নম্বর-সহ নাম-ধাম-আদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন । নূতন গ্রাহকগণ “নূতন” এই কথাটির উল্লেখ করিবেন ।

ফুলের বাগান—প্রসিদ্ধ লেখক বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিতকৃত মূল্য ১ । অতীব সুন্দর । গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও সমালোচনা একাধারে । একটু পড়িলে সমস্ত না পড়িয়া থাকি যায় না । গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য ।

প্রেমগাথা—সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী প্রণীত । মূল্য ১ টাকা, ভাল বাধাই ১০, এমন সুন্দর সুরসাল প্রাণমুগ্ধকর কবিতা পুস্তক প্রায় দেখা যায় না । ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট । প্রাপ্তির ঠিকানা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান ।

ক্ষেত্রমোহন দে এণ্ড কোং

৪৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা ।

পূজার উপযোগী নানাবিধ বস্তাদি আমদানি করা হইয়াছে । কামিজের জন্ম উৎকৃষ্ট ছিটের কাপড় প্রভৃতির নমুনা ও মূল্যাদি, পত্র পাইলে পাঠান হয় । আসাম সিদ্ধ এখানে পাওয়া যায় । অর্ডার পাইলে জন্ম সময়ের মধ্যে পোষাক তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয় ।

Civil and Military Tailors, Army Contractors &c. &c.

English Cutter.

45, Radhabazar, — Calcutta.

খাষি।

২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। } { ১৩০৬ ভাদ্র। আগষ্ট। ১৮৯৯

বিবিধ সংবাদ।

শুণের সম্মান।

স্ত্রী। হ্যাঁগা! আজকাল যে প্রায় সকল সংবাদ, পত্রেরই একটা যুবকের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই, উনি কে ?

স্বামী। তাঁহার নাম পুরুষোত্তম পরাঞ্জপো, উনি বোম্বাই দেশের একটা দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, বিলাত গিয়া লেখাপড়া শিখিয়া তথাকার র্যাংগার পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন ; এমন গুণগ্রামের পরিচয় অদ্যাবধি কোনও ভারতবাসীই বিলাত গিয়া দেখাইতে পারেন নাই। তাই চতুর্দিকে একরূপ প্রশংসাসাধ্বনি উঠিয়াছে।

স্ত্রী। সে পরীক্ষায় কি সাহেবের ছেলেরাও প্রার্থী ছিল ?

স্বামী। ছিল বৈকি ? সাহেব ই ত সব ?

স্ত্রী। পরীক্ষক ছিলেন কাহার ?

স্বামী। সবই ইংরেজ !

স্ত্রী। তবে ত বড় আশ্চর্য্য ! স্বজাতির উপরে, পরাজিত প্রজাকে উচ্চস্থান দিতে ইংরেজেরা কোন প্রাণে সমর্থ হইলেন ? তাঁহাদের সংকোচ বোধ হইল না ? তাঁহাদের খুব ত বুকের পাটা !

স্বামী। ইংরেজের ত ঐটাই প্রধান গুণ ! তাঁহারা আত্মগরিমার উদ্দেশ্যে সত্যের অপলাপ করেন না।

আনন্দের বিষয়—পূর্বকালে কালিদাস রচনাছিলেন “কবিতা বদান্তি রাজ্যেন কিং?” অর্থাৎ যদি বর্ধাৎ কবিতাশক্তি থাকে, তবে রাজ্য হইয়া আবশ্যক কি? কেননা, রাজ্য প্রদাসবন্দীর নানা বিবাদ-বিপ্লব সঙ্ঘ করিয়া তবে রাজত্বের সুখ অমুভব করেন, কিন্তু কবি রাধাকে হুটা মিষ্ট কথার কুহকে নিমগ্ন করিয়া নির্ঝিয়ে সেই রাজত্বের অংশ ভোগ করিয়া থাকেন। পশ্চিম প্রদেশে মাড়বার-ভূমিতে মুরারি দান নামক মহাকবি বোধপুরাধিপতি সর্দার সিংহের নিকটে এইরূপ সম্মান সূচক এক লক্ষ টাকা, ১২৫ খানি গ্রাম ও মণি কাঞ্চনাদি পাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের এই পোড়া-বঙ্গ দেশে এরূপ প্রগতি লোকের পূর্বে ছিল না। তাই মহাকবি মাইকেল মধুসূদন অন্তিম মহা-অভাবে মহাকষ্টে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আনন্দের বিষয়, ঈদৃশ সং-কার্যের দিকে সকলেরই এক্ষণে মনের টান দেখা বাইতেছে। তাই ত্রিপুরা-ধিপতি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বাবু গগনেন্দ্র ঠাকুর, মহারাজা স্বর্ধ্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, রায় বতীন্দ্র নাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি মহাত্মগণ অল্প কবি হেমচন্দ্রকে আর্থিক সাহায্য করিতেছেন। ইহা দেখিয়া অল্প কবিদেরও বুক ভরসা জন্মে।

মহারাজার মহাগুণ—মহারাজা ভিক্টোরিয়া এক্ষণে বয়োজীর্ণ ও দৃষ্টিশক্তি-হীনা, তথাপি ঘোবনের জায় ভেল্লবিনী আছেন। তিনি এখনও পারিবারিক সমস্ত খুঁটিনাটি ও রাজকার্যের সকল আবশ্যক বিষয় নিজে না দেখিলে তৃপ্ত হন না।

নূতন আবিষ্কার—(১) একস্মরেজ্ নামক একটা রাসায়নিক বস্তু মানুষের অস্থি-মাংসময় আবরণ কাচের মত স্বচ্ছ হইয়া যায়, এবং তদ্বারা তিতর-কার নাড়ীভূঁড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। (২) যে কোনও গান, বক্তৃতা বা কথা চিরকালের তরে বাস্তব মধো ভরিয়া রাখা যায়। যতদিন পরে যখন ইচ্ছা তখনই ঐ বাস্তব খুলিয়া ঐ গান প্রভৃতি শুনিতে পাইবেন। (৩) সাধারণ কটোগ্রাফে ছবি ত নড়ে চড়ে না, কিন্তু এক রকম নূতন কটোগ্রাফ হইয়াছে তাহারারা মানুষের দোড়াদোড়ী, হাত পা নাড়া প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ জঙ্গিই চির-স্থায়ী করিয়া রাখা যায়। (৪) একরূপ বস্ত্র সৃষ্ট হইতেছে তদ্বারা বিনাভারে মানুষ বাসী বস্ত্রগণ পরম্পর কথা কহিবেন। (৫) আর এক রকম কল উদ্ভা-

বিত্ত হইতেছে তাহাঙ্করা মানুষের মুখ দেখিয়া মনের চিন্তা বৃদ্ধিতে পারা যাইবে। এসংকল ভাবিলে আবিষ্কারক পশুপত্য জাতিকে দেবতা বলিয়া মনে হয়।

চাসে ম্যালেরিয়া নাশ।—লাঙ্গল চক্ষিমা ম্যালেরিয়া দূর করিতে পারা যায়, তাহা বোধ করি আমাদের অনেক পাঠকেই বিদিত আছেন। বিলাতের একজন ডাক্তার ইতিমধ্যে যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে কুবিকার্যের জন্য মাটিতে যে গো মলমূত্রাদির মলমূত্র মিশাইতে হয়, তাহাতে স্বাস্থ্যহানির কোন ক্ষতিবাবনা নাই। আপাততঃ উহা হানিজনক বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে এই সকল মলমূত্র যতক্ষণ মাটিতে থাকে ততক্ষণ একটু দোষজনক হয় বটে, কিন্তু উদ্ভিদের অঙ্গপোষণে প্রযুক্ত হইলে আর কোন ভয় থাকে না। পল্লীগ্রামের মলমূত্র জমির সাররূপে পরিণত হয় বলিয়া তথ্য কতকগুলি রোগ দূষ্ট হয় না।

যথার্থ নিরামিষাশী—দুগ্ধ অথবা তাহা হইতে প্রস্তুত কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া নিরামিষভোজী বলিয়া শ্লাঘা করা যায় না, প্রকৃত নিরামিষভোজী হইতে হইলে, দধি দুগ্ধ যত ছানা মাখন প্রভৃতি সকলকেই ভাগ করিতে হয়। যেহেতু যে জন্তুর দুগ্ধ, তাহাতে সেই জন্তুর মাংসরস আছে।

কলিকাতার প্লেগ—কলিকাতায় যাহাতে প্লেগ প্রবিষ্ট না হয় তজ্জন্তু গবর্ণমেন্টে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ভগবৎকৃপায় এ চেষ্টা অদ্যাপি নিরর্থক হয় নাই। বর্তমান আগষ্ট মাসে বিলাত হইতে প্লেগ কমিশনের রিপোর্ট ভারতে আসিয়া পহঁছিবে। উহা দেখিবার জন্য অনেকেরই কৌতুহল আছে।

রেভিনিউ ও পবলিক ওয়ার্কস্—ডিপার্টমেন্ট ২৮শে অক্টোবর হোম্‌ডিপার্টমেন্টে ৩১শে অক্টোবর, ফাইনেন্স ৪ঠা নবেম্বর, মিলিটারী ১০ই নবেম্বর। উপরোক্ত তারিখে সিমলা-টপলের আফিস্ সকল বন্ধ হইবে। কেবল লেজিস্ লেটিভ ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে এখনও তারিখ স্থির হয় নাই।

লোক গণনা—আগামী ১৯০১ সালে এবার যে লোক গণনা হইবে, তাহার কমিশনার পদে, মিঃ এইচ এইচ রীজনি সাহেব নিযুক্ত হইবেন। তিনি অক্টোবর মাসে স্বদেশ হইতে প্রত্যাগত হইবেন।

দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত—দাক্ষিণাত্য এবং পাঞ্জাব প্রদেশে শস্তের অবস্থা ভাল নহে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হওয়ার কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইয়াছে, গবাদির তৃণ তৃণ পর্যাপ্ত স্থানে স্থানে দুগ্ধাপ্য হইয়া উঠিতেছে। এখন খুব বৃষ্টির আশঙ্কতা। আগরা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, রায় বেরিলী প্রভৃতি স্থানে শস্তের মূল্য বাড়িতেছে। জুনগড় রাজ্যে ও গুজরাটে বিলক্ষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। জুনগড় দরবার দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের পোষণের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, বোম্বাই প্রদেশস্থ আনন্দ নগর প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষের পূর্বলক্ষণ প্রকাশ পাইলেও স্থানে স্থানে বৃষ্টি হইয়া কিঞ্চিৎ উপকার হইয়াছে। বঙ্গদেশের সর্বত্রই অল্প অধিক বৃষ্টি হইলেও শস্তের মূল্য বাড়িতেছে। কিন্তু ধর্মপ্রাণ হিন্দুর ইহাই চির বিশ্বাস “জীব দিয়ছেন যিনি আহার দিবেন তিনি।”

নিতান্ত দুঃখের সহিত আমরা প্রকাশ করিতেছি, বিডনষ্ট্রীটস্থ প্রসিদ্ধ ডাক্তার কানাইলাল যে রায় বাহাদুর সি, আই, ই, মঙ্গলবার রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় ইহাখাম পরিভাগ করিয়াছেন। রায়ায়ন শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও আয়ুর্বেদে প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তিনি পাশ্চাত্যাকলে এদেশীয় গাছ গাছড়ার অদ্ভুত গুণ ও উপকারিতা প্রচারার্থ যে চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্ত ভারতবাসী মাত্রই তাঁহার নিকট ঋণী।

রেঙ্গুনের মহাজনেরা এখন হইতে টাকা কড়ি খার দেওয়া বন্ধ করিতেছে, প্রাপ্য টাকা কেবল আদায় করিতেছে, তাহার কোথায় যেন ভুলিয়াছে যে আগামী ডিসেম্বর মাসের কোনও একদিন পৃথিবীর ধ্বংস হইবে। ইহাতে নিম্ন শ্রেণীর ত কথাই নাই, মধ্যবিত্ত লোকেরও বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

নরওয়ে প্রদেশে ইতিমধ্যে নাকি এক আইন পাশ হইয়াছে। যে ব্যাসিকা শিরকাষা, হতা প্রস্তুত ও রক্ষণাদি গৃহকার্যে বিশেষ পারদর্শিতা না দেখাইবেন তাঁহার বিক্রয় হইবে না, এ আইন মন্দ নয়; বিলাসিতা নিবারণের জন্য প্রয়োজন। এই দরিদ্র বঙ্গদেশে কুড়িটাকা বেতনের গরীব গৃহস্থেরও পাচক ব্যাপন প্রচলিত হইলে চলবে না। এদেশেও ঐ আইনটির প্রচলন হইলে ভাল হয় না কি ?

আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যসমূহ এইবার পৃথিবীর সকল দেশেই প্রচার প্রাপ্ত

হইতে চলিল। কলিকাতার একটা সমিতি হইয়াছে। তাহার সদস্যেরা দেশীয় ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিতেছেন। পরীক্ষাশেষে ভাল ভাল ভেষজ-শুলি ইংরেজদের ভৈষজ্যাবলীতে সন্নিবিষ্ট হইবে। এই কমিটির অধ্যক্ষ সদস্য হবার সাহেব, সংপ্রতি, বিলাতে আছেন। সারবস্ত পাইলে, ইংরেজ-বেধান সেখান হইতেই লইতে পারেন, তাহাতে অভ্যস্ত নাই।

ভাষানুবাদ ।

সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষানুবাদ দ্বারা সাধারণের উপকার বা অপকার হইতেছে, উপস্থিত প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভাষানুবাদ দ্বারা আমাদের প্রভূত উপকার, সংসাধিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, ভাষানুবাদ দ্বারা আপাততঃ উপকার প্রতীতমান হইলেও ভিতরে ভিতরে অবনতির পথই পরিকৃত হইতেছে। স্মৃতরাং ইহা উপকার নহে—উপকারভাস মাত্র। কোন বিষয়ের তত্ত্ব নিকাশনে প্রয়াসী হইলে প্রথমতঃ উভয়পক্ষে কথার তারতম্য বিবেচনা করাকর্তব্য। অতএব দেখা যাউক ভাষানুবাদপ্রিয়গণ ভাষানুবাদের আধিক্য প্রদর্শনার্থ কীদৃশ যুক্তিনিবহের অবতারণা করেন এবং তৎপ্রতিপক্ষগণ তৎপ্রতিকূলেই বা কি বলিয়া স্মৃতসংস্থাপন করেন। যাহারা ভাষানুবাদের প্রশংসা করেন তাঁহারা বলেন যে, পূর্বকালে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গুরুকুলক্লিষ্ট হইয়া এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও জন সাধারণ যে যে গ্রন্থ সমূহের প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইতেন না, ভাষানুবাদের সাহায্যে আজ তাহা হস্তামলকের স্তায় সন্মুখে অবভাসমান হইতেছে। পুরাণাদির আলোচনা করিলে অবগত হওয়া যায়, অনেক সময়ে অনেক বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধিস্থ হইয়া স্বধিগণ অনাহারে অনিদ্রায় অনন্তচিত্তায় অতি দীর্ঘকাল তপস্তা করিতেন বটে, অবশেষে স্বীয় ভৃত ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে কষ্ট দেওয়াই শেষ ফল দাঁড়াইত। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বের কিছুই নীমাংসা হইত না। আজকালও হইতেছিল না। ভাষানুবাদরূপ নব বিভাকর বে' দিন হইতে বিজ্ঞানরূপ ময়ূখমালায় আমাদের জন্ম

স্বাস্থ্যরোগ আন্তরিক গাঢ় অন্ধকারকে দূর্য্যাপহৃত করিয়াছে, সেই দিন হইতে
 জগৎ যে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ইহা কে না বলিবে? আরও
 পূর্বে যিনি কোন এক গ্রন্থের কোন একটা তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিতেন,
 তিনি তাহা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় করিয়া এবং ধনাপেক্ষা নিভৃত স্থানে রাখিয়া,
 জন সাধারণের নিকট বাহা একটা মিথ্যা আড়ম্বর দেখাইতেন বা জন সাধা-
 রণকে তজ্জন্ম বাহা দ্বারা উৎকণ্ঠিত করিতেন, তাবানুবাদের সাহায্যে সেই
 স্বাৰ্থপর আশ্চর্য্য ব্যক্তি নিচয়ের সেই ব্রথা গরু ও মিথ্যা আড়ম্বর একেবারেই
 চূর্ণ হইয়াছে। এবং তত্ত্ব পিপাসু ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণকেও অনর্থক উৎকণ্ঠার
 অধীনতা স্বীকার করিতে হইতেছে না। আরও সুবিধা দেখুন ইতঃপূর্বে
 যদিও কেহ কেহ কথঞ্চিৎ কিছু কিছু শাস্ত্রমর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারিতেন,
 কালক্রমে একবার যদি তাহা বিস্মৃতি রূপ শতীর গুহার বিসর্জিত হইত,
 তাহা হইলে, তাহা আর প্রায়ই মিলিত না। যদিও কথঞ্চিৎ কিছু উদ্ধৃত
 হইত, তাহা আবার সন্দেহ-পাংশু বিলুপ্ত হইয়া বিভিন্নাকারে পরিণত
 হইত। তাবানুবাদ, আজ আমাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সেই শাস্ত্রীয় তত্ত্ব
 ঞ্জলিকে বিস্মৃতি পিশাচীর করাল কবল হইতে চির রক্ষা করিতেছে। যখন
 যে বিষয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতেছে, তখন তত্ত্ব বিধর স্মৃতি পথে
 উদিত না হইলেও লবমাত্র কারিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাবানুবাদ-
 পুত শাস্ত্র গ্রন্থ খুলিয়া দেখিলে, অনারাসে তত্ত্বস্থল অবতাসিত হইতেছে,
 ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ জন্মাইতেছে। তজ্জন্ম লক্ষ্যাত্র মানসিক পরিশ্রম বা
 ইতরের তোবামোদের আদৌ আবশ্যকতা হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে
 যে, তাবানুবাদের হিতকর আবির্ভাবে শাস্ত্রীয় সার নিচয় তাত্র ফলক খোদিত
 বর্ণাবলীর স্তায়, অন্ধভাবে প্রতিগৃহে সংরক্ষিত হইল। আরও ভাবিয়া
 দেখুন তাবানুবাদ হইবার পূর্বে অধিকাংশ সংস্কৃত গ্রন্থের নামই অবিদিত
 ছিল। যদিও স্থানে স্থানে কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনা
 চলিত, তাহা সার্কভোম বা সার্কজনীন নহে। তাবানুবাদ আমাদের সে
 শোচনীয় অভাব আজ [দূর] করিয়াছে। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় হইতে
 আরম্ভ করিয়া সামাজ্য একটা কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই সংস্কৃত শাস্ত্রের অন্না-
 ভাবে আলোচনা করিতে উৎসাহিত হইতেছেন। এবং সংস্কৃত গ্রন্থে

কি জিনিষ ও পূর্বকারীন আর্থাগণের যে কীদৃশী প্রতিভা, ভাষানুবাদই তাহা জগৎকে জানাইয়া দিতেছে বলিলে অত্যাক্তি হয় না। পূর্বে এই ভারত-ছিল এবং এই ভগবদগীতাও ছিল, কিন্তু উপস্থিত সময়ের ভ্রায় শ্রীমদ্ভগবদগীতার ঈদৃশ সমধিক সম্মানের দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন কি ? আজ ভাষানুবাদের প্রসাদেই আমাদের অমূল্য রত্ন আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের অনন্তসার সেই "স্বীতা" প্রতিগৃহে বিরাজিত। পূর্বে সংস্কৃত গ্রন্থের নাম শুনিলেই মনে যেন কি একটা ভয় আসিয়া অন্তঃকরণকে পশ্চাৎপদ করিয়া তুলিত। ভাষানুবাদরূপ পরিষ্কৃত পথের পথিক হইতে পারিয়া অন্তঃকরণ আজ সে ভয়ে ভীত নহে। ভাষানুবাদকে সহচর করিয়া শাস্ত্র বারিধির গভীরতম প্রদেশ হইতে ও সার রত্ন সংগ্রহে সাহসী হইয়াছে। ভাষানুবাদরূপ রত্নঃ সংঘর্ষে চিত্ত দর্পণের অজ্ঞান কালিমা আর নাই। এই রূপে ভাষানুবাদের কর্তী প্রশংসার কথা বলিব ? জোর করিয়া বলিতে পারি, জগৎ যদি তৎ পিপাসু হইয়া থাকে তবে এই ভাষানুবাদেই। জগৎ যদি উন্নত হইয়া থাকে তাহা ভাষানুবাদের অনন্তপরিণাম মাত্র। কি কায়িক কি বাচিক কি মানসিক সমস্ত উন্নতির ভাষানুবাদই অঙ্গুর।

পাঠক ! ভাষানুবাদ-প্রিয়গণের ভাষানুবাদ-প্রশস্তি শুনিলেন, প্রতিকূল বাদিগণ কি বলেন শুনুন। ভাষানুবাদ' খেদিগণ বলেন—ভাষানুবাদ সযত্নে যে কয়েকটা প্রশংসার কথা বলা হইয়াছে সব কর্তীই ভ্রাত্তের প্রলাপ বা অপ-রিণাম দর্শিতার অনন্ত ফল। আর্থাগণের মতে তাহাই অনিন্দিত ও আশ্রয়-ণীয় বাহা বলবৎ অনিষ্টের অননুবন্ধী হইয়া ইষ্টফল প্রদান করে। অর্থাৎ বাঁহার আপাত মধুর ভাবে বিসৃষ্ট হইলে পরিণামে তরুণের অনিষ্টের আশঙ্কা অনিবার্য্য তাদৃশকাৰ্য্য পরিভ্যাগ করা উচিত। যেমন শ্বেন যাগ আপাততঃ শক্রমারণরূপ ইষ্টফল প্রদান করিতে সমর্থ হইলেও পরিণামে প্রাণিহিংসারূপ অনিষ্টের অননুবন্ধী বলিয়া, তাহা প্রশস্ত বা শিষ্টগণের আচরণীয় নহে। সহজ কথায় পাণ্ডুরোগী তাত্ কালিক স্বথপ্রদ অন্নরস সেবন করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইলেও তান্নার প্রতি তিত্তিড়্যাদি ব্যবস্থা কি বিধেয় ? কখনই নহে। উক্ত ভাষানুবাদ আপাততঃ উপকারের আভাস মাত্র দর্শাইয়া উন্নতি মার্গকে কণ্টকাকীর্ণ করিতেছে ও ভয়ানক অনিষ্টের স্ত্রপাত করিতেছে বলিয়া

একান্ত পরিত্যজ্য। পূর্বে প্রথা ছিল উপনয়নান্তর লক্ষ্যার্থ্য অবলম্বন করতঃ ব্যায়ামাদি বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন করিবে, এবং গুরুর নিদেশে গৃহে প্রত্যমবৃত্ত হইয়া দারপ্রহণ করতঃ গৃহস্থ হইবে। বাহারা ভাবানু-
বাদের দ্বারা কৃতার্থমত্ত হইয়াছেন ; বেদাঙ্গা প্রতিপালন করাত পূর্বের কথা তাঁহারা ঈদৃশ নিদেশ নিচয় অশ্রদ্ধা করিতে দোষ দেখাইতে অসম্ভ্যতা প্রতি-
পালন করিতে খুবই উৎসাহিত হন। একে ত বেদাঙ্গার প্রতি অশ্রদ্ধা
প্রদর্শন করাই মহাপাপ। অধিকন্তু যথেষ্টাচারী হইয়া ইহকাল ও পরকাল
মঠে করিতে অহুমান্য ভীত নহেন ; যেহেতু শ্রীমদ্ভগবদগীতার ভগবান্ স্বয়ং
বলিয়াছেন।

“যো শাস্ত্র বিধিসুংস্কৃত্য বর্জতে কামচারতঃ।

ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন মুখং ন পরাংগতিং ॥

মহাত্মত্বের ঋষিগণ কর্তৃক বাহা পূর্বে সীমাসিত হয় নাই, আজ শত সহস্র
বৎসরও যে তাহার অধুমান্য সীমাংসার পথে আক্রমণ হইবে, ইহা ভাবাই
জাতি। তবে বাহা কিছু সম্প্রতি পরিকৃত বা নূতন বলিয়া প্রতীতি গোচর হয়,
তাহা আর্ধ্য শাস্ত্রের আমূল আলোচনার অভাব মাত্র। এখনও আমাদের
শাস্ত্রের গ্রন্থ পুস্ত্যনুপুস্ত্যরূপে আলোচনা করিলে, যে সমস্ত সার নিচয় দৃষ্টিপথে
আইলে, তাহার শতাংশের একাংশও আধুনিক কেহই আবিষ্কৃত করিতে
পারেন নাই বা পারিবেন না। ইহা একান্ত সত্য যে, বাহা ছিল না তাহা
আজও নাই ; বাহা নাই ভবিষ্যতেও তাহা হইবে না। স্বয়ং ভগবান্ই স্পষ্টা-
করে বলিয়াছেন।

“না সতো বিদ্যাতে ভাবো না ভাবো বিদ্যাতে সত্যঃ”।

(ভ্রমশঃ)

প্রহরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্মা মহাপাত্র।

গোপীবর্জতপুত্র—মেদিনীপুর।

দ্রব্যগুণ বিচার ।

প্রয়োগ—ছোট এলাচ, ও বড় এলাচ উভয়ই লোকে প্রধানতঃ পানের মসলা স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাতে পানের উপকারিতা বর্দ্ধিত হয়। ছোট এলাচ তরকারী ব্যঞ্জন ও মাংসাদি পাককালে সৌরভের জন্মও ব্যবহৃত হয়। কবিরাজীতে শুধু ছোট এলাচ প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু শুধু বড় এলাচ সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বড় এলাচের শুঁড়া কবিরাজেরা শ্বাসরোগের ও 'বায়ু রোগের' ঔষধের অল্পপান স্বরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ছোট এলাচ, অজীর্ণ ও উদরাগ্নান নাশক ঔষধ সমূহের মধ্যে উপকরণ স্বরূপ সর্বদাই দৃষ্ট হয়। উভয় এলাচই একত্রে কবিরাজী পাকতৈলে গন্ধপাকে প্রযুক্ত হয়।

বড় এলাচ, কর্পূর ও মিশ্রী শূলের বাথাকালে মুখের মধ্যে রাখিয়া ক্রমে চুষিলে অনেকটা শাস্তি হয়। বড় এলাচ, বচ, বষ্টিমধু ও মিশ্রী একত্রে সিদ্ধ করিয়া গরম গরম কাথ পান করিলে শুষ্ক কাসের বেগ নিবারিত হয়। উদরের বায়ুনাশের পক্ষে ছোট এলাচ বড় উপকারী, ইহার সহিত লবঙ্গ, মউরি, হিং প্রভৃতি যোগ করিয়া বড়ী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পেট ফাঁপা, পেট কামড়ান প্রভৃতি উপসর্গ দূরীভূত হয়। সোণামুখী প্রভৃতি রেচক দ্রব্য সেবনে পেট কামড়ানি উপস্থিত হয়, তৎসমুদায়ের সহিত ছোট এলাচ সংযুক্ত হইলে ঐ উপদ্রব আর থাকে না। ছোট এলাচ হইতে এক অতি উৎকৃষ্ট পাতলা তৈল ব্যহির করা হয়, তাহাকে "ক্যালিপুটী অএল" বলে। ইহা অতীব তীব্র স্মৃগন্ধি, ১০।১৫ ফোঁটা জলের সহিত খাইলে পেট খোঁচানি, পেট ফাঁপা সারে এবং বাহিরে ব্যথা স্থানে মালিশ করিলে উহা সদ্য নিবারিত হয়। ক্যালিপুটী অয়েল, তার্গিন তৈলে ও কেরোসিন তৈলে, একত্র মিশাইলে অতি উত্তম বাতব্যথা-নাশক মালিশের তৈল প্রস্তুত হয়।, ক্যালিপুটী অয়েল সত্তা জিনিস, বড় বনিকের দোকানে বা ডাক্তার খানার কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার এক খড়িকা প্রমাণ পানে দিলে উহাতে কতক গুলি এলাচের দানার অপেক্ষাও অধিক মৌগন্ধ হয়।

ওল।

বাঙ্গালা নাম—উপরি-উক, হিন্দী—জমিন কন্দ বা ওল, ইংরাজী—*Amorphophallus paniculatis*. সংস্কৃতপরিভাষা—শূরণঃ কন্দ ওলশ্চ কন্দ-লোহর্শয় ইত্যপি। সংস্কৃত নাম—শূরণ, কন্দ, ওল, কন্দল এবং অর্শোয়। আরো এই কয়টা নাম আছে—কণ্ডুল, মুকন্দী, স্থলকন্দক, হুর্নামারি, সুবৃত্ত, বাতারি, তীত্র, কচাকন্দ।

ইহা একপ্রকার এক শুভ্র-বৃক্ক ছদ্মাকার গুল্মের গোলাকার কন্দ বা মূল, ওজনে এক পোরা হইতে ২৩ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ওল মনুষ্যের খাদ্যের মধ্যে একটা ভাল জিনিস। গৃহ-জাত ও বস্ত্র এই দুই প্রকারের আছে, বস্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার ও অধিক তীক্ষ্ণ। খাদ্যরূপে ব্যবহারের পক্ষে অবশ্য গৃহজাতই ভাল, বস্ত্রগুলির রস কতিপয় কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ওল সমুদ্রের বুর্গের ভারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, কোন গুলি অধিক লাল, কোনগুলি অপেক্ষাকৃত শাদা, কিন্তু ইহাদের জাতিগত বড় কিছু ভেদ নাই। “মাজ্রাজী ওল” নামে এক প্রকার তিন্নজাতি ওল কলিকাতায় মিউনিসিপাল বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে, ইহা অতি সুন্দর তরকারী, কাঁচা চিবাইলেও গলা চুলকারনা।

শূরণো দীপনো রক্ষঃ কবারঃ কণ্ডুলং কটুঃ।

বিষ্টভী বিশদো রচ্যঃ কফার্শঃকৃত্তনো লঘুঃ ॥

বিশেষা দর্শসে পথ্যঃ প্রীহ গুল্ম বিনাশনঃ।

সর্কেষাঃ কন্দশাকানাং শূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥

দক্ষণাং রক্তপিত্তাণাং কুষ্ঠানাং ন হিতো হি সঃ।

সন্ধানযোগ সস্ত্রাপ্তঃ শূরণো গুণবত্তরঃ ॥

রস—কটু ও ঈবৎ কবার ; বিপাক—কটু ; বীর্ঘ্য—উষ্ণ, গুণ—দীপন, রক্ষ, কণ্ডুলক, বিষ্টভী (অধিক খাইলে পেট ভার রাখে) বিশদ (রেমহীন এবং মুখের ক্লিন্নভাব দূরীভূত করে) রচিজনক, কফ ও অর্শোয়, লঘু, বিশেষতঃ অর্শোরোগীর সুপথ্য। সমস্ত কন্দশাকের মধ্যে ওলই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু ইহা উৎকট দক্ষরোগী, কুষ্ঠরোগী ও রক্তপিত্তাক্রান্ত

ব্যক্তির পক্ষে উপকারী নহে। সন্ধান যোগে অর্থাৎ যোগ সম্বন্ধী প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত করিলে, ইহা আরো অধিক গুণকর হয়।

প্রভাব—অর্শঃ, প্লীহা ও গুল্মনাশক। ঔষধের উপকরণার্থে বস্ত্র ওলই প্রশস্ত। শাস্ত্রে যদিও ঔষধের উপকরণ বিবৃতি কালে শুধু “শূরণ” শব্দ লিখিত আছে এবং তৎপূর্বে “বস্ত্র” এই বিশেষণ সংযুক্ত হয় নাই, তথাপি তৎ স্থানে বস্ত্র ওলই বুঝিতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয় তাঁহার অমুবাদ পুস্তক সমূহে সর্বত্রই শূরণ শব্দের অর্থ বস্ত্র ওল করিয়াছেন, এতদ্বারা আমাদের মতে তিনি বিশেষ বুদ্ধি ও অমুসন্ধিসার পরিচয়ই দিয়াছেন। বস্ত্র ওলে এই ঔষধীয় শক্তি আসিল কোঁথা হইতে? ইহা যে অর্শঃ গুল্ম প্রভৃতি রোগের প্রতীকারক, তাহার মূলভূত কারণ কি? কারণ কেবল ইহার অধিকতর তীক্ষ্ণ ও কটুত্ব। এই গুণেই ইহা আয়ত্ন। আয়ত্ন বস্ত্র ছাড়া অর্শঃ প্লীহাদির প্রশান্তি কে করিতে পারে? বস্ত্র ওল চিতামুলের * প্রায় সম গুণ। একটু খানি মুখে বা অন্ত কোমলস্থানে লাগাইলেই যে ইহার জ্বালা উৎপন্ন করে, এই শক্তি দ্বারাই ইহার অগ্নি কারক ও ক্ষুধাজনক। আদ্য প্রভৃতি ঝাঁজাল জিনিস চিবাইলে মুখ মধা হইতে যেরূপ লালাশ্রাব হইতে থাকে, উদর-গহ্বরে বস্ত্র ওল প্রভৃতি প্রবিষ্ট হইয়াও সেইরূপ পাচক পিত্তকে সমধিক মাত্রায় নিঃসারিত করায়। সুস্বাদু সুখসেব্য ওলে এ গুণটা বড় বেশী নাই; কিন্তু উহাও অস্ত্রান্ত্র গুণ অবশ্য বর্তমান,—ইহা পুষ্টিকারক ও সারক কিন্তু ঔষৎ আয়ত্ন।

ঈদৃশ বিচার শুনিয়া বোধ হয় পাঠকের পক্ষে উভয় সঙ্কট বোধ হইতেছে—যেটা অধিক গুণকর তাহা অখাদ্য; আর যেটা সুখসেব্য, তাহাই অল্প গুণদায়ক। এরূপ স্থলে কর্তব্য, বাহারা ওল-প্রিয় তাঁহারা বাছিয়া বাছিয়া শুধু ভাল ওল খাইরেন না এবং বস্ত্র ওলকে আর অতঃস্থগা করিবেন না। উহা-কেও মধ্যে মধ্যে ভাতে সিদ্ধ করিয়া ভাতের খ্রাসে লুকাইয়া কোনরূপে গলাধঃ করিবেন। কিন্তু অল্প চাউসে বেশ অধিক ওল সিদ্ধ না করা হয় তাহা হইলে সমস্ত ভাত কটুরসারিত হইতে পারে।

* চিতামুল একটা আয়ত্ন বস্ত্র, শাস্ত্রে ইহার একটা নাম “বহ্নি”।

লোকে ওলের ডালনা, বড়াভাজা, অম্বল, আচার ও চাটনী করিয়া খাইয়া থাকে, কিন্তু প্রধানতঃ ইহা ভাতে দিয়াই অধিক লোকে আহাৰ করে।

ওলের চাটনী—খাস, অন্নপিত্ত ও অর্শোরোগীর উপকারী; ইহার প্রস্তুত করণ প্রণালী এই—প্রথমে এই উপকরণ গুলি যোগাড় করিবে যথা,—
ওল এক পোয়া, পুরাতন তেঁতুল শাঁস দেড় পোয়া, টুকুগুড় বা পরিষ্কার চিনি এক পোয়া, খাঁটা সরিষার তৈল এক পোয়া, সৈন্ধব লবণ চারি আনা, হরিদ্রা বাটা দেড় তোলা, রাইসরিষা বাটা হই তোলা, ভাঙ্গ সরিষার গুঁড়া আধতোলা, ভাজা মেথির গুঁড়া আধতোলা, ভাজা পাঁচ ফোঁড়নের গুঁড়া এক সিকি।

প্রথমে ওলের খোসা ছাড়াইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ২৩ ঘণ্টা শীতল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন জলে ছতিন বার ধুইয়া ফেলিবে। ২ সের জলে ঐ ওল সিদ্ধ করিয়া ১ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল জলে ধুইবে ও কাপড়ে টাঙ্গাইয়া জল ঝরাইবে। একটা মুখ-চওড়া হাঁড়িতে বা কড়াতে তিন ছটাক তৈল চড়াইয়া দিয়া তাহাতে ওল গুলি দিয়া খুসী চালনা দ্বারা গুলিয়া দিবে। যখন ওল একটু বাদামীরং হইবে তখন তাহাতে হরিদ্রা বাটা, সরিষা বাটা, ও লবণ দিয়া নাড়িবে ও ১ সের জলে তেঁতুল গুলিয়া উছাতে ঢালিবে, একটু টানিয়া আসিলে অবশিষ্ট ১০ ছটাক তৈল দিবে, ফুটিয়া উঠিলে অবশিষ্ট গুঁড়া মসলাগুলি ফেলিয়া অন্নরূপ নাড়া চাড়া করিয়া নামাইয়া কাচ, প্রস্তর বা মুৎপাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহা পনের ঘোল দিন পর্যন্ত ভাল থাকে।

তাম্র ভঙ্গ করিয়া, পরে ওলের মধ্যে পুরিয়া পুনরায় পোড়াইলে ঐ ভঙ্গ নির্দোষ হয়, এই প্রথাকে তাম্রের অমৃতীকরণ বলে।

ডাঃ বরটন বলেন কীটাদি দংশন করিলে, দষ্টস্থানে বস্ত্র ওলের পুলটীস লাগাইলে উপশম হয়। বোম্বাই সহরে চাকা-চাকা-কাটা গুড় ওল বণিকের দোকানে বিক্রয় হয়। উহা জলে সিদ্ধ করিয়া বারমাসই খাওয়া যায়। লাল আপেক্ষা শাদা ওল গুলি কম ক্ষুঁচু কুটে। বুনো ওলও শিথিল জমিতে চাস করিলে ক্রমে উহা সুখাদ্য হয়। ওল দশ পনের সের পর্যন্ত বড় হইতে দেখা গিয়াছে।

ওলের সামুদ্রিক চূর্ণ, অন্নপিত্তের বৃহৎ কুথাবতী গুড়িকা, বিশেষতঃ অর্শের বৃহৎ শূরণ মৌদকে ওল আবশ্যিক হয়।

কইমাছ।

বাক্সালা নাম—ঐ, হিন্দী—কবই, সংস্কৃত—কবিকা, এ মৎস্ত অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন, কলিকাতা-অঞ্চলে “বগুরে কই” বড় প্রসিদ্ধ। ইহার মাথা মোটা, শরীর ক্লশ, দেখিতে অধিক বড় নয়, বশোহর জেলার অনেক গুকুর খানা ডোবা আছে, তাহাতে কইমাছ বধেষ্ট, উহা কলিকাতার আনীত ও বিক্রীত হয়,—রাস্তার আসিতে আসিতে মৃতপ্রায় ও শুষ্ককার হইয়া যায় বলিয়াই ঐরূপ দৃষ্ট হয়। কলিকাতার নূতন বাগারে সময়ে সময়ে খুব বড় বড় কই বিক্রয় হয়, ওজনে একপোয়া দেড়পোয়া। শ্রোতের জলে কই থাকে না, প্রারম্ভে শ্রোতোহীন জলাশয়ে থাকে, ময়লা জলে অধিক উৎপন্ন হয়। এই মৎস্তের জীবন শীঘ্র বাহির হইতে চাহেনা, খণ্ড খণ্ড হইয়া তৈলাপরি নিষ্কিণ্ত হওয়া গুর্যাস্ত নড়িতে থাকে ও হৃদয়বান্ মর্শকের মর্শ স্পর্শ করে।

কবিকা মধুরা স্নিগ্ধা কফনা ক্ৰচিকারিণী ।

কিকিৎ পিত্তকরী বাতনাশিনী বহ্নিবর্দ্ধিনী ॥

রস—মধুর; বিপাক—মধুর; বীৰ্য্য—উষ্ণ; গুণ—স্নিগ্ধ (শীতল ও চৰ্ব্বীয়ুক্ত) কফন, ক্ৰচিকারক, কিকিৎ পিত্তকর, বায়ুনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক। “কফনা” এই পাঠস্থানে “নাতিকফক্ৰুৎ” এই মধ্বযুক্ত পাঠ হওয়া উচিত। উক্ত পাঠ বোধ হয় লিপিকর প্রমাদে হইয়া থাকিবে। যেহেতু বাস্তব পক্ষে কইমাছ (এমন কি, প্রায় কোনও মাছই) কফন নহে, বরং কফজনক, তবে কই মৎস্ত ততটা কফজনক নহে। প্রথম পংক্তিটী এইরূপ হইলে ভাল হইত যথা—কবিকা নাতিকফক্ৰুৎ বাহুঃ স্নিগ্ধা ক্ৰচিপ্রদা। অথবা সোজামুজি “কফনা” স্থানে “কফদা” করিলে আর গোল থাকেনা।

প্রয়োগ—এই মাছ স্নিগ্ধ, স্বখাদ্য, স্নাতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে তরকারীর সহিত মিলিত হইয়া পাক-নিপায় হয় তাহাকেই স্নমধুর করে; শুধু মাধুর্য গুণে প্রসিদ্ধ নয়, ইহার উপকারিতাও বধেষ্ট। এই মৎস্ত বেকরূপ ক্ষুদ্র তত্ব লনায় ইহাতে সমধিক পরিমাণে তৈলাংশ আছে। এই তৈলাংশ দেহের

পুষ্টিসাধক, ও চক্ষুর জ্যোতিঃ বর্ধক। “কসু কয়সু” নামক ওষধের পদার্থ ইহাতে অধিক পরিমাণে বর্তমান, তজ্জন্ত ইহা ক্ষৌণমৃত্তিক ও ক্ষৌণশুক ব্যক্তির পক্ষেও উপকারী। রোগীর পথ্য বলিয়া ইহা বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ; যে রোগ হইতেই মুক্তিলাভ হউক, চিকিৎসক কই (ও মাণ্ডর) মৎস্তের ঝোল প্রথমে ব্যবহা করেন, কিন্তু তথাপি ইহার নিষ্ফল হুণে অস্বাস্থ্য রোগ অপেক্ষা ইহা উদরাময়ের বা অস্ত্র রোক্ষ্যকারক রোগের পরেই অধিকতর উপযোগী হইয়া থাকে। উদরাময় বা অজীর্ণরোগী ইহার সুস্বাদু প্রালোভিত হইয়া বেন অধিক খাইয়া না ফেলেন, কেননা আভ্যন্তরিক তৈলাংশ বশতঃ ইহা কিঞ্চিৎ গুরুপাক। মৎস্ত অপেক্ষা উক্ত মৎস্তের ঝোলই ত্রৈলুপ রোগীর উপকারী। কৈলাছের ডিম্ব বড়ই সুকোমল ও সুখাদ্য। ইহা এই মৎস্ত অপেক্ষাও লঘু-পাক, সুতরাং অজীর্ণরোগীও নির্ভয়ে খাইতে পারেন। দেখা যায়, বাঁহারা বলিষ্ঠ ও ভোজন বিলাসী তাঁহারা প্রায়শঃ এই মৎসাকে রোগীর পথ্য বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন; কিন্তুবেশ পুষ্ট ও মাংসল মৎস্য পাওয়া গেলে ও নিপুণ পাচকের হাতে পড়িলে ইহা তাঁহাদের নিকটে নিশ্চয়ই আদরণীয় হয়।

জীবনব্যহার ইহার কাঁটা হইতে যেমন সাবধান থাকা উচিত—(যেহেতু হাতে ফুটিলে তজ্জনিত ব্যথা বা ক্ষত শীঘ্র সারেনা) রন্ধন-প্রস্তুত অবস্থায় ও আহার কালে ইহার কাঁটা সতর্ক স্বরণ রাখা উচিত, নতুবা ভোজন সময়ে অজ্ঞাতসারে ইহার ভীষণ কটক গলমধ্যে বিদ্ধ হইয়া প্রাণিহিংসা-পাতকের কিয়দংশে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া দেয়।

কচ্ছপ ।

বাঙ্গালা নাম—কাছিম বা কাছুরা; হিন্দী—কচ্ছুরা; ইংরাজী Tortoise সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কচ্ছপো গৃঢ়পাৎ কৃষ্ণঃ কুমঠো দৃঢ় পৃষ্ঠকঃ। সংস্কৃত নাম—কচ্ছপ, গৃঢ়পাৎ, কৃষ্ণ, কুমঠ, দৃঢ়পৃষ্ঠক।

কাছিম অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন, ইহারা উভচর ও ক্ষুদ্র-বহু ভেদে স্তন্যপায়ীকারের আছে; অর্ধখানা নারিকেলের মালায় মত ছোট কাছিম গুলি প্রায়শঃ পুকুরেই দেখা যায়; বড় বড় গুলির আবাসস্থান নদ-নদী। সমুদ্রে

এত বৃহৎকার কাছিম আছে যে তাহার পৃষ্ঠাধাতে সাধারণ নৌকাকে নড়াইয়া দেয়; কলিকাতার পশুপক্ষি প্রদর্শিনী গৃহে একটা বড় কাছিমের হাড় আছে তাহার মধ্যে ছ-তিন জন মনুষ্য শরন করিতে পারে।

এক রকমের ছোট ছোট কাছিম আছে, তাহার। স্থলচর,—পাড়াগাঁয়ে বাশবাগানের পচা পাতীর মধ্যে লুকায়িত থাকে, ইহাদের মাংস জলচরের অপেক্ষা অধিক সুস্বাদু ও উষ্ণবীৰ্য্য। কচ্ছপ নিজের অস্থিময় আবরণের মধ্যে পা লুকাইয়া রাখে, তজ্জন্ত ইহার সংস্কৃত নাম “গূতপাৎ”। ইহারা ভর পাইলেই পা ও মাথা ঐ ভাবে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করে।

কচ্ছপেরী জলাশয়ের তটে উঠিয়া মাটা খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে ডিম পাড়াইয়া যায়, ঐ ডিম সময়ে ফুটিয়া ছানা বাহির হইয়া জলে প্রবেশ করে। ডিম গুলি শাদা, হাঁসের ডিমের অপেক্ষা একটু ছোট।

কচ্ছপো বলদো বাতপিত্তহৃৎ পুংস্বকারকঃ।

রস—মধুর; বিপাক—মধুর; বীৰ্য্য—শীত; গুণ—বলকারক, বাতপিত্ত নাশক; প্রভাব—পুংস্বকারক (রতিশক্তি বর্দ্ধক)।

প্রয়োগ—কাছিমের মাংস বঙ্গ ও বেহার অঞ্চলের কোন কোন স্থানে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে ইহার মাংস বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ইহার মাংস বেশ সুস্বাদু এবং শৈত্যগুণাবিত বলিয়া বায়ু ও পিত্ত প্রধান ব্যক্তিদিগের পক্ষে বড় উপকারী। ক্রীণতক্র পুরুষত্বহীন ব্যক্তি-ইহার মাংস ভোজনে ফল পাইতে পারেন। কচ্ছপ মাংস বায়ুপ্রধান পক্ষাঘাত রোগীর উপকার করে।

কচ্ছপের মাংস পুরাতন ঘূতে সৈন্ধব চূর্ণ সহকারে স্নেহং ভাজিয়া লইয়া কাপড়ের পুঁটলীর মধ্যে রাখিয়া গরম গরম সেক দিলে বাত ও পক্ষাঘাত রোগে বিশেষ উপকার দর্শায়। বাত ব্যাধি দ্বারা মুখ বেঁকিয়া গেলে বিকৃত স্থানে ঐ স্নেহ দিতে হয়।

কাছিমের পৃষ্ঠের চামড়া দ্বারা পূর্বে চাল আবৃত হইত, এক্ষণে বন্দুকের বহল প্রচলন হওয়ার উহার ব্যবহার কমিয়াছে। ঐ চামড়া দ্বারা এক প্রকার জুতাও পূর্বে প্রস্তুত হইত, তাহা অত্যন্ত কঠিন ও দৃঢ়, সত্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে উহা ক্রমে পরিভ্যক্ত হইয়াছে। কচ্ছপের নিয়ন্ত্রণের অর্থাৎ উন্নয়নের

শুভ্রবর্ণ কঠিন অস্থি চর্ম্মকারেরা অস্ত্র ধার দিবার অস্ত্র; ও তদুপরি পা রাখিয়া বাটালি ধারা জুতা প্রভৃতির চামড়া কাটিবার অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে ।

কঞ্চট ।

বাক্যনাম—কাঁচড়া বা কাঁচড়া দাম; হিন্দী—জল চোলাই; ইংরাজী—*maranthas Trinifolius*. সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—পানীয়ং তণ্ডুলীয়ং যৎ-তৎ কঞ্চট-
বুদ্ধান্তম্ । সংস্কৃত নাম—পানীয় তণ্ডুলীয়, অস্ত্রনাম—মারিব, জলজ ।

ইহা একপ্রকার "পানা" জাতীয় জলজ গাছ। ময়লা পুকুরগুলিকে এত আচ্ছন্ন করিয়া থাকে যে, জল দেখা যায় না। এইহার পাতা প্রায় ১ ইঞ্চি চওড়া, দীর্ঘ পোল ও পুরু; সাধারণ পানার যেমন পাতা ই সর্ব্ব্ব, ডাঁটা বা কাণ্ড থাকেনা, ইহার তেমন নয়, ইহার গাছ জলের নীচে নীচে বিস্তৃত হইয়া যায়। পাতা চিবাইলে একটু আঠা বোধ হয়।

কঞ্চটং তিক্ত কষায়ং রক্তপিত্তানিলাপহং ।

রস—তিক্তকষায়; বিপাক—মধুর; বীৰ্য্য—শীত; গুণ—রক্ত-
পিত্তহর ও বায়ু নাশক ।

প্রয়োগ—কাঁচড়া পাতার রস উদরাময়ে উপকারী। জ্বালাযুক্ত মেহ ও বেতপ্রদর রোগে বিশেষ ফল দর্শায়। কাঁচড়া অস্ত্রান্ত্র সম-গুণ উপকরণের সহিত যুক্ত হইলে সমধিক উপকারী হইয়া থাকে যথা—

কঞ্চট দাড়িম জম্বু শূঙ্গাটক পত্র হ্রীবেরম্ ।

জলধর নাগর সহিতং গন্ধামপি বেগিনীং স্কন্ধাৎ ।

কাঁচড়া পত্র, দাড়িম পত্র, জাম পত্র, পানিকল পত্র, বালা, বৃত্তা, ও শুঠ ইহাদের কাথ বেগবতী গন্ধাকেও রোধ করিতে পারে, অর্থাৎ অতীব হৃদয় অতীমারের বেগও নিবারণ করে ।

শাস্ত্রোক্ত "গ্রহণীকথাট" "জাতীকলাদ্যা বটী" ও প্রহণ্যবিকারের "কঞ্চটা-
কলেহ" প্রকৃতি ঔষধে কাঁচড়াপাতা আবশ্যিক হয় ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ।

(শ্রীম—কথিত) ।

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রতি শ্রীশ্রীপরমহংস
রামকৃষ্ণের উপদেশ ।

অগ্রহায়ণ শুক্লা চতুর্থী তিথি । বৃহস্পতিবার । ইংরাজি ১৪ই
ডিঃসেপ্তর ১৮৮২ সাল ।

দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভগবান রামকৃষ্ণকে
দর্শন করিতে আসিয়াছেন । • সঙ্গে ৩৪টা ব্রাহ্ম ভক্ত । পরমহংস দেবের
পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত বলরামের সহিত ইহারা নৌকা করিয়া কলিকাতা হইতে
আসিয়াছেন । শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নকালে সবে একটু বিশ্রাম করিতেছেন ।
রবিবারেই বেশি লোক সমাগম হয় । যে লোক ভক্ত একান্তে তাঁহার
সহিত কথোপকথন করিতে চান, তাঁহার প্রায় অল্প দিনেই আসেন ।

পরমহংসদেব তক্তাপোসের উপর উপবিষ্ট । বিজয়, বলরাম মাষ্টার, ও
অন্যান্য ভক্তেরা পশ্চিমাশ্রু হইয়া তাঁহার দিকে মুখ করিয়া কেহ মাহুরের
উপর, কেহ শুধু মেজের উপর বসিয়া আছেন । তাঁহার ঘরের পশ্চিমদিকের
দ্বারমধ্যদিয়া ভাগীরথী দর্শন করিতেছিলেন । শীতকালের স্থিরা স্বচ্ছসলিলা
ভাগীরথী । দ্বারের পরই পশ্চিমের অর্দ্ধমণ্ডলাকার বারাণ্ডা, তৎপরেই
পুষ্পোদ্যান । তার পর পোস্তা । পোস্তার পশ্চিমগায়ে পুণ্যসলিলা কলুষ-
হারিণী গঙ্গা যেন ঈশ্বরমন্দিরের পাদমূল আনন্দে ধৌত করিতে করিতে
বাহিতেছেন ।

শীতকাল, তাই সকলের গায়ে কাপড় । বিজয় শূলবেদনায় দাক্ষণ যন্ত্রণা
পান, তাই সঙ্গে শিশি করিয়া ঔষধ আনিয়াছেন—ঔষধ সেবনের সময় হইলে
ধাইবেন ।

বিজয় এখনও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একজন বেতনভোগী আচার্য্য ।
সমাজের বেদীর উপর বসিয়া উপদেশ দিতে হয় । আবার সমাজের সহিত
নানাবিষয়ে মতভেদ হইতেছে । কৰ্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, কি করেন

স্বাধীনভাবে কথাবার্তা বা কাণী করিতে পারেন না। বিজয় অতি পবিত্র বংশে—অষ্টমত গোস্বামী বংশে—জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অষ্টমত গোস্বামী জানী ছিলেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করিতেন; আবার ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ভগবান চৈতন্যদেবের একজন প্রধান পার্শ্ব, হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেন—এত আত্মহার্য হইতেন যে নৃত্য করিতে করিতে পরিধান বস্ত্র খসিয়া যাইত। বিজয়ও ব্রাহ্মণমাজে আসিয়াছেন—নিরাকার পরব্রহ্মের চিন্তা করেন—কিন্তু মহাভক্ত পূর্বপুরুষ শ্রীঅষ্টমতের শোণিত ধমনীমধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল—শরীর মধ্যস্থিত হরিপ্রেমের বীজ এখন প্রকাশোন্মুখ কলিকাল প্রতীক্ষা করিতেছে। তাই তিনি ভগবান রামকৃষ্ণের দেবহর্ষিত হরিপ্রের্বে 'গর্গর মাতোয়ারা' অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। মন্ত্রমুগ্ধ সর্প যেমন ফণা ধরিয়া সাপুড়ের কাছে বসিয়া থাকে, বিজয়ও পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত ভাগবত কথা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট বসিয়া থাকেন। আবার যখন তিনি হরিপ্রেমে বালকের স্তায় নৃত্য করিতে থাকেন বিজয়ও তাঁহার সঙ্গে নাচিতে থাকেন।

একটি ছোকরা নাম রিকু, এঁড়েরদে বাড়া, গলায় ক্ষুর দিয়া শরীর ত্যাগ করিয়াছিল, তাহারই কথা হইতেছিল।

(সংস্কার ও শেষজন্ম)

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)। দেখ, এই ছেলেটা শরীর ত্যাগ করেছে শুনলুম, তাই মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে। এখানে আসতো, স্কুলে পড়তো, কিন্তু বলতো সংসার ভাল লাগে না। পশ্চিমে গিয়ে কোন আত্মীয়ের কাছে কিছু দিন ছিল। সেখানে নির্জনে মাঠে বনে পাহাড়ের কাছে সর্ষদা বসে ধ্যান করতো। বলছিল যে কত কি ঐশ্বরীয় রূপ দর্শন করতো।

“বোধ হয় শেষজন্ম। পূর্বজন্মে অনেক পাপ করা ছিল। একটু বাকি ছিল, সেই টুকু বৃষ্টি এবার হয়ে গেল।”

“পূর্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়। তুমিই একজন শবসাধন করছিল গভীর বনে; ভগবতীর আরাধনা করছিল। কিন্তু সে অনেক বিতর্কিত।

দেখিতে লাগিল শেষে তাকে বাধে নিরে গেল। আর একজন বাধের ভয়ে নিকটে একটা গাছের উপর উঠেছিল। সে শব্দ ও অস্তিত্ত পূজার উপকরণ তৈয়ার দেখে নেমে এসে আচমন করে শবের উপর বসে গেল। একটু অপ-
করতে না করতে মা লাক্ষ্মীংপর হলেন ও বল্লেন 'আমি তোমার উপর প্রসন্ন
হয়েছি, তুমি বর নাও।' সে ব্যক্তি মার পাদপদ্মে প্রণত হয়ে বল্লেন মা। একটা
কথা আগে জিজ্ঞাসা করি। তোমার কাণ্ড দেখে আমি অবাক হয়েছি।
যে ব্যক্তি এত খেটে, এত আয়োজন করে, এত দিন ধরে, তোমার সাধন
করছিল তাকে তোমার দয়া হইল না, আর আমি কিছু জানিনা শুনিনা,
ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন আমার উপর এত রূপা হ'ল।
ভগবতী হাসিতে হাসিতে বল্লেন, বাছা তোমার জন্মান্তরের কথা স্বরণ নাই।
তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্বী করেছিলে, সেই সাধনরথে তোমার একরূপ
ছোটপাঠ হয়েছিল, তাই তুমি আমার দর্শন পেলে। এখন কি বর লবে বল।

(মুক্ত পুরুষ ও শরীর ত্যাগ)

একজন ভক্ত। আত্মহত্যা করেছে শুনে ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আত্মহত্যা করা মহাপাপ। ফিরে ফিরে সংসারে আসতে
হবে আর এই সংসার-যন্ত্রনা ভোগ করতে হবে।

"তবে যদি ঈশ্বরের দর্শন হয়ে থাকে তাহলে যদি কেউ শরীর ত্যাগ করে
তাকে আত্মহত্যা বলেনা। সে শরীর ত্যাগে দোষ নাই। জ্ঞানলাভের পর
কেউ কেউ শরীর ত্যাগ করে। যখন সোণার প্রতিমা একবার মাটির ছাঁচে
ঢালাই হয় তখন মাটির ছাঁচ রাখলে, পরে আবার ভেঙ্গে ফেলতেও পার।

লক্ষ্মীতীকার কথা ।

(১)

জগত্যানন্দসম্পূর্ণে ভগবত্যা মহোৎসবে ।

হুঃখং প্রাহ সুখং ভ্রাতঃ ক যামি কস্ত মন্দিরম্ ॥

শরতে করেন যবে দুর্গা আগমন,

সমস্ত জগৎ হয় আনন্দে মগন ।

সর্বত্রই সুখ হেরি' কহে হুঃখ ভাই
কহ ভাই সুখ ! কোথা কার বাড়ী বাই !

(২)

একমেব পূরস্কৃত্য দশ জীবন্তি নিগুণাঃ ।
বিনা তেন ন শোভন্তে সংখ্যাৎকেষ্বিব বিন্দবঃ ॥

এক জন গুণবানে করিয়া আশ্রয়,
গুণহীন দশ জন প্রাণে বেঁচে রয় ।
একের অভাবে নাহি শোভে অত্র দশ,
একেরে রাখিলে আগে, তবে মিলে রস ।
অসার "শূন্যের" দেখ, নাহি কিছু সার,
কিন্তু আগে এক পলে দর কত তার !

(৩)

রে বৎস সংসঙ্গ মবাগ্নু হি ভ্রমসংপ্রসঙ্গং স্বরয়া বিহার ।
ধন্তোহপি নিন্দাং লভতে কুসঙ্গাং সিন্দুরবিন্দু বিধবালনাটে ॥

অসাধুর সহবাস ত্যজিয়া সত্বর
ওরে বৎস ! সাধু সঙ্গ কর নিরন্তর ।
ছষ্ট-সঙ্গে থাকি সাধু নিন্দা লভে কালে,
সিন্দুরের বিন্দু যথা বিধবার ভালে ।

(৪)

সমাপ্য বিষয়ান্ সর্কান্ যঃ কৃষ্ণে ভক্তিমিচ্ছতি ।

সাগরে শাস্তকল্পোলে স্নাতুমিচ্ছতি হৃদ্বতিঃ ॥

সাংসারিক কার্য্য আগে করি সমাপন,
পিছে দিতে চায় লোক কৃষ্ণ-পদে মন !
সাগর-তরঙ্গ-মালা হলে অবসান,
বর্করের ইচ্ছা যথা করিবারে মান !

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি. এ

জাতিভেদ সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা ।

জাতিভেদের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ ও পুরাতত্ত্ববিৎ ইতিপূর্বে অনেক গ্রন্থ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ; সে সম্বন্ধে আমার মত সামান্ত ব্যক্তির কিছু লেখা বিড়ম্বনা মাত্র। ইংরাজি শিক্ষাপ্রণালীর এবং ইংরাজি বিদ্যার প্রভাবে দেশ হইতে জাতিভেদ উঠিয়া বাইবার উপক্রম হইয়াছে ; শ্রেষ্ঠবর্ণ ও নিকৃষ্টবর্ণে তারতম্য রাখিবার প্রয়োজন নাই, জাতিভেদ-প্রথা উঠিয়া না গেলে আমাদের মধ্যে কোন প্রকারে সম্যকতা জন্মিবে না, নানা শ্রেণীর মধ্যে একসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবনা, এই বে বিশ্বাস আমাদের মনে ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছে, ইহা মঙ্গলজনক কি অমঙ্গলজনক, এই প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইংরাজি শিক্ষাপ্রণালী দেশে প্রচলিত হইবার পূর্বে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ শূদ্রাদির মধ্যে ভেদজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল ছিল। এখনকার মত বিভিন্নজাতির মধ্যে পরস্পরে আহারাদি সব কাজই (সমাজে নী হউক সংগোপনে) চলিত না। একত্র আহারের কথা দূরে থাকুক, একাসনে উপবেশন করা ও নিষিদ্ধ ছিল। কেবল বিবাহাদিতে নহে, বর্ণভেদে ব্যবসায় ভেদও ছিল। ব্রাহ্মণ বয়ন বাজন ও অধ্যাপনার নিযুক্ত ছিলেন, বৈদ্য চিকিৎসা কার্যে নিয়োজিত ছিলেন, কায়স্থ মসীজীবী ছিলেন, সদোপ, সূত্রধর, তন্তুবার, সুবর্ণবণিক, কুস্তকার, ক্ষৌরকার, রজক প্রভৃতি শূদ্রগণ স্ব স্ব নির্দিষ্ট ব্যবসারে রত ছিলেন এবং তদ্বারা স্বচ্ছন্দে ও সুখশান্তিতে জীবন কাটাইতেন। কিন্তু যেদিন হইতে ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, যেদিন ইংরাজ বলিলেন, "সকলেই বিদ্যালয় লাভ করিবার অধিকারী, বিদ্যালয় নিকট জাতিভেদ চলিবেনা, সেরূপ করা পক্ষপাতিতা ও নিষ্ঠুরতা, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদোপ, সুবর্ণবণিক, রজক, ক্ষৌরকার প্রভৃতি সকলেই এক বিদ্যালয় বিধান হইবে, এক শিক্ষার শিক্ষিত হইবে, একপ্রকার জ্ঞানে জানী হইবে, স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বিদ্যা ও জ্ঞানের তারতম্য থাকিবে না।" সেইদিন হইতে সদোপ দলে দলে লাঙ্গল ছাড়িয়া, তন্তুবার বস্ত্র বয়ন ত্যাগ করিয়া, সুবর্ণ বণিক, অলঙ্কার নির্মাণ পরিহার

করিয়া, কর্ণকার গৌহরজ ছাড়িয়া, প্রত্যেক শ্রেণী নিজ নিজ ব্যবসারে জলাঞ্জলি দিয়া ইংরাজি বিদ্যালয়ে ইংরাজি শিখিতে থাকিত হইলেন । বিড়ম্বনার ইহাই চূড়ান্ত নহে। ব্রাহ্মণলগণও ব্রহ্মন, বাজন ও অধ্যাপনার আর উদ্বরণপূর্ণ হইয়া বলিয়া ইংরাজ-প্রদর্শিত চাকুরীর প্রলোভনে পড়িয়া, সেই মহৎ, পবিত্র কাষ্য ছাড়িয়া ইংরাজি শিখিতে লাগিলেন । সেইদিন জাতিভেদরূপ বিচিত্র, সুবিশাল, কত সহস্র বৎসরের পুরাতন অট্টালিকা ভাঙিতে আরম্ভ হইল। যে ব্রাহ্মণ কারস্বের সহিত একদিনে উপবেশন করিতেন না, যে শূদ্র তাকে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ ও কারস্বের নিকট নিজ বক্তব্য নিবেদন করিত, আজ সেই ব্রাহ্মণ, কারস্ব ও শূদ্র মোহময় সাম্য-নীতিতে বিভোর হইয়া একবেঞ্জে, পাৰ্শ্বপাশ্বি উপবেশন করিয়া ক্রিয়াশিক্ষা করিতে লাগিলেন ; এক-প্লাসে জলপান করিতে লাগিলেন । কি মোহময় অপরূপ দৃশ্য ! এত কালের স্বতন্ত্রতা, মন্যাদাজ্ঞান, ভয়ভক্তি স্মরণ দূর করিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ, কারস্ব ও শূদ্রকে একই শ্রেণী-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিব, পরস্পরের সহানুভূতিতে পরস্পরের স্বদর তরিয়া দিব, জাতীয় অনৈক্য দূর করিয়া এক মহাজাতির সৃষ্টি করিব, এই মহাবাক্য চারিদিকে প্রচারিত হইল । ‘আমাদের মধ্যে যে একতা নাই, জাতিভেদই তাহার মূল, যে জাতির একতা নাই, সে জাতির উন্নতি কখনই হইতে পারে না ; অতএব আমাদের বৈষম্যের বীজ জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যিক ।’ সেই মত কার্য চলিতে লাগিল । ইংরাজি শিখিয়া নিজ নিজ ব্যবসারে লোকের ঘৃণা জন্মিতে লাগিল ; দেশীয় নিজ ব্যবসা বাণিজ্য লোপ পাইতে লাগিল । ইউরোপীয় শিল্প বাণিজ্যজাত দ্রব্যে দেশ তরিয়া গেল । কিন্তু কি বিড়ম্বনা ! ব্রাহ্মণ, কারস্ব প্রভৃতি জাতির মধ্যে এখন যত অসত্কার, অগ্নিরাছে, কোন কালে এত অসত্কার ছিল না । স্বদর সহানুভূতিতে তরিয়া না গিয়া ঈর্ষ্যান ও হিংসার পুড়িয়া বাইতেছে । পূর্বে এতটা অনৈক্য কল্পনাতীত ছিল । এক মহাজাতি বা একাকারের এই স্বদর, সুস্বিষ্ট কল কলিয়াছে ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত ।

চিকিৎসা-সংবাদ ।

১। জন-সাধারণে বিশেষতঃ স্ত্রী সমাজে এক্ষণ সংস্কার আছে যে কবিরাজী পাকতৈল মস্তকে মাথিলে অকালে চুল পাকিয়া যায়; আমরা কিন্তু অদ্যাবধি এক্ষণ একটা ঘটনাও ঘটতে দেখিনাই। বাহার বায়ুরোগ প্রাপ্ত, তাহারাই পাকতৈল মাখে, বায়ুর জন্ত চুল পাকিয়া যায়, রোগী বা রোগিনী মনে করেন, তৈলেই চুল পাকিল।

২। সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ কোন বিধবার মণীর প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে জ্বর আনিত, তৎকালে তাঁহার গা বমি বমি করিত ও তলপেটে ব্যথা হইত। এইরূপ ৬৭ দিন হইয়াছে এমন সময়ে আমি চিকিৎসার্থ আহৃত হইলাম। জিজ্ঞাসায় আমা গেল যে রোগিনীর অনেক দিন জ্বর হয় নাই, অল্পপিত্ত নাই, ক্ষত-দোষও নাই। ইহাকে জ্বরের বৃহজ্জরাস্তক, ব্যথার মহাশঙ্খ বটী এবং বমিভাবের জন্ত এলাদি চূর্ণ দিলাম। (কবিরাজী চিকিৎসায় প্রধানতঃ এইরূপ বিধি—অর্থাৎ যে যে উপসর্গ তাহার সহিত মিলাইয়া এক একটা বড়ী দেওয়া) ৩৪ দিনে এ রীতিতে কিছুই ফল হইল না। তখন ভাবিলাম একটা মাত্র এমন কোন সোজাসজী জিনিষ আছে বাহা দ্বারা উক্ত তিন উপস্রবই বাইতে পারে। সে জিনিষ—তাত্রভস্ম। শুধু মধু সহ দিনে তিন বার করিয়া তাত্রভস্ম দিতে দিতে সমস্ত উপসর্গ ক্রমে দূর হইল! তাই বলি, ভগবানের কৃপা না হইলে সব সময়ে সব কথা মনে উঠে না।

৩। লোকে বলে কবিরাজী চিকিৎসায় বড় বিলম্ব হয়। কিন্তু বিলম্বের রোগ ভালিই যে কবিরাজ মহাশয়দিগের নিকটে আসে তাহা সকলে ভাবেন না।

৪। এক ব্যক্তি প্রথমে নানা চিকিৎসকের কাছে, নানা রূপ ঔষধ খাইয়া কিছুতেই ফল না হওয়ার সমস্ত ঔষধ ছাড়িয়া দিয়া স্নানাহারাদির যথেষ্টাচার আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার ইহা দ্বারাই রোগ আরোগ্য হইল। আর এক ব্যক্তি কিছুদিন ঔষধ খাইয়া বিরাগভরে পূর্বোক্ত রোগীর উপায় অনুসরণ করিলেন। হৃৎশেত্র বিষয়, শেবোক্ত রোগীর রোগ বৃদ্ধি হইয়া প্রাণ সংহার করিল।

৫। সুশ্রুতীয় অন্ত্ৰচিকিৎসা কবিরাজ দিগের মধ্য হইতে বহুদিন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু এখনও স্থানে স্থানে উহার অংশিক আলোচনা দৃষ্ট হয়। বরিশালের অন্তর্গত চাঁসীর চিকিৎসক সম্প্রদায় সুশ্রুতমতে ক্তরোগের অতি

স্বাস্থ্য চিকিৎসা করেন। আমরা দেখিয়াছি ইরানী ইংরাজ সার্জনের
পরিত্যক্ত আশাহীন রোগীকেও আরোগ্য করিয়াছেন।

৬। আমাদের কোনও পরিচিত ব্যক্তি বাজারে নাপিতের দ্বারা দাড়ি
কাটাইয়া ছরারোগ্য চর্মরোগে অনেক দিন ভুগিয়া ছিলেন। সোমরাজীতলে
উহা ভাল হইয়াছিল।

গুণবত্তার প্রশংসা ।

অনুসন্ধান—ইহা একখানি অতি পুরাতন ও উচ্চশ্রেণীর সচিত্র
সাপ্তাহিক পত্রিকা। নিরপেক্ষভাবে ছুটের নিন্দা ও শিষ্টের প্রশংসা, এবং
অজ্ঞাতপূর্ব সারভঙ্কের উদ্বাটনই সংবাদ-পত্রের প্রধান ব্রত। এই মহাব্রতের
সাধনার ঐহুসঙ্কল-চিরনিযুক্ত। আজকাল গালাগালি হজুক্ প্রভৃতি বে সকল
কলকমর ব্যাপার সংবাদপত্রের অঙ্গের ভূষণ হইয়াছে, তাহার লেশমাত্রও এই
পত্রিকার অঙ্গস্পর্শ করে নাই। এই কাগজখানি মাসিক পত্রিকার স্তার বাঁধান—
অজ্ঞাত সাপ্তাহিকের স্তার পাঠান্তে ফেলিয়া দিবার জিনিস নয়। ইহার ছাপা
ও কাগজ অতি সুন্দর; এ হেন পত্রিকার সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি সকলেরই প্রার্থনীয়।

অন্তঃপুর—বরাহনগর হইতে জীলোকদিগের দ্বারা লিখিত, জীলোকের
দ্বারাই পরিচালিত মাসিকপত্র। ইহাতে জ্ঞানগর্ভ কথা অনেক থাকে। মূল্য ১।

প্রবাসচিত্র—শ্রীবৃক জলধর সেনের মাধুর্য্যময়ী লেখনীস্ব সমধুর ফল।
গ্রন্থকার প্রথমবোধনে তাঁহার গুণময়ী অনিন্দ্যসুন্দরী জীব বিয়োগ-শোকে
উৎকিঞ্চ হইয়া প্রাণের মারা ত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসবেশে হর্গম পাহাড় জঙ্গলে
বুসিয়াছিলেন—একে হিমালয়ের দৃশ্যাবলি অবর্ণ্য মনোরম, তাহাতে লেখক
অজবিও আবেগপূর্ণ-হৃদয়। সুতরাং পুস্তকখানি যে কি এক অপূর্ব জিনিস
হইয়াছে তাহা আর বলিবার নয়। যাহারা হাওয়া খাইবার জন্য সুখে রেল-
সার্কী যোগে দেশান্তরে গিয়া সহর, সুলভ ইট কাঠ পাথর দেখিয়া বা উর্ধ্ব মাত্রায়,
সাম-প্রান্তর্ভ্রমণ কালে হুচারিটা গাছ পাথর দেখিয়াই কল্পনার জোরে কত কি
সিখিয়া ফেলেন, তাঁহারা কখনই এরূপ জীবন্ত অপূর্ব পুস্তক লিপিতে পাবেন
না। সুলভ বাবু আজন্ম বিমল সাধুচারিত্র, সেই বিমলতার দ্বারা পুস্তকের প্রতি-
ভাষা করিয়াছেন। মূল্য ১। মাত্র। শ্রীবৃকদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়।

১ম বর্ষ, ৪র্থ মে সংখ্যা। মূল্য বার্ষিক পড়ান ৩।
পোস্টেজ, প্রকৌশল ১০০০, আধিন, কাঙিক।

ধর্ম

আয়ুর্বেদ ও ধর্মনীতি বিষয়ক
মাসিক পত্র।

২০২ নং কং গ্যালিন্স ষ্ট্রিট, হুইত

আচার্য আয়ুর্বেদ কলেজ
হইতে প্রকাশিত।

পুস্তকনিষ্ঠ উপাধি ও সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,
কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিভূষণ
সম্পাদিত।

বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ, আগুনী, বিজ্ঞা ও চরকোক্তি, অশা মৈত্রী
কটাক, জাতিজ্ঞা, কথ, হ্যাংগনিক,
সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত ভাষা
সংস্কৃত ভাষা, সংস্কৃত ভাষা

ঋষি ।

২য় বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা । ১৩০ঙ আশ্বিন ও কার্তিক । সেপ্টেঃ, অক্টোঃ ১৮৯৯ ।

বিনিময়-সংবাদ ।

পদত্যাগ—শ্রীযুক্ত রায় পশুপতি নাথ বসু, কুমার শ্রীমম্বথ নাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু নলিন বিহারী সরকার, শ্রীযুক্ত বাবু জয়ময়জ্ঞ নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সিংহ, শ্রীযুক্ত বাবু রাখাচরণ পাল প্রভৃতি কলিকাতায় বহু-সংখ্যক গণ্য মান্ন ব্যক্তিগণ রাজকীয় কর্তৃপক্ষের মস্তব্যে ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া মিউনিসিপ্যাল কমিশনরের পদ অগ্নানবদনে ত্যাগ করিয়াছেন । এই সম্মানের পদ পাইবার জন্ত লালায়িত হইয়া সহরের কত মহোদয় কতই না ষোগাঙ্ক-ষন্ত্র করিয়া থাকেন ! সুতরাং এই ত্যাগস্বীকারে পূর্বোক্ত মহাত্মাদিগের বাঁহাড়রী আছে বটে ।

মশকে ম্যালেরিয়া—কোনও ইংরাজ বিজ্ঞানবিদ ব্রিটিশমেডিকেল নামক সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে, মশকের দংশনের সহিত ম্যালেরিয়া বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হয় । ইহা না কি তিনি বহুস্থলে পরীক্ষা দ্বারা বুঝিয়াছেন ; কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে আর এক ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, মশকেরা দূষিত রক্ত শোষণপূর্বক মনুষ্যদেহের উপকার করে । আমরা এতদ্বয়ের কোন মন্তব্য মানিব বুঝিতে পারি না ।

তথ্য নির্ণয়—সম্রাট বংশ সম্বৃত কোন জায়োদশবর্ষ বালকের তিন-মাস অন্তর একবার ভয়ানক মূছাঁ ও গুটাবস্থা হইত । কোন প্রসিদ্ধ কবি-রাজ এ রোগীকে প্রথমে বাতব্যাধির 'দাগলাদ্য ঘৃত' ও পরে অপস্মার রোগের

‘মহাট্টেস মৃত’ ব্যবস্থা করিধাছিলেন, তাহাতে ফল হয় নাই। পরিশেষে রোগী আমাদের নিকট উপস্থিত হওয়ায় বালাচপলতা দোষ থাকিতে পারে অনুমান করিয়া তদুপযোগী ঔষধ ব্যবস্থা করিলাম; তাহাতেও ফল হইল না। তখন আরও নিপুণভাবে কারণ খুঁজিতে লাগিলাম—রোগীর অল্প কোন রোগ নাই, শরীর এক রকম নখর ও কাশ্টিমান। সূর্যশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয় ও অগ্নিবৃদ্ধি হয় এইরূপ ঔষধ দিলাম। ইহাতেই রোগ দূরীভূত হইল। উপর উপর চেহারা ভাল থাকিলেও মানুষের আশুপের ঘরে অলক্ষিতে এমনই ক্রটি থাকে !

এ কালে রাফস—আফ্রিকা দেশে প্রকাণ্ড-মূর্তি বিকট-দর্শন এক জাতীয় মনুষ্য আছে। নরমাংসই তাহাদের প্রধান খাদ্য। জীবিত মনুষ্য না পাইলে ইহারা শব ভক্ষণ করে। ইহারা অশিক্ষিত অজ্ঞান পশুবৎ; কিন্তু আমাদের দেশেও কোন অশিক্ষিত রাজা শিশু ভক্ষণ করিতেন এবং তান্ত্রিক যোগিগণ শ্মশানের শব লইয়া উদর পূর্তি করিয়া থাকেন। এ অতি উদ্ভট ধর্মপথ।

চিকিৎসা-সঙ্কট—তত্র পরিবারস্থ কোন প্রাচীনা স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত রক্ত স্রাব হইতে হইতে ক্রমে অতীব অবসন্ন মৃতপ্রায় অবস্থা উপনীত হইল, ডাক্তারী চিকিৎসার চূড়ান্ত হইল কিন্তু রক্তরোধ হইল না। পরে আমরা আহত হইলাম। দুই পুরিয়া ঔষধ দিতেই রক্ত বন্ধ হইল, কিন্তু হৃৎখের বিষয় (বোধ হয় রক্ত উর্দ্ধ হইয়া) রোগিণীর মূর্ছা ও আক্ষেপ আরম্ভ হইল। এই মূর্ছা শান্তির জন্য বায়ুনাশক ঔষধ ও তৈল দিতে দিতে রোগিণীর জ্বর দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ। তখন জ্বরের মুহু ঔষধ দিতে গেলেও বায়ুর প্রকোপ এবং মূর্ছার উপক্রম হয়। বায়ু অধোগ ও কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে কোন উপসর্গই বাইবে না মনে করিয়া বিশেষতঃ বটিকা দিলাম। ইহাতে দান্ত না হইয়া বমি হইয়া উঠিয়া গেল, তারপর ষত ঔষধ বা পথ্য দেওয়া যায় সমস্তই উঠিয়া যায়, কিছুই পেটে থাকে না। রোগিণী ক্রমে অনাধারে অতীব ক্ষীণ, স্পন্দশক্তি-বিহীন হইল। জ্বর, বমি, কোষ্ঠবদ্ধ, তলপেট ব্যথা, মূর্ছা ও আত্যন্তিক ক্লান্ততা এই কয় উপসর্গ যেন পরস্পর পরস্পর করিয়া রোগিণীকে শমনাময়ে লইয়া বাইতে প্রস্তুত। তখন গৃহস্থ আনা-

দ্বারা আর কাজ হইবে না। মনে করিয়া কোনও (নামে ও ধনে বড়) কবি-
রাজকে ডাকিলেন । তিনি হঠাৎ আসিয়াই সধ বুঝিবেন—সাধা কি ? যে
কয়দিন রোগিনী তাঁহার হাতে ছিল ক্রমে আরোহি রোগবৃদ্ধি । আমি পুনরায়
আহূত হইলাম, এ বারে সমস্ত ঔষধ বন্ধ করিয়া কেবল স্বর্ণসিন্দূর ও একটা
পাচনের জল এবং ছই এক চামুচে বাঁলা দেওয়া হইতে লাগিল । ভগবৎ-
রূপায় ক্রমে সমস্ত বিপদ কঠিরা গিয়া রোগিনী দেড়মাস পরে আরোগ্যের
পথে দাঁড়াইল এবং তিনমাস পরে পূর্ব স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইল । রোগী অনেক
ঔষধ খাইলে, অবশেষে পাচনের দ্বারা ই অধিক উপকার হয় ।

যজ্ঞানুষ্ঠান—সে কালের হিন্দু রাজারা রাজ্য-মধ্যে কোনও অশুভ
লক্ষণ দেখিলেই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণদিগকে পান ভোজন করা-
ইয়া রাজ্যের মঙ্গল সাধন করিতেন । এখন সে কালও নাই, হিন্দুর সে
মনও নাই । কেবল বাড়ীর গৃহিণীদের রূপাতেই “লক্ষ্মীপূজা” প্রভৃতি হিন্দুর
নিত্যক্রিয়া গুলি এখনও বাজে খরচ বলিয়া বন্ধ হয় নাই, সম্প্রতি শুনা
যাইতেছে, এ বৎসর না কি সাতটি গ্রহের একত্র সমাবেশ হইবে । হিন্দুশাস্ত্র-
মতে ইহা দেশের ও প্রাণী মাজেরই অমঙ্গল সূচক । সেই অমঙ্গল দূরীকর-
ণার্থ লাহোরে এক বিরাট যজ্ঞ হইবে ; তাহার আয়োজন হইতেছে । কাশীর
বড় বড় পণ্ডিত আনাইয়া এ যজ্ঞ ব্রতী করা হইবে । যজ্ঞের ব্যয় নির্কাহের
জন্ত চাঁদা হইতেছে । হিন্দুধর্মের গতাবশেষ ক্রিয়া, কলাপ এখনও কিছু কিছু
পশ্চিম প্রদেশেই আছে ! .

ভূতও অদ্ভুত—আমেরিকার যখন সকলই অদ্ভুত, তখন ভূত অদ্ভুত
ন্য হইবে কেন ? সেখানে নাকি এক রকম সর্পাকৃতির ভূত আছে ; তাহার
আবার ঘোড়ার মত মাথা, পায়ে খুর, খাঁজকাটা লাজ, ছাইয়ের মত রং,
ও চামচিকার মত পুখা আছে । ইহার উপদ্রব আরও অদ্ভুত—সে নাকি
ঘোড়ার পা খোঁড়া করে, গরুর দুধ কমিয়ে দেয়, ক্ষেত্রের শস্ত নষ্ট করে ! তা
না হবে কেন ? এ কি দেশী ভূত, যে দেশী উপদ্রব করবে ?

রাজার দয়া—বোধে গবর্ণমেন্ট দুর্ভিক্ষের প্রতীকার চেষ্টার জন্ত
একটা স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিয়াছেন ; এ আফিস সম্প্রতি পুনায় আছে ! এ
সংবাদে ভ্রাতৃ মরিজ লোকদিগের প্রাণে আশার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে ।

কালিদাস-কীর্ত্তি—পাণ্ডনে এলিজাবেথান্ হেজ সমিতি নামে একটা নাট্য সম্প্রদায় আছে, সেখানে সম্প্রতি কালিদাসের শকুন্তলার অভিনয় হইবে সংকল্প হইরাছে। পরাজিত ভারতের রত্নগুলির মাহাত্ম্য বৃষ্টিবার লোক বিলাতেও আছে। এমন কি কোনও ইংরাজ গ্রন্থকার শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদ মাত্র পড়িয়া বলিয়াছেন—যদি কেহ স্বর্ণ ও মর্ত্যের ছবি একাধারে দেখিতে চান, [যদি বসন্তের দেবহর্ষভ পুস্পাশির অল্পপম সৌরভে প্রাণ মাতাইতে চান তবে আমি শকুন্তলার নাম করিব।

স্ত্রীলোকের দান—মানভূমপুকুলিয়ার ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী কান্দিণী দেবী, মৃত স্বামীর স্মৃতি সংরক্ষণার্থে গবর্ণমেন্টের হাতে ৪০০০ টাকা অর্পণ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট ঐ টাকায় তত্ত্ব্য-মরিজ ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দেওয়া হইবে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন; অপিচ রমণীকদয়ের এতাদৃশ উদারতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শতশত ধন্বাদ দিয়াছেন।

সদবুদ্ধি ও সদ্দান—বরাহনগর মিবাসী প্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত জমিদার শ্রীযুক্তনাথ রায় চৌধুরা অদৈতবাদ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার জন্য ছইজন লেখককে ৩০০ টাকা দান করিয়াছেন।

সতীত্বের তেজঃ—পশ্চিম প্রদেশে কোনও সম্রাট লোক স্বীয় স্ত্রীকে স্বগৃহে লইয়া বাইতেছিল। পথিমধ্যে দারোগাপ্রভু কামাঙ্ক হইয়া বলে “এ স্ত্রী যে তোমার তাহার প্রমাণ কি ?” ভজ লোকটা প্রমাণের জন্য গুপ্তরালয়ে পুনরায় যাইতে বাধ্য হন। ইত্যবসরে অসি-সজ্জিত হইয়া দারোগা ভয় প্রদর্শন পূর্বক বলাৎকারে প্রবৃত্ত হয়। অমনি স্ত্রী সতীত্বের উদ্যম পরাক্রমে পাষাণের অসি লইয়া তাহারই মস্তক ভূমিসাৎ করিল। কোর্টের বিচারক এই স্ত্রীকে দণ্ড না দিয়া বরং চারিশত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। ধন্য সতী! ধন্য বিচারক!

দান ও উদারতা—পুন্ডিয়ার শ্রীল শ্রীযুক্তা রাণী হেমন্তকুমারী রাজসাহী কলেজের সম্পর্কে একটা ছাত্রনিবাস নির্মাণের জন্য ১৫০০০ টাকা দান করিয়াছেন।



আগমনী ।

চন্দ্রমা মেঘের অন্তরালে লুকাইয়া, আর ত সেই মলিনমুখে তেমন মিটি মিটি অক্ষুট হাসিটি হাসে না! আর ত মেঘ তেমন করিয়া অবিরল জল ঢালিয়া ধরাতল বিপ্লাবিত করে না! ঘনঘোর বজ্রনির্ঘোষে বিশ্বসংসার আর ত এখন তেমন সম্বাসিত হয় না! তবে তোমার ও অশ্রান্ত উত্তাল নৃত্য-ভরঙ্গের গতিভঙ্গ হয় না কেন মা? প্রশান্তরূপিনী প্রকৃতির পবিত্র কলেবর কেবল আজ তোমারই পঙ্কিল-সলিল-সংস্পর্শে কলঙ্কিত কেন মা? সুখদ-শারদ-সমাগমে শান্তিসৌন্দর্য্যের আনন্দমন্দিরে এ সংসারের অশান্তি উদ্ভ্রান্তি সকলই ত ধীরে ধীরে লুকাইয়া গেল, তবে তোমার ও প্রচণ্ড তাণ্ডব-কাণ্ডের শেষ-মবনিকার কণিকাও দেখি না কেন মা?

“কুল কুল কুল! কিছই বুঝিলাম না ত? ও কি কথা মী? বধনই জিজ্ঞাসা করি—কুল কুল কুল! ওর অর্থ কি মা? মানে না বুঝিলেও তোমার ওই মধুমাথা কথাটি কানে যেন কত অমৃত ঢালিয়া দেয়, ভাব না বুঝিলেও প্রাণ যেন জুড়াইয়া যায়। এমনই বা হয় কেন মা? না বল, আমি কিন্তু বুঝিরাছি—এই অকুল দুঃখসাগরে ভাসমান কুলাঙ্গার কুমার-কুলের কাতর-ক্রন্দনে, সেই কৈলাসবাসিনী কৈবল্যদারিনী কুলকুণ্ডলিনী মায়ের আমার কোমল প্রাণ আকুল করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের এ অকুলে কুল পাইবার কাল অতি নিকটে আসিয়াছে, তাই তুমি আজ আহ্লাদে আকুল হইয়া এমন ব্যাকুলভাবে হুকুল বিপ্লাবিত করিয়া, কুল কুল কোলাহলে কলনাদিনী করুণাময়ী মা আমার! এই শুভ সমাচার প্রচারের জন্য দিগ্-দিগন্তে ছুটিয়া চলিয়াছ।

যাও মা! কিন্তু ও আবার কি? প্রবাসী পুত্র প্রাণের ব্যগ্রতায় তীর-তীরগতিতে তরী ছুটাইয়া, তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়াছে—অনেক দিনের পর মাকে দেখিবে বলিয়া। আর তুমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তরল-ভরঙ্গ, গঙ্গে! এমন ধরতর ভাবে, তরতর রবে, ছুটিয়াছ কেন মা? যেখানে আজ তর-ণীর উড়িদুগতি, সেখানেই তোমার তরতর গীতি! আরোহীকে ও কি কথা বলিয়া দিতেছ মা?

“তন্ন তন্ন তন্ন—এ সামান্য নদী কেন ? এই অপার সংসার সমুদ্রটা এই বেলা তোরা তন্ন তন্ন তন্ন। তরিবার সময় আসিচ্ছে,—তোদের ত্রিভাণহারিণী, ত্রিগুণধারিণী, ত্রিলোক-তারিণী জননী, আজ তোদের জন্ত করণার কৈবল্য-কঁবাট উর্বাটিত করিয়াদিয়াছেন, এই বেলা তোরা—তন্ন তন্ন তন্ন। এমন সুযোগ এত সুবিধা ছাড়িস্ না যে তন্ন তন্ন তন্ন। এই সময়, সময় থাকিতে, শক্তি থাকিতে, সামর্থ্য থাকিতে—তোরা সবে তন্ন তন্ন তন্ন।”

এই না তোমার তন্ন তন্ন রবের ভাবার্থ মা ? আমরা মরি ! এত মেহ, এত দয়া, এমন মমতা, মা বিনা আর কোথায় সম্ভবে ? এখন, বেশ বুঝিয়াছি মা ! নৈশ-নিবিড়-তমস্তরঙ্গ বিলোড়িত করিয়া, কাদঘিনী-সহচারিণী সৌদামিনী কেন আর তেমন প্রচণ্ড প্রলয়কাণ্ডের অভিনয়ে অগ্রসর হয় না। জলভর-মহর জলধরের সাক্ষমত্রে জীমূত-নির্ঘোষে কেনই বা আর কর্ণকটাহ কাটিয়া যায় না, আর কেনই বা—সায়ুর বিধ-বিধংসী বিশাল বেগ বিলুপ্ত প্রায় !

এখন বুঝিয়াছি—মৃহ্মন্দ সাক্ষ্য-সমীরণ-হিল্লোলে জীবদান্দোলিতা ললিতা লতা, উপহ্যুপরি ঘন-বিন্তস্ত স্তবকিত কুমুমসৌরভে দিগ্দিগন্ত আমোদিত করিয়া, আনন্দে ছলিয়া, অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যচ্ছটার কেন আজ হৃদয় মন ভরিয়া দেয়। কেনই বা, গুলকাকুল-কোকিল-কুলের কলকোলাহলে, কুলে কুলে জমর গুলের হৃদয়রঞ্জন শুভ্রনে, পাণিয়ার পীত্বপূর্ণ প্রস্নোদতানে, মর্ত্যতল আজ কিরণনগরের গরিমার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেনই বা, চূতচম্পক-বকুল-কদম্ব-তরুরাজীর স্নিগ্ধোজ্জল শ্রামললোহিত মল-পবন-পুল্পে, পৃথিবী একটি কমকুলে পরিণত হইয়াছে। কেনই বা চন্দ্র অমল-উজ্জল-কিরণকর্মাণে গগনতল এত আলোকিত করিয়াছে। মুক্তাবিনিমিত-শিশিরবিন্দুসিক্ত, তরুণাঙ্গণ-কিরণরঞ্জিত কমলদল, কেন আজ মৃহ্মল হিল্লোলে হেলিয়া ছলিয়া চলিয়া পড়িতেছে। আর তুমিই বা কেন এমন উদ্দাম-আনন্দ-আবেগে অধীর-উন্মাদিনী সাজিয়া, উধাও-উদ্ভ্রান্ত-গতিতে দিগ্দিগন্তে ছুটিতেছ, আর বলিতেছ—“কুল কুল কুল, তন্ন তন্ন তন্ন”।

আনন্দময়ী মা আসিতেছেন, তাই আজ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আনন্দ-উৎসবের অন্তত উৎস উৎসারিত হইয়াছে। আনন্দে ভুবন ভরিয়া গিয়াছে, আনন্দে সৌন্দর্য্য সকলেরই প্রাণ আজ উবেল-আনন্দ-কুকানে তানিতেছে।

কিন্তু জানি না—এ আনন্দ স্বাপ্নিক কল্পনার ক্রীড়া-কন্দুক কি না ! প্রভাত-বাত-বিলোড়িত জলপটলের বিকট-কঠোর গর্জনের মত, হঁহা বিকল ও পরিণাম-শূন্য কি না !

অশ্রু-সৈকত বাহাদের সাধের সুখশয্যা, মুহমুহঃ মুত্থাই বাহাদের একমাত্র প্রার্থনার বিষয়, অশ্রুজল বাহাদের চিরসঞ্চল, হাহাকার আর্তনাদই বাহাদের সান্ত্বনার শাস্তিসূত্র ; অতৃপ্তি, অশান্তিই বাহাদের আদরের অর্দ্ধাঙ্গিনী ; রোগ শোক ছঃখ দারিদ্র্যই বাহাদের চিরসহচর, সে সব হতভাগাদের দগ্ধহৃদয়ও আজ° বেন থাকিয়া থাকিয়া কেমন করিয়া উঠে, তাই বড় ভয় হয়—“অত্যাচৈঃ পতনার চ” কি না !

হাঁ মা ! সত্যই কি তুমি জাণিবে ? সচ্চিদানন্দময়ীর শুভসমাগমে সত্যই কি সংসার আবার অপার আনন্দ তুঝানে ভাণিবে ? সত্যই কি এ নিঃশ্বম মহাঈশান, নন্দনবনে পরিণত হইবে ? সত্যই কি তুমি নিরন্ন শীর্ণ সন্তান-গুলির শুকমুখে অরপূর্ণরূপে আবার আদরে অরগ্রাস তুলিয়া দিবে ? কি করিয়া বিশ্বাস করিব ? কঠোরাদপি কঠোরতর তপঃসধনার, কত কত কোটি কোটি কল্প কল্পান্ত কাল কাটিয়া যায়, কত কত যুগ যুগান্ত জন্ম জন্মান্তর অতীত হয়, তথাপি শত শত যোগী যোগীন্দ্র যাহাকে “স্বাস্তং প্রশান্তমবধর্ষ মলং ন শাস্তাঃ” ; আমদের এত কি সৌভাগ্য যে, আজ অবধি অনায়াসে সেই শঙ্করসুর্কম্ব সুরারাম্য ধনের অধিকারী হইব ? সেই বৃন্দারকবৃন্দ-বন্দিতচরণার-বিন্দ সন্দর্শনে, জীবন মন ধ্বংস করিব ? তিতিক্ষা-দীক্ষা-শিক্ষাশূন্ত, রোগ-শোক-সমাকীর্ণ, পাপ-তাপ-পরিপূর্ণ, এই নগণ্য নারকিকুলের এ সৌভাগ্যগরিমা একান্তই অসম্ভব নয় কি মা ? অসম্ভব—অতি অসম্ভব—একেবারে আশার অতীত । কিন্তু মা ! তোমার রাজ্যে, তোমার অঘটন-ঘটন-পটীরনী অট্টহতুকী করুণার নিকটে, সংসারের সকল অসম্ভবই সম্ভাবিত । আমরা বতই অশান্ত, অদান্ত, ঘোরনারকী, মহাপাতকী, হই না কেন মা ! তোমার সেই অপার অনন্ত করুণার ধারায় সব কে ধুইয়া যায় ! তুমিই না বলিয়াছ—

“অপি চেৎ সুহুরাচারো ভজতে মাননশ্রুতাক ।

লোপি সংসার ছঃখোঽপৈ বাধ্যাত ন কদাচন ॥”

জীব বত পাগই করুক না কেন, যদি একবার অনন্তমনে তোমার

চরণে শরণ লয়, তুমি সবদে সংসার হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দাও। তাই তোমার নাম পতিত-পাবনী। কিন্তু করুণাময়ি মাগো! আমরা দিনান্তেও ত দীনতারিণীকে ডাকি নাই, প্রাণান্তেও ত পতিতপাবনীর পদপ্রান্তে শরণাপন্ন হই নাই, তবে তোমার এ অভয়-আশাসে আমাদের আশা কৈ মা? আমাদের উপায় কি মা? উপায় কি তবে নাই, অবশ্য আছে,—

“মৎসমঃ পাতকী নান্তি পাপস্তা স্বংসমা নহি”

আমাদের ছায় পাপী জগতে নাই বটে সত্য, কিন্তু তোমার মত পাপ-নাশিনীও ত আর সংসারে দেখি না। তাই আবার আশাও হয়—অসম্ভব হইলেও তোমার এ করুণায় আমরা কখনই বঞ্চিত হইব না! এস মা! তোমার ঐ অটুটকী করুণার বিমল গঙ্গাজলে, সংসার-মলীমস-সমাচ্ছন্ন অশান্ত সন্তান-কুলকে নিশ্চল করিরা কোলে তুলিয়া লও, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে উঠিরা, মা মা বলিয়া জীবনের জালায়ঞ্চনা সব তুলিয়া যাই। দিদিমা, বুড়িমা, পিসিমা, মাসিমা, এ সব উপাধিগুলি বিসর্জন দিয়া, কেবল এক অধঃ বিশ্বময়ী মহামাতৃসত্তায় আত্মহার্য হইয়া ডুবিয়া থাকি। মাময় জগতে জগন্ময়ী মাকে দেখিরা যেন ষথার্থই বলিতে পারি—

“ধন্তোহহং কৃতকৃত্যোহহং সফলং জীবনং মম।”

এস ভারতের নরনারী! আজ আমরা দুঃখ দারিদ্র্য তুলিয়া গিয়া দুর্গতি-দমন দুর্গানামের বিজয়-ঐবজস্তী গরবে গলার পরিয়া, অস্বতঃ তিন দিনের জন্তুও জগদেক-জননীর সন্তান বলিয়া সংসারে পরিচিত হই। স্বরাসুর-কিন্নর-নরের আরাধ্যধনকে হৃদয়ে ধরিয়া, মৃত্যুঞ্জয়-হৃদয়-রঞ্জিনীর মণিমঞ্জীর-শিজিত চরণাধুকে সচন্দন জবাঞ্জলি দিয়া জন্মজীবন ধস্ত করি। আর কোটি কোটি কণ্ঠ একত্র করিরা সকলে মেলিয়া কৃতাজলিপুটে বলি—

“এষেহি ভগবত্যাম্ব ! শত্রুক্ষয়-ভয়প্রদে !

আগচ্ছ সদগৃহে ঠেবি ! সুরকল্যাণহেতবে”।

শ্রীযতীশচন্দ্র শাস্ত্রী ।

নিদ্রা ও চরকোক্তি।

তমোভবা শ্লেষ্মসমুদ্ভবা চ শরীরশ্রম-সমুদ্ভবা চ ।

আগন্তুকী ব্যাধ্যনুর্ভক্তিনী চ রাত্রিশ্রভাব-প্রভবা চ নিদ্রা ॥

সূত্রস্থান ।

নিদ্রা ষট্ প্রকারী প্রথম—তমোগুণ সমুদ্ভবা। যাহারা কেবল খায় দায়, নিদ্রা ঘায়, অ্যাহার মৈথুনাদি অজ্ঞান-পশুশুলভ কয়েকটা দৈনন্দিন অভাব-পূরণ ব্যতীত যাহাদের জীবনের আর বড় কিছু উদ্দেশ্য নাই, সেই সমস্ত তামসিক প্রকৃতিক ব্যক্তিদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ চিরপ্রিয় নিদ্রালুতা, তাহাই এই প্রথম শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয়—শরীরস্থ শ্লেষ্মধাতুর আধিক্য বশতঃ। যাহাদের ধাতু কফপ্রধান, যাহারা হৃষ্টপুটাক তাঁহাদেরই এই দ্বিতীয় প্রকার নিদ্রা হইয়া থাকে। তৃতীয় নিদ্রা—পরিশ্রম জনিত। অতিরিক্ত মানসিক শ্রম বা দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অত্যধিক চালনা বশতঃ যে মানিকর ক্লান্তি উপনীত হয়, তাহাই অপনোদনের জন্ম এই নিদ্রা মঙ্গলময়ের এক অভাবনীয় অনুপম সৃষ্টি। এ নিদ্রা বড় মধুর, বড় তৃপ্তিপ্রদ,—শ্রমতাপিত দেহের কেমন যেন এক অপূর্ণ-সুখনির্ভরিণী। জীবিকাষেযণে উত্তমাজের দক্ষধারা যাহার পদোপরি প্রস্কৃত হয় নাই, সে এই সুখের স্বাদ কি বুঝিবে? চতুর্থ প্রকার নিদ্রা—“আগন্তুকী” নামে অভিহিত। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম যে নিদ্রা কোনও ঔষধ, পথ্য বা প্রক্রিয়া বিশেষের প্রয়োগ দ্বারা আনয়ন করা হয় তাহাই এই চতুর্থ শ্রেণীর।—যেমন অহিফেন, দধিযুক্ত স্তম্ভনি-শাকের অল্প বা মস্তকে শীতল জল সেচন ও তদুপরি ব্যঞ্জন বায়ু প্রভৃতি দ্বারা নিদ্রাকর্ষণ। এই জাতীয় নিদ্রা আকস্মিকীও হইতে পারে, যেমন অজ্ঞাতসারে কোন বিষ বা মাদক বস্তু উদরস্থ হইলে সংজ্ঞার অপগম দৃষ্ট হয়। পঞ্চম প্রকার নিদ্রা—ব্যাধ্যনুর্ভক্তিনী অর্থাৎ কোনও রোগের স্বভাব হইতে উৎপন্ন। এ নিদ্রা যেমন কোন কোন রোগের উপজব, অতিনিদ্রাও তেমনি রোগবিশেষের উপসর্গস্বরূপ উপনীত হইয়া থাকে। ষষ্ঠ প্রকার নিদ্রা—রাত্রি-

স্বভাব-প্রভবা । নিশা সময়ের এমনই প্রকৃতি যে, তৎসময়ে অস্বাভিক পরিমাণে সকলেই নিজাদৈবীর সংসোধন আবেশে অভিভূত হইয়া থাকে ।

যখন তেজঃপূর্ণ স্বর্ঘ্যদেবের বিশ্রান্তির পর, তৎপ্রতিনিধি প্রদীপাদি-সত্ত্ব আলোকেরও পর্যায়ক্রমে জন্ম-মৃত্যু সংঘটিত হয় ও দিগ্দিগন্ত অন্ধ-কারাচ্ছন্ন, অগৎ নিঃশব্দ নিঃসত্ত্ব হইয়া পড়ে, তখন নিজা নিজমূর্ত্তির সহিত জাগতিক মূর্ত্তির সামঞ্জস্য দেখিয়া অস্বাচিত অনাহত ভাবে স্বয়ংই জীবদেহে আশ্রয় লইয়া থাকে ।

রাত্রিস্বভাব-প্রভবা মতা যা

তাং ভূতধাত্রীং প্রবদন্তি নিজ্রাং ।

তমোভবা মাহুরঘশ্চ মূলং

শেষং পুন বর্ষাধিবু নিদ্দিশন্তি ।—সূত্রস্থান ।

যে নিজা রাত্রিস্বভাবস্বলভ তাহাই ভূতধাত্রী অর্থাৎ জীবগণের পালয়িত্রী নামে আখ্যাতা । এই নিজাই দেহের পুষ্টিসাধনী, মনের স্বৈর্য্যবিধায়িনী এবং জীবকুলের জননীর জায় পরম হিতকরী । আর যে নিজার কারণ তমোভাবিক্য তাহা পাপের মূল এবং অগণিত অনিষ্টের আকর-স্বরূপ । এতদ্ব্যতীত অস্বাভিক প্রকার সমস্ত নিজাই (অর্থাৎ আগন্তুকী, প্লেয়সত্ত্বতা, ও ব্যাধামূবর্ত্তিনী এই তিনই) ব্যাধির মধ্যে পরিগণিত, যেহেতু, এই তিন প্রকার নিজা হইতেই দৈহিক কষ্টামুভব হইয়া থাকে ।

নিজ্রায়ন্তং স্মখং দুঃখং পুষ্টিঃ কাশ্রং বলাবলং ।

রুযতা ক্লীবতা জ্ঞানম্ অজ্ঞানং জীবিতং ন বা ॥—সূত্রস্থান ।

পূর্ব্বোক্ত নিশামূলতা ভূতধাত্রী নিজার উপরেই মনুষ্যের সুখ, দুঃখ, পুষ্টি, ক্লেশতা, বল, অবল, বীর্ঘ্যবস্তা, ক্লীবতা, জ্ঞান, অজ্ঞান, জীবন ও মরণ নির্ভর করে । বস্তুতঃই নিজামূলক মনুষ্যের সন্তোষার্থ বিষয় সমুদায়ের মধ্যে প্রধানতম বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না । যদি একদিন অভ্যস্তকাল-পেক্ষা একটু বিলম্বে নিজা হয়, তবে শরীর ও মনের যে কি অবস্থা হয় তাহা বোধ-হর কাহারও অবিদিত নাই । আবার যদি সমগ্র রাত্রিটী এককালীন নিজামবীর প্রসাদ-প্রাপ্তি না ঘটে, তাহা হইলে যে কত ব্যতনা হয় তাহার

উল্লেখ নিম্নরোধন । কিন্তু উপযুক্ত কতিপয় দিবস পর্য্যন্ত একাদিক্রমে নিদ্রালাশবর্জিত হইয়া নিশাধাপন করিতে হইলে, যে চর্চনা হয়, তাহা অবর্ণ-
নীয়—অচৌব লোমহর্ষণ—মনে করিতেও প্রাণ চ্যুতিকা যায় । শুনা যায়
কোনও পাশ্চাত্য প্রদেশে দণ্ডা ব্যক্তিকে কারাগারে পুরিয়া অপরাধের ভারতম্যা-
নুযায়ী পাঁচ সাত দশ বা ততোধিক রাত্রি পর্য্যন্ত দণ্ডারমান রাখা হইত এবং
বিন্দুমাত্র নিদ্রার আবেশ উপস্থিত হইবামাত্র, প্রহরীর লণ্ডাঘাতে তাহা অপ-
সারিত করা হইত ! পাঠক ! মনে হয় না কি যে, এই দণ্ড বিধ, অস্ত্র বা
উৎকলন অপেক্ষাও ঘোরতর !

নিদ্রা শরীরের পুষ্টিজনক,; দুত চঞ্চু মাংসাদি সহস্র বলকর আহাৰ্যের
নিভাত্যাস থাকিলেও নিদ্রা বাতিরেকে কদাপি শরীরের পুষ্টিসাধন হয় না ।

আহাৰ্য্যাকর্ষক দেহপুষ্টি না হইলে শুক্রধাতুর সঞ্চারণে যথামাত্রার হয়
না—সুতরাং শুক্রের হ্রাসহেতু ক্রমে পৌরুষশক্তির হানি হইতে পারে ।
অস্ত্রান্ত শরীর বস্ত্রের অপেক্ষা মস্তিষ্কেই সর্বাধিক নিদ্রার সাহায্যাপেক্ষী ;
যেহেতু, সমস্ত বস্ত্রেরই মধ্যে মধ্যে নানাধিক বিশ্রাম আছে, কিন্তু উক্ত বস্ত্রের
ক্রিয়া অবিশ্রান্ত—কারণ মনুষ্যের চিন্তাস্রোতঃ সর্বদাই বহমান । নিদ্রা-
ব্যতীত চিন্তার বিরতি নাই—মস্তিষ্কেরও বিশ্রাম নাই । সুতরাং অবিশ্রান্ত
নিদ্রাশীনতার ক্রমে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া বুদ্ধিবংশ বা উদ্ভাদ রোগ উপস্থিত হয় ।

অনিদ্রা দ্বারা বায়ুরক্তি বা স্নায়বিক উত্তেজনার আতিশয়া, তৎসঙ্গে
পিত্তেরও প্রকোপ হইয়া থাকে । বায়ু ও পিত্ত যুগপৎ কুপিত ও একত্র
মিলিত হইয়া সমীরণসহকৃত প্রচণ্ড অগ্নির দ্বারা শরীরস্থ সপ্তধাতুকে দহ্য করিয়া
ফেলে—এ অবস্থার পরিণাম মৃত্যু । সুনিদ্রা দেহমন্দিরের অন্ততম সন্তানরূপ ।
অপি চ সুনিদ্রা স্বাস্থ্যের একটা প্রধান লক্ষণ । (ক্রমঃ)

আশা বৈতরণী নদী ।

বহুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি "আশা বৈতরণী নদী" অর্থাৎ বৈতরণী
নদীর যেমন আদিমত নুই আশার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ । আশার

ছলনায় একবার পড়িলে তাহার হস্ত এড়ান দুঃসাধ্য। আশা যতই ফলবতী হউক না কেন, তাহার দৈর্ঘ্য কি ছুতেই হাস হয় না।

কুরুরাজ দুর্ঘোষন পঞ্চ পাণ্ডবকে হুচ্যগ্রপ্রমাণ ভূমি দিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহাদিগকে বধনাপূর্বক স্বয়ং একমাত্র ধরনীধর হইবার আশায় বৃক বাঁধিয়া কুরুপাণ্ডবের মহাসমরের স্রষ্টা করিয়া অগণ্য কল্লিরকুল বিনাশ করিয়া শেষে শত ভ্রাতা সহ নিজে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হায়, কোথায় তাঁহার সাম্রাজ্য লাভ! আশার ছলনায় তাঁহার কি সর্বনাশই সংঘটিত না হইল! !

মহারাজ যযাতি পুত্রের যৌবন লইয়া সহস্র বর্ষ সুখসন্তোষ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। বাস্তবিক আশ্যুন্ন সীমা নাই। স্মৃত সংযোগে অগ্নি যেমন বর্দ্ধিত হয়, মানব হৃদয়ে আশা তদ্রূপ প্রতিনিয়ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মহারাজ যযাতি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

স্ববিধা কৃষ্ণবস্ত্রে ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥”

বস্তুতঃ আশা অকূল পাথর; তাই ইহার অপর নাম “বৈতরণী নদী”। আশার মোহন মুরলীধ্বনি শ্রবণে জীবহৃদয় উন্নত হইয়া উঠিতেছে। বিবাদ বিসম্বাদ মারামারি কাটাকাটি খুনখারাপি পানথররাত জগতে যাগ কিছু ঘটনা ঘটিতেছে তৎসমুদায়ের মূলই আশা। একদিকে আশা মানবহৃদয়ে যেমন উত্তপ্ত দাবানল জ্বালিয়া দেয়, অপরদিকে তদ্রূপ প্রাণে অমৃত সিঞ্জন করে। আশা না থাকিলেও মানবের পক্ষে জীবনধারণ করা দুঃসহ হইত। একটি উপযুক্ত উপার্জনশীল পুত্র কালকবলে পতিত হইল, অমনই পিতা মাষ্টা তাঁহাদের পঞ্চম বয়স শিশু পুত্রটির প্রতি কত আশা করিয়া তাহার মুখ চাহিয়া রহিলেন; আশা—পুত্র কালে ‘দেশের এক’ হইয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিবে।

বর্তমান বর্ষে আমাবুষ্টিতে কৃষকগণ সর্বস্বাস্ত হইল কিন্তু তবুও হতাশাস হইল না, আগামী বর্ষে সুবৃষ্টির আশায় রহিল। যথাসময়ে সুবৃষ্টির সমাগমে দিশূণ উপভোগ করে কৃষকবর্গ কর্তব্যক্ষেত্রে খাটিতে লাগিল; কিন্তু হায় সবই দ্রিয়ল; আভিবুষ্টিতে এ বার কৃষকগণের অনন্ত আশা কোথায় ভাসিয়া গেল,

সকলেই মাথায় হাত দিয়ে কাঁদিতে বসিল, কিন্তু পরক্ষণেই আপার মোহন বংশীধ্বনি শ্রবণে আশ্রিত হইয়া আগামী বর্ষের প্রতীক্ষায় প্রহিল। আশা আর ফুরায় না—তাই বলিতে হয় আশা বৈতরণী নদী। কিন্তু হোক তাহা 'বৈতরণী নদী', তা বলিয়া তাহাকে ধ্বংস করিও না। আশা না থাকিলে মানবের মনুষ্যত্ব কে সম্ভাবিত করিয়া রাখিত !!

আশা তিন ভাগে বিভক্ত যথা আশা, হ্রাশা, নিরাশা। বর্তমানযুগে আমাদের আশা, হ্রাশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাই তাহার তীব্র উত্তাপে আমাদের হৃদয় ঝালসাইয়া বাইতেছে। অধুনা কলু, তাঁতী, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি সকলে ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া একটা কিছু (অর্থাৎ ডেপুটী বা তদ্বিশেষ) হইবার প্রত্যাশায় আকুল হইয়া শিক্ষালয়াভিমুখে ধাবমান হইতেছে। কলু ঘনি বেচিয়া, কৃষক তাহার বহুকষ্টসঞ্চিত লাভল ধানি বেচিয়া, পুত্রের পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ করিল; পুত্র যথাসময়ে ছই কলম ইংরাজি শিখিয়া হ্যাটকোট আঁটিয়া চুরট বার্ডসাইয়ের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন। নিজের পদবীতে পরিচয় প্রদান করিতে লজ্জিত হইয়া শ্রামা কলু লিখিতে আরম্ভ করিলেন 'শ্রামচরণ দাস'। হরে ধোবা লিখিতে শিখিলেন 'হরিচরণ দেব'। আর সেই শিক্ষিত পুত্রদের মাতা পিতা পৈত্রিক রীতিনীতি অবলম্বন করিয়া চলাতে পুত্রগণ নিগ্ৰহে অপমানিত বোধ করিয়া Oldfool বলিয়া তাঁহাদিগকে Don't care করিলেন। শিক্ষার ফল ত এই! মাতা পিতা বহু আশা করিয়া যে পুত্রের শিক্ষার্থে সর্বস্বান্ত হইলেন, সে পুত্রের অবস্থা ত এই! কিন্তু এমন কেন হয়? বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাকে হ্রাশার ফল বলিয়া অনুমিত হয়। আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত হইবার আশা করা হ্রাশা মাত্র। অধুনা সকলেরই ধারণা—শিক্ষা কেবল চাকরী করিবার লক্ষ্য; সুতরাং "ওকপাঠ" গোচ চাকরীর উপযুক্ত শিক্ষালভ করিয়া সকলেই নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকরী করিতে ছুটিলেন। অনেকেই তাহাতে হতাশাস হইয়া "ইতঃ প্রষ্ট স্ততোনষ্ট ন চ পুরৌ ন চ পরঃ" গোচ হইয়া রহিলেন। শিক্ষিত আজকাল সবাই—কিন্তু রাজসরকারে এত চাকরী কোথায়, তাহা একবার কেহ ভাবিয়া দেখিবেন না। আজকাল শিক্ষার উদ্দেশ্য—মাত্র চাকরী করা, সুতরাং তাহাতে নিজস্বাধীনতা বা কৰ্তব্য শিক্ষা

কিছুমাত্র হয় না। এমত অবস্থায় উন্নতির আশা ছুরাশামাত্র। এই ছুরাশা পরিত্যাগপূর্বক নিজ ধর্মশাস্ত্র ও কর্তব্যাত্মনীন সহ যদি সকলে নিজ নিজ ব্যবসায় রক্ষা করিতে যত্নবান হন, তবে স্বীয় জীবনের ও অবস্থার উন্নতি হয়। অধুনা আশাদের দেশীয়গণ সকলেই নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকরী করিয়া জীবন যত্ন করিবার জন্য স্বাক্ষরদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়াই আমরাহিকে প্রতিনিয়ত বিদেশীয় ব্যবসায়ীদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইতেছে। স্বর্ণপ্রস্থ ভারতের অধিবাসিগণের লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য বিদেশীয়গণ বস্ত্র আনিয়া ধোগাইতেছেন। বলিহারি ভারতবাসীর শিক্ষা! বলিহারি তাঁহাদের অপূর্ব কৃতি!!

হৃৎধের বিষয় এই, ছুরাশা পুরুষহৃদয় করতল পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিত হয় নাই। রমণীদের কোমল মস্তিকে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদেরও মস্তিক বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। পূর্বক যে বাড়ীর কর্তা খানফাড়া পরিয়া কাটাইয়াছেন, আজ সেই বাড়ীর পূত্রবধূর করাসডাসার ধুতি না হইলে লজ্জা নিবারণ হয় না, তাঁহাদের মান সজ্জন রক্ষা হয় না।

গৃহীণীগণ আর সংসারের কার্য দেখিতে পারেন না। সন্তানপালন করিতে গেলে বন্ধাটে তাঁহারা পীড়িতা হন, রাখিতে গেলে মাথা ধরে, কাজেই প্রতি গৃহে দাসদাসী চাই স্ত্রীরাং খোরাক পোষাক ৫০ টাকা মাহিনা দিয়াও দাসদাসী খুঁজিয়া মেলা ভার। কুড়ি টাকা মাহিনার একটি চাকরী খালি হউক, দেখিবে বিএ, উপাধিদারীর রাশি রাশি দরখাস্ত আসিয়া জুটিয়াছে। কিন্তু আট টাকা মাহিনা স্বীকার করিয়া একজন পাচক খুঁজিয়া মেলা ভার হইবে। এই সমস্তই শিক্ষার ফল! আধুনিক শিক্ষা পূর্ণ ভাবে হইতেছে না, অর্ধশিক্ষা হইতেছে মাত্র। আর্থিক বস্ত্র পরিধানে যেমন লজ্জা নিবারণ হয় না, তদ্রূপ অর্ধ শিক্ষার জীবনের উন্নতি হইতে পারে না। অর্ধের কিছুই ভাল নহে! আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর প্রতি সমাজপতিগণের দৃষ্টি পতিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

সমাজে অশান্তির ইয়ত্তা নাই—হিন্দুরমণী আজ ডাকের পুত্তলীবৎ গৃহ শোভাপূর্ণনের সামগ্রীমাত্র। যে হিন্দুরমণীর পবিত্র নাম ইতিহাস উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে, যে হিন্দু রমণীর নাম প্রাতঃস্মরণীয়, যে হিন্দুরমণী

“শ্রীয়েব স্ত্রী ন সংশয়ঃ” সেই হিন্দুরমণী আজ এঁকি ভাবে বিরাজিত ! ভারতের হৃদশার আর বাকী নাই । কিন্তু এই হৃদ্বিনেও আমরা হিন্দুরমণীর মুখের দিকে কত আশা করিয়া সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছি । ভরসা, তাঁহারা নিজ ভ্রম সংশোধন করিয়া, আবার তাঁহাদের পবিত্র ধর্মপ্রাণতায় ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন । তাহাদেরই গুণে সোণার ভারতে আবার সোণা ফলিবে । রমণীর এই অধঃপতনের দিগেও আমরা তাঁহাদের প্রতি নিরাশ হই নাই, কত আশার বুক বাঁধিয়া রহিয়াছি । তাই বলিতে হয় “আশাবৈভরণী নদী” !

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী ।

বিনোদিনীর কটাক্ষ ।

বিনী’র বয়সের তুলনায় তার কটাক্ষের ব্যাসটা অনেক বেশী । ব্যাস কথাটা শুনিয়াই বোধ হয় অনেক পাঠক ওটাকে ব্যাসকূট ভাবিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন । বসিবারই কথা বটে, কেন না জ্যামিতি শাস্ত্রটা পরীক্ষার পর হইতে অনেকেরই একেবারে জগন্নাথকে দান করা হইয়াছে কি না ! তার উপর আবার কটাক্ষের ব্যাস । ওঃ কি বিরাট কল্পনা ! যদি কটাক্ষের ব্যাস রহিল, তবে নিশ্চয়ই কটাক্ষ একটা তলক্ষেত্র ? সন্দেহ কি ? কিন্তু শুধু কি তলক্ষেত্র ? কত অতল, বিতল, স্ততল, ধরাতল, রসাতল ঐ কটাক্ষের তলস্থ । তুমি বোগী, আজামুলম্বিত অশ্রুজালে তোমার কঙ্কালের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত, তুমি ষট্চক্রভেদ করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মার সম্পর্ক ঘনীভূত করিয়া, শিবাৎ নিষ্কম্প প্রদীপের মত গিরিগহ্বরের এককোণে পাতরচাপা পড়িয়া আছ, কিন্তু আমার চতুর্দশবর্ষীয়া বিনী’র পরীক্ষার তোমার যোগ বাগ সব উড়িয়া গেল । বিনী’র বাই একটা কটাক্ষের রেখাপাত, অমনি কোথায় বা তোমার অহুত্তরঙ্গ অন্তোদ্বিগ্ন গাভীর্ঘ্য ! আর কোথায় বা তোমার অবৃষ্টিসংরম্ভ অমুবাহের ভীতিমিশ্রিত প্রশান্তভাব ! সবই বেন বাশপাতার তরলতা ! সবই বেন শরতের উড়ন্ত মেঘ ! ওঃ কি

কটাকের ভেজ কিস্ত! এই বে তোমরা দেবতা দেবতা কর, দেবভাব ও পশুভাবের তুলনার তোমাদের মুখে যে উনপঞ্চাশ পবনের অধিষ্ঠান হয়, সেই দেবাদিদেব মহাদেবের দশাটা ভাব দেখি। যাই মদন একটা হাওয়ার বাণ ছুঁড়িল, অমনি “হরস্তু কিঞ্চিং পরিদুপুধৈর্যাঃ”। শুধু কি তাই! “উমা-মুখে বিশ্বকলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলৌচনানি”। ছি, ছি কি বেয়াদবী! তুমি আমি—নরকের কীট, যে ভাবে অক্ষত যৌবনের প্রকালে, অপরি-তর্পণীয় লালসায় লেগেগোবরে জড়াইয়া থ হইয়া থাকিতাম, আজ বশী ব্যোমকেশ কি না সেই ভাবে, আমি শপথ করিয়া বলিতে সাহস করি, কালি-দাস সাক্ষী, ঠিক সেই ভাবে, আমাদের চেয়ে বরং এক ডিগ্রী বেশী হাড়-গোড় ভাঙা দ এর মত “দিশাং উপাশ্বেবু সসর্জ্জ্বলিঃ”। তবে চতুর-চূড়ামণি পঞ্চানন একটু চালাক কি না, তাই নিজের দুর্বলতা ঢাকিবার জন্ত ক্রোধে তালপাতার আঙুলের মত দপ করে জলে উঠেই “ভস্মাবশেষং মদনং চকার।” তাই না হয় হ'ব, মদন ছোঁড়া মরিল, পৃথিবী জুড়াইল, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বয়াটে ছেলেগুলো বাপমায়ের বশীভূত হইল; ও হরি, কোথা থেকে এক সরস্বতী ভেসে এসে কি বোলছে শোন। রতি যখন কামের বিরহে একাত্তই কাতরা, তখন আকাশবাণী তাহাকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলিতেছেন—

কুসুমায়ুধপত্রি ত্বলভস্তন ভর্তা ন চিরাত্তবিষ্যতি।

শুণু যেন স্বকর্ণণা গতঃ শলভত্বং হরলৌচনার্চিবি ॥

অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ স্বস্বভায়ামকরোং প্রজ্ঞাপতিঃ।

অথ তেন নিগৃহ্য বিক্রিয়ামভিশপ্তঃ ফলমেতদঘভূৎ ॥

পরিণেয্যতি পার্বতীং বদা তপসা তৎপ্রবণীকৃতো হরঃ।

উপলব্ধস্বখস্তদাস্মরং বপুষা যেন নিয়োজয়িষ্যতি ॥

ভাবটা হইল এই—রতি তুমি কাঁদিও না, তোমার ভর্তা বাঁচিবে। এক-দিন তোমার স্বাক্ষী, চারকলে বৃড়া অন্তদন্তহীন পিতামহ ব্রহ্মাকে তামাসা করিয়া একটা ফুলের বাণ মারিয়াছিল। পিতামহের নিক্সাগোনুধ বৃড়োখাত্ত কি না, তাই সেই কুসুম শরাঘাত সাজ্বাতিকরূপে এরূপ লাগিল যে সেই আঘাতে তাঁহার সেই চতুর্বেদচিন্তাশ্রিকাপ্রস্থ মস্তিষ্কটা তমোবহল হইয়া “স্বস্বভায়াম” কেমন একটা বিকৃতভাষ্টি ফেলিয়া দিল। অমনি উঠিয়াই

মদনকে এক প্রকাণ্ড শূণ্য প্রদান। যেমন তুমি আমাকে এমন করিলি, তেমনি তুমি মহাদেবের চৌখের আঙনে গুড়ে মরি। সে দিনের হৌড়া তুমি, তাকে হ'তে দেখলুম, আমার সঙ্গে ফুল ছুঁড়ে ইয়রিকি ? হা ভগবান, তুমিই জান, শ্রুতির ঘাড়ে দোষের বোঝা চাপাইয়া করজন করেদী কারাবাগের কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এখনও সরস্বতীর কথা স্মরণ নাই, আরও আছে। সরস্বতী রতিকে পত্রিমিলনের তারিখটা বলিয়া দিতেছেন, দেখ রক্তি, যে দিন শৈলসুতার সহিত মহাদেবের বিবাহ হইবে সেই দিন তিনি সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া তোমার স্বামীকে বাঁচাইয়া দিবেন। হবেই ত—

“অশনেরমৃতস্ত চোভরোর্বশিনশাষুধরাশ্চ ধোনয়ঃ।

অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ আর মেঘ উভয়েই অশনি ও অমৃতের আধার। ভ্রমলোকের কি আর চিরকালই রাগ থাকে ?—মধ্যে মধ্যে অমুগ্রহ স্মরণটাও তাঁদের অভ্যাস আছে। তবে অমুগ্রহটা স্বার্থশূন্য হইলেই লোকের কাছে প্রাপথুলে প্রশংসা করা যায় মাত্র।

হা অদৃষ্ট ! মহাদেবের কথা প্রসঙ্গে আবার বুড়া পিতামহের কেলেঙ্কারীটে বাহির হইয়া পড়িল। ষাঁর মুখের বাণী বেদ, ষাঁর রচিত বিখে বাসা বাঁধিয়া গরিব বেচারীর “দিনগুজরান্ হয়, তিনিও আবার কম পাত্র নন। কনিষ্ঠটা ছিলেন “শৈলসুতারং”, তিনি আবার “স-সুতারং”। কার কথা বা কাকেই বলি, কেই বা শোনে কেই বা বিচার করে।

ব্রাহ্ম মন, কি বকিতেছে ? তুমি যাহাদের কামুকতার কথা লিখিয়া কালী কলম কলুণিত করিতেছ, তাঁহারা যে “জগতঃ পিতরৌ”, তাঁহারা যে “বন্দ্যো পার্কর্তীপরমেধরৌ” ! হউন না তাঁহারা “জগতঃ পিতরৌ”, হউন না তাঁহারা “সহরস্ত্র ভ্রাতরৌ”, হউন না তাঁহারা “স্বর্গস্ত গুরুতরশিষ্যৌ”, হউন না তাঁহারা ব্রহ্মলোকস্ত “পিতাহুহিতরৌ”, তাঁহারা লীলাময়ের করকলিত্র সাকার “ক্রীপংসৌ” বই ত নয়। সুরেশই হউন আর নরেশই হউন, যে হউন না কেন The law must take its own way. আমি বিজ্ঞান লিখিতে বসিয়াছি, পন্নয়ের ঘোষটা দিলে চলিবে কেন ? মেডিকেল কলেজ খুলিয়া বসিয়াছি, মড়ার গন্ধে যুগা করিলে উপায় কি ? ভগবানের আইন লিখিতে বসিয়াছি, রাজার বিচারকে গোবর বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। এ ত স্বভাবের নিয়ম।

মত বিনী'র উপর ভগবানের খোলা হুকুম। এই যে, তুমি আমি পুরুষ জাতি, লক্ষ্যে যক্ষ্মে-খোদ ভগবানের গায়ে পড়িয়া নিবাহারী বাইতে উৎসুক, গরলা-
 নীর হৃদয়ে হিসাব, চাকরাণীর পূজার বস্ত্র, তনয়ের চোখের চসমা এই সকলের
 প্রাণশোষণী তালিকা দেখিয়াই দিনের মধ্যে হই শতবার নির্বিকল্প সমাধির
 আশঙ্ক উৎসর্গে নিদ্রিত হইবার জগ্ন শাখারিত; যদি ভগবান্ বিনী'কে পাঠা-
 ইতে ছুলিতেন, তবে তাহার এই লীলাক্ষেত্র একবারে সাড়াশব্দহীন হইয়া
 বাইত। তাই লীলাময় ভগবান্ কৌশল উদ্ভাবন করিয়া বিনী'কে মাথার
 দিয়া দিয়া বলিয়া দিলেন, হে অচেতনে, জিগুণে, 'বীজধর্ম্মিণি, প্রেম-
 ধর্ম্মিণি, অমধ্যস্থধর্ম্মিণি বিনোদিনি তুমি অবিলম্বে একাকিনী ধরাধামে গমন
 করিয়া চেতনাবান, নিশ্চ'ণ, অবীজধর্ম্মী, অপ্রসন্নর্ম্মী, মধ্যস্থধর্ম্মী পুরুষ রাশিকে
 বলে হউক ছলে হউক কৌশলে হউক ভুলাইয়া রাখ। যখন তাহার আমার
 লীলাগ্রহি ছিড়িতে উদ্যত হইবে, তখনই হে অচেতনে, একবার তাহাঁদের
 উপর কটাক্ষপাত করিবে মাত্র। অমনি দেখিবে তাহার আমার ভুলিয়া,
 তোমার জড়তাকে চেতনা মিশাইয়া তোমারই চারিদিকে ঘুরিতে থাকিবে।
 যেমন কুম্ভমে ভ্রমর, সেইরূপ জীরুপে জীবজগৎ দিশা হারাইয়া ছুটাছুটি
 করিয়া বেড়ায়। যেখানকার ফুল সেইখানেই থাকে, কিন্তু বেচারী অগির
 আর বিশ্রাম্ নাই। কেবল গুণ গুণ গুণ গুণ।° পুরুষ নিশ্চ'ণ পাগল, আশার
 মাস। সে ব্যোমবানের মত সরল প্রাণে উন্মুক্ত পবনে, উদাসগগনে উড়িয়া
 বেড়াইতে উৎসুক। কিন্তু হে ত্রিগুণ, তুমি গুণময়ী বাসনা হইয়া, ব্যোম-
 বানের বালির মত, লীলাক্ষেত্রেই চারিদিকে তাহাকে ঘুরাইয়া লইয়া
 বেড়াইবে।

তুমি মাতৃভাবে তাহাকে সত্ত্বগুণে বাধিবে, জারাভাবে তাহাকে রজো-
 গুণে কাঁড় করাইবে, কন্ডাভাবে তাহাকে তমোগুণে টিমুগ্ন করিবে। সে
 আশাকে ভুলিয়া তোমারই উপর ভক্তি, প্রেম ও স্নেহধারা বর্ষণ করিলে,
 অগির দেখিয়াই সুখী হইবে। আমি পুরুষে জগতের বীজ রাখিয়াছি সত্য,
 কিন্তু তাহা রাখার কথা মাত্র। তুমি ক্ষেত্ররূপে সেই বীজ গ্রহণ করিয়া
 গোষণ করিবে; বর্ধন করিবে, এবং উপযুক্ত সময়ে আমারই চোখের হাটে
 তাহাকে ছাড়িয়া দিবে। সে তোমারই গুণ গাহিয়া মা মা বলিয়া ডাকিবে,

তোমারই চরণে কুমুম রাশি ঢালিয়া আনন্দে ভাসিবে ; আমি দেখিইয়া স্থখী হইব, আমার সৃষ্টিলালা সার্থক হইয়াছে ভাবিয়া বড়ই প্রীতি অনুভব করিব। হে সংসার লক্ষ্মি, উদাসীন ঘোমভোলা মহেশ্বর, যখন আর ব্যয়ের হিসাব তুলিয়া, সংসারকে অসার ভাবিয়া নিজের কর্তব্য বিষ্মত হইবে, তখনই হে সায়াক্ষপিণি ! তুমি পাবাণ-নন্দিনী হইলেও, একবার দয়া করিয়া তোমার সেই সুন্দর মুখখানির অনন্ত-সুগত কটাক্ষটুকু তাহার প্রতি বিক্ষেপ করিও। সেই যে তোমার কটাক্ষ-তরঙ্গ তাহার মর্শ্বস্থানে স্পর্শিবে, তাহাতে জগতের কল্যাণ হইবে, তাহাতেই পাপের হিংস্র ঋণদ মরিয়া পুণ্যের রাজধানী স্থাপিত হইবে। এই ত বিনী'র উপর ভগবানের খোশা হুকুম। এখন বিনী যেই হউক না কেন, যেখানেই বসুক না কেন, সে বৈষ্ণবী সায়ার পরওয়ানা লইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিমুগ্ধ করিতেই আসিয়াছে। তাহার কটাক্ষে কত স্বাক্ষ্য পুড়িয়া ছাঁই হইয়া যাইবে, কত ভ্রমর রাজ্য-সৌন্দর্য্যলহরী তুলিয়া নাচিয়া উঠিবে, কত অমরাবতী শ্রীলষ্ট হইবে, কত সাহারী অমরাবতী হইবে। এ ত বিধিবিহিত বিড়ম্বনা। বিনী'র ইহাতে কোন স্বাধীনতা নাই।

এই যে সহরের ঘোড়াগাড়ী—এ বিনী'র অন্নুগ্রহ। এই যে দরিদ্রের কাঁথানড়ী এ বিনী'র নিগ্রহ। যদি বিনী সংসার ছাড়িয়া যায়, তবে দেখিবে, মালী আর ফুল তুলিবে না, গাছের ফুল গাছেই শুকাইবে ; আকাশে আর সুধাংগু হাসিবে না, চাঁদের সুধা চাঁদেই মিশাইবে ; ধমনীতে আর উৎসাহ নাড়িবে না, বুকের তরঙ্গ নুকেই মরিয়া আসিবে ; জলে স্থলে শূন্য দেশে, ক্রমরে, বাটে, মাঠে, শরনে, ভোজনে যেখানে সেখানে কেবল বিনী'রই অন্নুগ্রহ ত্রিগ্রহের বিনিময় দেখিতে পাই। তাই বলি বিনী'র বরসের তুলনায়, তার কটাক্ষের ব্যাসটা অনেক বেশী। যদিও ভাই, তুমি আমি জ্ঞানকাণ্ডের বজ্রার মাধ্যম তর্কযুক্তির পাল তুলিয়া, অকূলপাথারে পরাংপরের পানসি ধরিতে ছুটিয়াছি, কিন্তু—

তথাপি মমতানর্কে ঘোহগর্ভে নিপাতিতাঃ ।

মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতকারিণঃ ।

তাই বলি, আর গোলমালে প্রয়োজন নাই, এস আমরা বিনী'কেই বিনয় করিয়া বলি—

সর্বস্বল সমস্তো শিবে সর্বার্থসাধিকে ।

পরম্যে ভাষকে যোগি বারায়ণি নরোহিত তে ।

পাঠক, এখন বিনী'কে চিনিয়াছ ?

শ্রীতারাপদ কাব্যতীর্ধ ।

জাতিভেদ সম্বন্ধে দু'চারিটা কথা ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একপে দেখা যাউক, বাস্তবিকই কি পূর্বে ব্রাহ্মণ, কারয় ও শূদ্রগণের মধ্যে আত্মাভিমান ও আত্মমানি, ঘৃণা ও হিংসা বড়ই প্রবল ছিল ? পরস্পরের মধ্যে সমবেদনা ছিল না, পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিতেন না ? আমাদের মধ্যে এখন এত যে অনৈক্য তাহা কি জাতিভেদ হইতে প্রসূত ? কাব্যিকারণ দেখিয়া তাহা ত প্রতীত হয় না। একাসনে বসিয়া একপায়ে আহার করিলে এবং এক গেলাসে জলপান করিলেই যে সহানুভূতি হইল, তাহা সন্দেহ। এ সকল করিয়াও নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্ত এখন আমরা যে তলে তলে অস্ত্রের ক্লতি করিতে ব্যগ্র, কোন প্রতিবাদী, বা সহায়্যারী, অথবা সহ-কর্মচারীর শ্রীবৃত্তি দেখিয়া, আমাদের হৃদয় যে ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে থাকে, তাহা কি উদারহৃদয় সাম্যবাদী অন্বীকার করিতে পারেন ? কিন্তু তখন ত এতকাল ছিল না। ব্রাহ্মণ, কারয়দিগকে ত ঘৃণা করিতে পারিতেন না, বরণ দয়া করিতেন, মেহ করিতেন, সকল কার্যে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। শূদ্রগণের আচার ব্যবহারে ব্রাহ্মণগণের ঘৃণা হওয়া সম্ভব, কিন্তু আত্মাভিমানের দ্বারা তাহারা কারয়দিগকে ঘৃণা করিতেন না। কারয় ও শূদ্রের উপর আমাদের আধিপত্য ছিল। ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে সর্বদা সনাচারী ও ধর্ম-পরায়ণ হইতে শিক্ষা দিতেন। পক্ষান্তরে কারয় ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্যে হিংসা বা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না ; আত্মমানিতেও তাহাদের হৃদয় গূর্ণ থাকিত না। পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি ও আত্মক দায়দায়ক কার্যের বিবাহাদি উপলক্ষে সকলেই আনন্ডিত হইতেন, এখনকার দিনে ;

এবং বিপদে ও সম্পদে, সুখ ও দুঃখে কে হাজার সাহায্য না পাইতেন ?
 পূজার্তনা, ব্রতনিয়ম ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত হইবার নহে ; এবং তত্ত্ববিদ, গণক,
 সুবর্ণবণিক, স্থলধর, কুস্তকার প্রভৃতিকে হিন্দুর সিত্য কার্যে ও নানা জিন্স
 কলাপে সর্ধক্ষণ আবশ্যক। তখন এতদূর সহানুভূতি ও ঘনিষ্ঠতা ছিল
 যে, গ্রামের আবাণ বৃদ্ধ বনিতার নার, পরিচয়, কার্যাদির বিষয় প্রত্যেকে
 অবগত ছিলেন। হিন্দু জাতিভেদে প্রথা একরূপ হুন্দররূপে গঠিত, বিভিন্ন শ্রেণী
 এ প্রকার বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত যে, প্রত্যেকেকেই প্রত্যেকের অবলম্বন হইতে
 হইরাছে। অসুক শ্রেণীর সহিত একবারে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিব, ইহা কাহারও
 বলিবার যো নাই। তখন বিভিন্ন শ্রেণী স্ব স্ব ব্যবসারে নিযুক্ত থাকি হেতু
 এক শ্রেণীর অন্তঃশ্রেণীর প্রতি প্রতিযোগিতা অনিত বিবেচন করিতে
 পারিত না। বিবেচ তার দূরের কথা, এখন সাম্যনীতির অভাবে স্তারপরায়ণ
 ও দক্ষধান হইয়া ব্রাহ্মণ, কারয় ও শূদ্র সকলেরই এক ব্যবসা—চাকুরী হই
 রাছে। এখন এম এ শূদ্র, এম এ ব্রাহ্মণকে আপনায় তুল্য জ্ঞান করেন ;
 যদি উভয়ের কাহারও উচ্চগদ হয়, তবে হিংসার অন্তের ছন্দর ফাটরা যায়।
 এখন সকলেরই এক প্রণালীর বিদ্যা, একরূপ শিক্ষা, একপ্রকার বুদ্ধিই অব-
 লম্বন, ইহাই প্রতিবন্দিতার প্রসূতি ; তাহার ফল অদস্তোষ ও বিদেহ। তখন
 ব্রাহ্মণ কারয় ও শূদ্রকে আশীর্বাদ করিতেন ; এখন হুশিক্ষিত, দাত্তিকতা-
 পূর্ণ হইয়া অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিতকে ঘৃণা করেন। সমাজের এই পরম কল্যাণ-
 সাধনের জন্তই কি আমরা সাম্যনীতি শিক্ষা করিয়াছি ? এই ঘোর বৈষম্যই
 কি স্তারপরায়ণতা ও দুরাশীলতার নিদর্শন। জাতিভেদ-সংহারকারীদের ইহাই
 কি কথ্যতা। একবার নিরপেক্ষভাবে বল দেখি, এই জাতিভেদে ভেদ করিতে
 গিয়া আমরা একস্থলে বদ্ধ হইতেছি, কি তখন একস্থলে বদ্ধ ছিলাম ? স্থির
 আনিও, জীবনের এক উদ্দেশ্য স্তত্রাং এক শিক্ষা ও এককার্য বা ব্যবসার
 অইনকোরই মূল। সকলেই কেবাণী, ডেপুটি, মুন্সেফ বা ডাক্তার হইতে পারিলেই
 একতা জন্মের না। আমাদের সাম্যনৈতিক একতা যে ঘটতেছে না, তাহার কারণ
 জাতিভেদ-প্রথা নহে ; তাহার কারণ অনেকগুলি, এ প্রবন্ধে তদালোচনা
 হইতে পারেনা।

সাম্য চরিত্রের অন্তর্দর্শী হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বুঝিয়াছিলেন, বিভিন্ন সামুখের

বিভিন্ন প্রকৃতি। কেহ বা সৰ্বগুণপ্রকৃতিক, কেহ ব্রজগুণপ্রকৃতিক, কেহ
 ব্রহ্ম: ও তমোগুণ মিশ্রিত, কেহ কেবল মাত্র তমোগুণ প্রকৃতিক। বাহারা
 অধম গুণ সম্পন্ন তাঁহারা ব্রাহ্মণ, বাহারা দ্বিতীয় গুণ সম্পন্ন তাঁহারা ক্সত্রিয়,
 বাহারা তৃতীয় গুণ সম্পন্ন তাঁহারা বৈশ্য এবং বাহারা চতুর্থ গুণ সম্পন্ন তাঁহারা
 শূদ্র। এই গুণ ভেদে—আন্তরিক শক্তিভেদে হিন্দুর জাতিভেদ-প্রথা
 প্রবর্তিত হইয়াছিল। ইংরাজ জাতির যেরূপ ঐশ্বর্য ভেদে জাতিভেদ, যে যত
 ধনী, সে তত উচ্চ শ্রেণীর; হিন্দুদিগের জাতিভেদের আদর্শ সেরূপ নীচ
 প্রকারের নহে। গুণানুযায়ী যেমন জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই সমীচীন
 প্রথা স্থায়ী করিবার জন্য, বাহাতে গুণগুলির উত্তরোত্তর ক্ষুরণ হয়, তাহার
 বিধান হইল। নিম্ন শ্রেণীর সহিত বিবাহ ও আহার ব্যবহার দ্বারা সংমিশ্রণ
 করিয়া সেই ক্ষুরণের ব্যাঘাত জন্মিবে বলিয়া বিবাহাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে;
 নিম্নশ্রেণীর প্রতি ঘৃণা-প্রযুক্ত নহে। বাহারা জাতিভেদের বিরোধী, তাঁহারা
 বলিয়া থাকেন, ইহাতে নিকট জাতি ত নিকট থাকিয়াই যাইবে, উৎকৃষ্টের
 সহবাসভাবে তাহাদের আরও অবনতি হইবে। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া
 দেখিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, শ্রেষ্ঠকে নিকট করিয়া শ্রেষ্ঠ হওয়া অপেক্ষা
 এবং তদ্বারা তাঁহার শ্রেষ্ঠতার ক্রমশ: বিকাশে বাধা দিয়া শ্রেষ্ঠ না হইয়া
 শ্রেষ্ঠের দৃষ্টান্তে ক্রমে ক্রমে শ্রেষ্ঠ হইলে, শ্রেষ্ঠ ও নিকট উভয়েই উত্তরোত্তর
 শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবেন। হিন্দুসমাজে এতদিন তাহাই ঘটিতেছিল; ব্রাহ্মণই
 সকলের আদর্শ ছিলেন। সেই আদর্শ মত অন্য তিন শ্রেণী চলিতেছিলেন।
 তাহার কল, স্বভাব চরিত্রে, আচার ব্যবহারে, ধর্মাচরণে পৃথিবীর অন্য
 সকল জাতির নিম্নশ্রেণী অপেক্ষা হিন্দু জাতির নিম্নশ্রেণী আজিও এত
 উন্নত, এত শ্রেষ্ঠ। যদি বিজাতি বিধর্ষিগণ কর্তৃক ভারত অধিকৃত না
 হইত, তাহা হইলে এই জাতিভেদ-প্রথা কীদূর্ণ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইত,
 কে বলিতে পারে? তমোগুণ সম্পন্ন শূদ্রগণ অধুকরণ দ্বারা ক্রমে ক্রমে
 যে উচ্চতরগুণ লাভ করিতেন, এবং ব্রাহ্মণগণ সত্বগুণের চরমোৎকর্ষ লাভ
 করিয়া যে দেবচরিত্র প্রাপ্ত হইতেন, তাবিষয়ে সন্দেহ নাই। বিরুদ্ধবাদীরা
 বলিবেন, ইহাতে উৎকর্ষতা প্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যেক শ্রেণী এক অবস্থাতেই
 থাকিবে। অবস্থান্তর বা নিজ কৃতিপ্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্যান্তর গ্রহণ করিতে

পারিত না। জিজ্ঞাসা করি, সমাজের প্রথমবস্থায় কর্মকার যে প্রকার লোহের দ্রব্যাদি নির্মাণ করিত, তদ্ব্যয় বেরূপ বস্ত্র বরন করিত, এবং অস্ত্রাস্ত্র শিল্পিগণ যে প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিত, সমাজের উন্নতির সহিত তাহার কি উৎকর্ষতা হয় নাই? এবং প্রত্যেক শ্রেণীর সকলেই এতদিন যদি নিজ ব্যবসারে রত থাকিত, তাহা হইলে কি আরও নূতন নূতন যন্ত্র ও অভিনব শিল্প আবিষ্কৃত এবং প্রত্যেক ব্যবসায়ের অল্পপম শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইত না? এখন কার্যস্থ সুচির কাজ করিতে গিয়া, কর্মকার স্বজন্মের কাজ শিথিতে গিয়া নানা লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন না কি? তার পর রুচি প্রকৃতি অনুযায়ী কার্যাস্তর গ্রহণের বিষয়। সত্য বটে, মৃত কৃষ্ণদাস পাল যদি স্বীয় ব্যবসায় লইয়া থাকিতেন তাহা হইলে বঙ্গসমাজ একটা দুর্লভ রাজনীতিজ্ঞে বঞ্চিত হইতেন; কিন্তু যখন জাতিভেদ প্রথার কঠোর শাসন ছিল, এই রুচিপ্রকৃতি অনুসারে তখনও এক আধটি কৃষ্ণদাস জন্মিতেন। শূদ্র একলব্যের অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান ইহার প্রমাণ। যখন জাতিভেদ-প্রথা উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল, সেই ত্রেতারুণে সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি রামচন্দ্রের সহিত গুহক চণ্ডালের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। একলব্য বা গুহকচণ্ডালের জন্ত জাতিভেদ উঠাইতে হয় মাই। সহস্র বা লক্ষ বৎসরে একটি একলব্য, গুহক চণ্ডাল বা কৃষ্ণদাস পালের জন্ত অশেষ কল্যাণকর, মানবজাতির উত্তরোত্তর উন্নতির প্রধান সহকারী জাতিভেদপ্রথা উঠাইতে হইবে না। এ প্রথা থাকিলেও সেইরূপ মহাপুরুষের উদয়ের ব্যাঘাত ঘটিবে না। যাহার বেরূপ ধারণাশক্তি তাহার সেইরূপ শিক্ষা, সেই প্রকার জ্ঞানার্জন বিধের। পুরাকালে তাহাই হইত; কেহই সম্পূর্ণ অজ্ঞান পশু ছিল না। হিন্দু রাজত্বের বিলোপের সহিত উপযুক্ত নেতার অভাবে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাতে বিধানকর্তৃগণের দোষ কি? পক্ষান্তরে ইংরাজি শিক্ষার বলে জাতিভেদ শিথিল করিয়া যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কি নিতান্ত শোচনীয় ব্যাপার নহে? এন্ট্রেন্স, এক্ এ, বি এ, পাশ করিয়া সকলেই সমান হইয়াছে; এখন সুড়ি মিছরীর এক দর। মন্দটি যত সহজে ও শীঘ্র শিথিতে পারা যায়, ভালটি তদ্রূপ নহে। ব্রাহ্মণ ও কার্যস্থের যে পরিমাণে অবনতি হইয়াছে, শূদ্রের তাহার শতাংশও উন্নতি হয় নাই। এই যে বিবাহের পণ গ্রহণ—ব্রাহ্মণ, কার্যস্থের মধ্যে এই যে অর্থগূণ তা ও পৈশা-

টিক আচার—ইহা কোথা হইতে আসিল? ব্রাহ্মণ জায়গ্হের সেই সদাশয়তা পরার্থপরতা ও মহাহুতাব ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে কেন? ইহা কি নিম্ন শ্রেণীর সংমিশ্রণে নহে? এখনও জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া যায় নাই, ইহাতেই এই ঘটিয়াছে; যদি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্রের বিবাহ প্রচলিত হয় তাহাতে যে নৈতিক অবনতি ঘটিবে, সমাজময় যে উচ্চ অঙ্গতা আধিপত্য করিবে, তাহা কল্পনার আনিতে শরীর রোমাঙ্কিত হয়।

এখন বিচার্য, জাতিভেদ-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া উচিত কি না। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই হিন্দুজাতির যে হ্রদ্বশ ঘটিয়াছে, হিন্দুসমাজ নানা প্রকারে যে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাতে কোন জ্ঞানী, সমাজতত্ত্বজ্ঞ, পরিণামদর্শী ব্যক্তি এ প্রথার উন্নয়নের পক্ষপাতী হইবেন না। যাহারা বাস্তবিক দেশহিতৈষী তাঁহাদের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এ প্রথা যতই শিথিল হইতেছে, আমাদের মধ্যে ততই অশ্রদ্ধা, ততই বিবাদ বিসম্বাদ বাড়িতেছে, আমাদের হৃদয় 'ততই বিবেচনালে দগ্ধ হইতেছে, স্বেচ্ছায় প্রাণ জয় জয় হইতেছে। আমাদের নৈতিক উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে; আমরা দিন দিন ঘোর অবনতির পথে ধাবিত হইতেছি। যে উদ্দেশ্যে আমরা এই পরম হিতকর প্রথা, হিন্দুসমাজের এই প্রধান গ্রন্থি শিথিল করিতে গিয়াছিলাম, তদ্বিপরীত ফলই ফলিয়াছে। নানা বর্ণের মধ্যে যে মহাহুতাব ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিতার লেশমাত্র ছিল না, সমাজে একটা 'হৃদয়' স্রীতিভাব বিরাগ করিতেছিল, তাহার স্থলে ঘোর বিরাগ জন্মিয়াছে, বাহু সায়ের অভ্যস্তরে ভয়ানক বৈষম্যের বিষ সঞ্চিত হইতেছে। সকলে এক চাকুরী—কেরানীগিরি ডেপুটিগিরি, মুন্সেফী প্রভৃতি অবলম্বন করিতে গিয়া এখন অনেকের চাকুরী মিলে ভার হইয়া উঠিয়াছে; গবর্ণমেন্টেও আর চাকুরী যোগাইতে পারেন না। তাই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণের কলরবে জ্বালাতন হইয়া Technical education প্রচলনে ব্যস্ত হইয়াছেন। এই Technical education এরই নামান্তর কার্খকার, স্বত্বধর, কৃষক প্রভৃতির কার্য শিক্ষা দেওয়া। সম্প্রতি শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব হইতেছে। আমাদের একুল ওকুল হুকুল গেল।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত ।

জব্যগুণ বিচার ।

, কটকী ।

বাঙ্গালা নাম—কটকী ; হিন্দুস্থানী—কটকী ; ইংরাজী—Picrorrhiza Kurroa. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কটী তু কটুক। তিক্তা কক্ষাভেদা কটুস্তরা । অশোকা মংশশকলা চক্রাঙ্গী শকুলাদন্তী । মংশপিত্তা কাণ্ডরুহা রোহিণী কটুরোহিণী ॥

ইহা একপ্রকার ঝোপের মত লোমযুক্ত গুল্ম । কাশ্মীর, শিকিম ও অল্প উচ্চ পার্বত্য স্থানে উৎপন্ন হয় ; নিম্নবঙ্গে এ গাছ নাই । ইহার শিকড় একত্র বহুল পরিমাণে নামে । ঐ গুলি ধোত ও খণ্ড খণ্ড হইবার পর বণিকের দোকানে বিক্রয়ার্থ থাকে ; তখন উহা দেখিতে কতকটা পাখীর পায়ে মত হয় ।

কটী তু কটুক। পাকে তিক্তা কক্ষা হিমা লঘুঃ ।

ভেদিনী দীপনী হৃদ্যা কফপিত্তজ্বরীপহা ।

প্রমেহ খাস কাসান্ত দাহ কুষ্ঠ ক্রিমি প্রণুং ॥

রস—তিক্ত ; বিপাক—কটু ; বীর্য—শীত ; গুণ—কক্ষ, লঘু, দীপক, হৃদ্রোগে (কোষ্ঠবদ্ধ ও শোথযুক্ত হৃদ্রোগে) উপকারী, কফপিত্ত ও জ্বরনাশক । প্রমেহ (পিত্তজ) শাস্তিকর, খাস কাস দাহ ও ক্রিমিনাশক, কুষ্ঠ (আত্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগে উৎকট চর্মরোগনাশক) ; প্রভাব—মলভেদক ।

প্রয়োগ—কটকী প্রধানতঃ পিত্ত ও রেচক । ইহা প্রবল ঝোলাপের কাজ করে । ইহার মাত্রা, কাথ করিতে হইলে ।• আনা হইতে ॥• আনা পর্য্যন্ত, কচিং কখন ৮• আনা পর্য্যন্তও দিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে । ইহার ৮• আনা সিদ্ধ করিয়া খাইয়াও দান্ত না হয়, তাঁহার অল্প আর ইহার মাত্রা না বাড়াইয়া, ইহা ত্যাগপূর্বক অল্প রেচক প্রয়োগ করা বা ইহার সহিত হরীতকী সোনামুখী প্রভৃতি রেচকান্তর সংযোগ করা উচিত । কিন্তু হরীতকী সৌদাল প্রভৃতি নির্দোষ মৃদু বস্তু ছাড়া অল্প বিরেচক (কটকী সোনামুখী প্রভৃতি) প্রয়োগ করিতে হইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে মউরী প্রভৃতি কোনও বায়ুনাশক বস্তু থাকিবে ইহা বেশ সর্বদাই মনে থাকে । চরক

বলিয়াছেন—“রেচনং পিত্তহারিণাম্” অর্থাৎ পিত্তনাশ করিতে হইলে বিরেচনই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। আবার তিক্ত বস্তু স্বভাবতঃই পিত্তগ্রন্থিতরাং কটুকী উত্তম কারণেই পিত্তনাশক। এই উত্তম শক্তি থাকায় ইহা পিত্তগ্রন্থ গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ধনে ও মউরীর লেহিত সংযুক্ত হইলে ইহা পিত্তসংহারে বিশেষ শক্তিমান হয়।

জ্বররোগে পাচন দিতে হইলে, সর্কোপেক্ষী কটুকী ষটিত পাচনই ভাল। বস্তুতঃ শাস্ত্রে জ্বররোগে (অতিসার অবর্তমানে) ষটগুলি পাচন আছে, প্রায় সকলগুলির মধ্যেই কটুকী দৃষ্ট হয়।

কয়েকটা মুষ্টিযোগ,—(১) কটুকী, ইন্দ্রযব ও পটোলপত্র, মিলিত ২ তোলা, জল ১/১০ সের, শেষ ১/৮০ পোয়া, দু’তিনবারে সেবা; ইহাতে অবিচ্ছেদ জীর্ণজ্বর শান্ত হয়। (২) কটুকী, পটোলপত্র, অনন্তমূল, মুখা ও মাকনাদি ষথাবিধি কাথ করিয়া পান করিলে ষৌকালীন জীর্ণজ্বর প্রশান্ত হয়। (৩) কটুকী, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পটোলপত্র, গুঁঠ, রক্তচন্দন, মুখা—এই পাচন পিত্তশ্লৈষ জ্বরে উপকারী। (৪) কটুকী, সজ্জনের শিকড়ের ছাল, পিপুল মূল, অনন্তমূল, গুঁঠ, রক্তচন্দন, নিমছাল, হরীতকী প্রত্যেক ১০ আনা, জল অর্দ্ধসের, শেষ ১/১০ ছটাক; ইহাতে শোধিত হিং চূর্ণ ও রতি মিশাইয়া সেবন করিলে স্নীহযুক্ত ষটিত পুরাতন জ্বর নিশ্চিত ভাল হয়। (৫) কটুকীচূর্ণ ও ভাল গিরিমাটা চূর্ণ প্রত্যেক ১ মাষা, মধুসহ ২১৩ ঘণ্টা অন্তর লেহন করিলে হিকা আরোগ্য হয়। এতদ্ব্যতীত, কাস, অন্নপিত্ত, চর্মরোগ, ক্ষত, শোথ, হাতপা জ্বালা, বহুদৃচ্ছ প্রভৃতি রোগের পাচনেও কটুকীর প্রয়োগ হয়।

ডাক্তার মুদন সরিফ বলেন—কটুকী অধিক পরিমাণে রেচক কিন্তু অল্প পরিমাণে (এক আনা আধ আনা) জলের সহিত খাইলে অগ্নিবৃদ্ধি ও অন্নপিত্তের দমন হয়।

সার্কন মেজর টম্‌সন বলেন—ইহা জ্বরে ত উপকার করেই, আর ইহার তীব্র কাথ দিনে ৩৪ বার খাওয়াইলে মলমূত্রাকারে প্রচুর পরিমাণে জল বাহির হইয়া শোথ আরোগ্য হয়।

শোধের কটুকাদ্যালোহ, পুরাতন জ্বরের সর্কজ্বরহরশৌহ ও অমৃতারিষ্ট প্রভৃতি ঔষধে কটুকী আবশ্যক হয়।

কটুফল ।

বাঙ্গালা নাম—কটুফল বা কারছাল; হিন্দী—কারফর; ইংরাজী Myrica Sapida. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কটুফলঃ • সোমবক্শচ কৈটর্ঘ্যঃ কুন্তিকাপি চ ।
শ্রীপর্ণিকা কুমুদিকা ভদ্রা ভদ্রবতীভি চ ॥ সংস্কৃত নাম—কটুফল, সোমবক্শ, কৈটর্ঘ্য, কুন্তিকা, শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, ভদ্রা, ভদ্রবতী ।

ইহা এক প্রকার বড় বক্শ গাছ ; হিমালয়, মালয়, ব্রহ্মদেশ, থাঙ্গিয়া পাহাড় ও বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে ইহা জন্মে । এই গাছের ছোট ছোট ফল হয়, তাহাকেই কটুফল বলে ; কিন্তু ঐ ফলের পরিবর্তে, ছালই ব্যবহৃত হয় সুতরাং কোন ঔষধে কটুফল উল্লিখিত থাকিলে অধিকাংশস্থলে ছালই বুঝিতে হয় ।

কটুফল স্তবর স্তিক্তঃ কটু বাতকফ জরান্ ।

হস্তিখাস প্রমেহার্শঃ কাস কণ্ঠাময়াক্ৰচীক্ ।

রস—তিক্ত কটু কষায় ; বিপাক—কটু ; বীর্ঘ্য—উষ্ণ ; গুণ—বাতশ্লেষ, জ্বর, খাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কাস ও অক্ৰচি নাশক । প্রভাব—কণ্ঠরোগ নাশক (কাথ পানে ও কবল করণে) ।

প্রয়োগ—জরে, জরের সহিত কাসে বা কাসের আত্মবজিক জরে প্রধানতঃ ইহার প্রয়োগ । এতদ্ব্যতিত মুষ্টিযোগ—(১) কারফল, পিপুল, গুলক, কুড়, কুণ্টকারী—এই পাচন কাসযুক্ত জরে উপকারী । (২) কারফল, সৈন্ধব, গোলমরিচ, নিমছাল ও হরীতকীর কাথ করিয়া গরম গরম মুখ মধ্যে ধারণ করিলে গলার মধ্যস্থিত ফোলা ঘা ও ব্যথা আরোগ্য হয় । (৩) কারফল, লোধ, মুথা, হরীতকী প্রত্যেক ॥• আনা, যথাবিধি কাথ কর্তব্য—ইহা পুরাতন মেহ (কুহুনে আব নির্গম) রোগে বিশেষ উপকারী (মফবলের কোনও প্রাচীন কবিরাজ এই পাচন ব্যবহার করেন) ।

কারফল চূর্ণ দ্বারা উত্তম নস্ত প্রস্তুত হয়, অথবা ইহার সহিত অগ্নাঙ্ক মশলা দিয়াও নস্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে । কারফল, তামাকপাতা চূর্ণ, একাদীচূর্ণ একত্র মিশাইলে সুন্দর নস্ত হয়—ইহা নাকে টানিলে ক্রুর শ্লেষ্মা, মাথাধরা প্রভৃতি ভাঙা হয় । ডাঃ আরম্ভিং বলেন—ওলাউঠা রোগী হিমাঙ্ক হইতে থাকিলে কটুফলচূর্ণ ও গুঠচূর্ণ গায়ে মাখাইলে বিশেষ ফল দর্শায় ।

শাস্ত্রোক্ত কট্ফলাদি পাচন বথা—কট্ফল, মুখা, বচ, আকনদ, কুড়, কুম্ভকীরা, ক্ষেতপাপড়া, কঁকড়াশুকী, ইন্দ্রযব, ধনে, শঠী, ভৃঙ্গরাজ, পিপূল, কট্ফলী, হরীতকী, বালা, চিরতা, আমুনহাটী, হিং, বেড়োলা, দশমূল, পিপূল-মূল বথাবিধি কাথ করিয়া হিং ও আদার রস মিথাইয়া সেবনীয়। ইহাতে শাস্ত্রিপাতিক জ্বর, কর্ণমূলশোধ, স্বরভঙ্গ, বাতশ্লেষ্মিক জ্বর, কাস ও শিরোরোগ আরোগ্য হয়।

কঠিনী।

বান্দালী নাম—খড়ী, চা-খড়ী বা খড়ীমাটী; হিন্দী—খড়িয়া ও গোরখড়ী; ইংরাজী—Chalk. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—খটিকা কঠিনী চাপি লেখনী চ নিগদ্যতে। সংস্কৃত নাম—খটিকা, খটা, কঠিনী, লেখনী। অত্র নাম—খবলমুক্তিকা, খেত-খাত্ত, বর্ণলেখা, পাণ্ডুমৎ।

খড়ী অবশ্য সন্দেহেই দেখিয়াছেন—ইহা শুক মৃত্তিকাখণ্ডের মত, দেখিতে শাদা। হিন্দুর ছেলেকে জীবনের প্রত্যাব কালেই খড়ী কি বস্তু তাহা জানিতে হয়; যেহেতু প্রথম অক্ষর পরিচয় কালে নির্দিষ্ট শুভদিনে কাঠফলকের উপরে লিখিত ক খ প্রভৃতি অক্ষরের উপরে খড়ী দ্বারা শিশুকে হাত বুলাইতে হয়। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সহর-স্থান সমুদয় হইতে ক্রমে এ প্রথা উঠিয়া বাইতেছে। কোন কোন পাহাড়ে খড়ী থাকে; যেখানে থাকে, সেখানে উহা প্রকাণ্ড খেতশৈলবৎ দৃষ্ট হয়। উহা দুই প্রকারের আছে—এক প্রকার কোমল ও অতি শুভ্র, আর এক প্রকার কঠিন ও অপেক্ষাকৃত কম শুভ্র। কোমল গুলিকে ফুলখড়ী বলে; এই গুলি দ্বারা স্মৃগ-কলেজে ও রেলওয়ে ট্রেনে বোর্ডের (কাঠফলকের) উপরে লেখা হইয়া থাকে। কঠিন গুলি চিত্রকরেরা রঙের জন্য ব্যবহার করে। উভয় খড়ীরই ঔষধীয় শক্তি আছে—ক্রমে বলা বাইতেছে।

খটিকা দাহজ্বচ্ছীতা মধুরা বিষ শোধয়িত্ব।

তদ্বৎ পাষণখটিকা ব্রণপিত্তাজ্বজিহ্মা।

লেপাদেতদুগ্ণা গোকী ভক্ষিতা মৃত্তিকাসমা ॥

রস—মধুর ; বিপাক—মধুর ; রীর্ষ্য—শীত ; গুণ—দাহনাশক, (বাহু প্রলেপে জ্বালা নিবারক, ভক্ষণে হৃৎকণ্ঠদাহনাশক), শোথন (প্রলেপে) ;
 প্রভাব—বিষনাশক (মক্ষিকাদি দংশনের) । পাষণ্ডখড়ীরও এই সমস্ত
 গুণ আছে ; অধিকতর ইহা রক্তপিণ্ডনাশক, (বেহেতু ইহাতে একটু লৌহের
 অংশ আছে, তজ্জন্তই কুম শুভ্র), প্রলেপে ইহার গুণ ফুলখড়ীর ত্রায় । কিন্তু
 ভক্ষণে মৃত্তিকার তুল্য গুণ । মৃত্তিকার গুণ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য ।

প্রয়োগ—অন্ন, অন্নশূল ও উদরাময়েই খড়ীর প্রধানতঃ প্রয়োগ হইয়া
 থাকে । ইহা ধারক ; ইহার ধারকগুণ কবিরাজ ডাক্তার উত্তর সম্প্রদায়ের
 নিকটেই সুপরিচিত ; কিন্তু পুরোক্ত সংস্কৃত শ্লোকে ইহার এই শক্তির কথা
 সুস্পষ্ট লিখিত নাই—না থাকিলেও একটু চিন্তা দ্বারাই উহা এইরূপে বুঝিয়া
 লওয়া যায়, যথা—“দাহজিৎ” অর্থাৎ দাহনাশক হইলেই পিত্তনাশক হইতে
 হইবে । পিত্তের গুণ শ্রবণ বা নিঃসরণ । কোনও বস্তু এই শক্তির বিরোধী
 হইলেই উহা ‘অবশ্য’ ধারক বা সংকোচক, হইবে । দ্বিতীয়তঃ, ইহা
 “শোথজিৎ” । শোষক বস্তুই শোথনাশক হয়, আবার শোষক বস্তুমাত্রই
 ধারক হইয়া থাকে । যেমন কটুকিরি শোথহর ও ধারক, আফিং শোথহর ও
 ধারক ইত্যাদি ।

এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে “ধারক” বিশেষণ না থাকিলেও আয়ুর্বেদ-
 কারগণ ইহার এই শক্তি জানিতেন ও তদনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করিতেন ।
 শাস্ত্রোক্ত “কঠিঞ্জাদি পেষা”র উপকরণ এই—ফুলখড়ী ৮ তোলা, মিছরি
 ৪ তোলা, গঁদ ৪ তোলা, মৌরী ২ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা এই সমুদায়
 দ্রব্য ঈষৎ কুড়িত করিয়া রাত্রিতে কোনও মুৎপাত্রে ১ সের জলে ভিজাইয়া
 রাখিবে, প্রাতে ছাঁকিয়া লইবে । সেই জল কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া তাহার
 উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ পান করিতে হয় । ইহা অজীর্ণ, গ্রহণী ও আমাশয় রোগে
 উপকারী ।

ফুলখড়ী চূর্ণ ও মউরী চূর্ণ সমভাগে ১০ বা ১০ আনা মাত্রার জলসহ
 সেবন করিলে অজীর্ণ বা অন্নজনিত শূলরোগ নিবারিত হয় । ফুলখড়ী,
 চূর্ণের জল, কড়ী ভস্ম, শামুক ভস্ম, শঙ্খ ভস্ম, ইহারা পরস্পর প্রায় সমগুণ ।
 কবিরাজগণ অপেক্ষা ডাক্তার মহাশয়েরই খড়ী ঘটিত ঔষধ অধিক ব্যবহার

করিয়া থাকেন। বেহেতু, কবিরাজেরা খড়ী অপেক্ষা কড়ী ভস্ম বা শঙ্খ ভস্মকেই অধিক গুণশালী দেখিতে পান। খটিকামিশ্র (Chalk Compound) ডাক্তারদের উদরাময়ের একটা প্রধান ঔষধ। উহার উপকরণ ফুলখড়ী ১১, লবঙ্গ ১০, জায়ফল ৩, জ্যাক্বাণ ৩, বার্কচিনি ৪, ছোট এলাচ ১ ও চিনি ২৫ ভাগ।

খড়ী বা খড়ী ঘটিত ঔষধ একাদিক্রমে বহুদিন সেবন করা উচিত নয়, বেহেতু তদ্বারা অল্পে উহার কিয়দংশ সঞ্চিত হইতে পারে। ষাঁহাদের শূলের অল্প খড়ী ব্যবহার করিতে হয়, তাঁহারা যেন মধ্যে-মধ্যে একটি বিরেচন ঔষধ সেবন করেন, তাহা হইলে ঐ দোষের প্রতীকার হইবেক।

কণ্টকারী।

বাঙ্গালা নাম—কণ্টকারী; হিন্দী—কংটেলি, রিংগিণী বা ভটকটেরা; ইংরাজী—Solanum Tanthocarpum; সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কণ্টকারী তু দ্বঃস্পর্শা ক্ষুদ্রা ব্যাঘ্রী নিদিগ্ধিকা। কণ্টালিকা কণ্টকিনী ধাবনী বৃহতী তথা ॥ (শ্বেত কণ্টকারীর) শ্বেতা ক্ষুদ্রা চন্দ্রহাসা লক্ষণা ক্ষেত্রদূতিকা। গর্ভদা চন্দ্রভা চন্দ্রী চন্দ্রপুষ্পা প্রিয়ঙ্করী ॥ সংস্কৃত নাম—কণ্টকারী, দ্বঃস্পর্শা, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা, কণ্টালিকা, কণ্টকিনী, ধাবনী ও বৃহতী। ইহার অত্র নাম—প্রচোদনী, রাঙ্গীকা, অনাজ্জাস্তা, ভণ্টাকী, সিংহী, বহুকণ্টা, চিত্রফলা।

ইহা এক প্রকার কণ্টকময় গুল্ম, ভূমির উপরে বিস্তৃত হইয়া জন্মে। ইহার ফুল অনেকটা বেগুনের ফুলের মত; ক্ষুদ্র গোলাকার ফল হয়, তাহার পায়ে শাদা চক্রে চক্রে চিহ্ন থাকে। পতিত জমিতে, বালুকাময় ময়দানে ও নদীর তীরে সচরাচর ইহা দৃষ্ট হয়। ইহা দুই প্রকার আছে; এক প্রকার বেগুনে ফুল ও এক প্রকার শাদা ফুল হয়; দ্বিতীয় প্রকারকে শ্বেত কণ্টকারী বলে। শ্বেত কণ্টকারী বড় হ্রস্ত, ইহার সংস্কৃত নাম—শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ঙ্করী।

কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ।

কক্ষোক্ষা পাচনী কাস খাস জ্বর কফানিলান্।

নিহন্তি পীনসং পার্শ্বপীড়া ক্রিমি হৃদাময়ান্ ॥

তয়োঃ ক্লান্ত কটুরসে পাকো চ কটুকং ভবেৎ ।

• শুক্রস্ত ঘেচনং ভেদি তিক্তং পিত্তাঘ্নিকুলম্ ।

হস্তাৎ কফমকং কণ্ডু কাস ভেদ ক্রিমি জরান্ ॥

তৎ পোষ্টা সিভা কুদ্রা বিশেষাদ্ গৰ্ভকারিণী ॥

রস—কটুতিক্ত; বিপাক—কটু; বীৰ্য্য—উষ্ণ; গুণ—কক্ষ;

দীপক ও পাচক, লঘু, কাস ঝাস জর বাতশ্লেষা পীনস পার্শ্ববেদনা ক্রিমি ও হৃদ্রোগ (কাস জনিত) প্রশমিত কারক । প্রভাব—সারক । উত্তরেরই ফল—কটুরস ও কটুবিপাক, শুক্ররেচক (ইহার ফল সেবনে পুরুষের শুক্র শীঘ্র স্থলিত হয় ও স্ত্রীলোকের ব্রজঃ নিঃসারিত হয়), মলভেদক, তিক্ত, পিত্ত ও অগ্নিকর এবং লঘু । ইহা বাতশ্লেষা কণ্ডু কাস ঝাস ক্রিমি ও জর নাশ করে । সাধারণ কণ্টকারীর সমস্ত গুণ যেত কণ্টকারীতে আছে, অধিকতর ইহা গৰ্ভপ্রদ ও বন্ধ্যাদৌষনাশক ।

প্রয়োগ—কণ্টকারীর প্রধান ব্যবহার ঝাস কাস ও মূত্রকক্ষ, রোগে ।

ইহা কফনিঃসারক; সুতরাং যে স্থানে রোগীর অধিক শ্লেষা উঠে, সে স্থলে ইহা না দিয়া, শুষ্ককাস ও খাসের শ্লেষস্রাবহীন আক্ষেপে প্রয়োগ করা কর্তব্য । কণ্টকারীর রস “তিক্ত কটু” লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার তিক্ততা অতি অল্প, মুখে দিলে অতি সামান্য অম্লভূত হয়; তথাপি শাস্ত্রে ইহা পঞ্চতিক্তগণের মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে । পঞ্চতিক্ত কথার যথা—কুদ্রামৃতাত্ম্যং সহনাগরেন সপৌষ্করৈকৈব কিরাততিক্তং । পিবেৎ ক্షয়ারস্বিহ পঞ্চতিক্তং জরং নিহন্ত্যষ্টবিধং সমগ্রম্ ॥ অর্থাৎ কণ্টকারী, শুলক, শুঠ (অধিকতর শুঠও এ স্থলে তিক্তগণ মধ্যে) পুষ্কর মূল এবং চিরতা এই পাঁচটা দ্রব্যকে পঞ্চতিক্ত বলে । এই পঞ্চতিক্তের কাথ সেবন করিলে অষ্টবিধ জর নিবারিত হয় ।

শাস্ত্রে কুষ্ঠরোগাধিকারে যে “পঞ্চতিক্ত দ্বত” আছে, তদ্ব্যতীত কণ্টকারী গৃহীত হইয়াছে; যথা—নিষং পটোলং ব্যাজীক শুড়ুচীং বাসকং তথা..... দ্বতপ্রসং পচেত্তেন ত্রিফলাগৰ্ভ সংযুতম্ । পঞ্চতিক্ত মিদং খ্যাতং সর্পিঃ কুষ্ঠবিনাশনম্” অর্থাৎ নিম, পলতা, কণ্টকারী, শুলক ও বাসক যথাপরমাণে, ত্রিফলাযোগে ৪ সের দ্বত সহ পাক করিবে । এই দ্বতের নাম পঞ্চতিক্ত দ্বত । ইহা কুষ্ঠনাশক ।

ইহার একটা বিশেষণ আছে "সরা" অর্থাৎ মল নিঃসারক । তাই বলিয়া ইহা হরীতকী বা সৌদাল-আঠার মত প্রবল রেচক নহে; বায়ুকে অধঃ করিয়া, বহু মলের নিঃসারিত হইবার প্রবণতা দেয় মাত্র । অস্ত্রান্ত সারক উপ-করণের সহিত মিলিত না হইলে ইহার উক্ত শক্তি সঞ্ছিক প্রকাশিত হয় না । "সরা" শব্দ দ্বারা প্রধানতঃ ইহার মূত্র নিঃসারণ শক্তিই বুঝিতে হইবে ।

ইহা "অগ্নিদীপক ও পাচক" ; তাই বলিয়া ষমানী মউরী প্রভৃতির মত পাচক ঔষধের উপকরণ মধ্যে গৃহীত হয় না । মর্শ্ব এই যে, জ্বর কাস আম-বাত প্রভৃতি রোগে, আম দোষ নিবারণ করিয়া অগ্নির তীক্ষ্ণতা পুনরানয়ন করিতে ইহার শক্তি আছে ।

ইহা জ্বররোগের পাচনে (বিশেষতঃ উহা নাভিলেত্র ঘটিত হইলে) প্রায় সর্বদাই দৃষ্ট হয় । কাস রোগে ইহার প্রয়োগ অপরিহার্যই বটে । কাসযুক্ত জ্বরের উৎকৃষ্ট পাচন—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, কুড়, পিপুল, কটুকী, বামনহাঁটা, শুঠ, ষষ্টিমধু যথাবিধি কাথ করিয়া সেব্য ।

শ্বাসকাসের পাচন—কণ্টকারী, ছুরাগতা, তুলসীমঞ্জরী, বড় এলাচ, কাঁকড়াশুঙ্গী, খেত আকন্দের ছাল, যথাবিধি কাথ করিয়া সেবন করিলে উৎকাসি, শুষ্ককাস ও শ্বাস আরোগ্য হয় । দান্ত না হইলে ইহাতে বহেড়া যোগ দিবে ।

ক্ষুদ্রাদিকষায়—ক্ষুদ্রামৃত্য নাগর পুষ্করাঙ্ঘরৈঃ কৃতঃ কষায়ঃ কক্ষ মার্কতোত্তবে । সখাস কাসাকচি পার্শ্বক্করে জরে ত্রিদোষপ্রভাবে চ শশ্রতে ॥ কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঠ ও পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়) এই সকলের কাথকে ক্ষুদ্রাদি কষায় বলে ; ইহাতে বাতলেত্র জ্বর এবং শ্বাস কাস অকচি ও পার্শ্ববেদনা যুক্ত সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয় ।

ব্যাস্ত্র্যাদি কষায়—ব্যাস্ত্রীটৈচব সিংহীটৈচব লোঞ্জঃ কুষ্ঠপটোলকম্ । জরে কক্ষাক্ষকেটৈচতং পাচনং শ্রাং তদ্বৃন্তমম্ ॥ কণ্টকারী, বৃহতী, লোধ, কুড়, পটোলপত্র এই সকলের যথাবিধি কৃত কাথ প্লেকজ্বরে উপকারী । প্রসিদ্ধ স্বল্প পঞ্চমূলের মধ্যে কণ্টকারীও একটা উপকরণ ; স্বল্প পঞ্চমূল যথা—শালপর্ণী পূর্ণিপর্ণী বৃহতীষয় গোক্ষুরম্ । অর্থাৎ শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; ইহা বাতপিত্ত জনিত সমস্ত রোগের প্রতিকারক ।

কণ্টকারী বাতরোগে (Rheumatism) বড় উপকারী । এতদ্ব্যতিত বাত-
রোগের পাচন ষাণ্ডা—কণ্টকারী, এরণ্ডমূল, তুঠ, গুলঞ্চ প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা,
জল অর্দ্ধসের, শেষ ১/০ পোয়া; হইবারে সেব্য—ইহা বিশেষ ফলপ্রদ ।
দান্ত না হইলে জঙ্গীহরীভক্সী চূর্ণ মিশাইবে ।

কণ্টকারী, কেঁউ ও সৃজিনার মূল এবং উই মৃত্তিকা একত্রে গোমূত্রে পেষণ
করিয়া প্রলেপ দিলে বাতের ফোলা ও ব্যথা নিবারিত হয় ।

শোথ রোগের সিংহাস্তাদি পাচন ষাণ্ডা—সিংহাস্তামৃত ভণ্টাকী কাথং কৃষ্ণা
সমাক্ষিকম্ । পীত্বা শোথং জয়েদ্ জঙ্ঘঃ খাসং কাসং জ্বরং বমিম্ ॥ কণ্টকারী,
গুলঞ্চ, বাসক ছাল, ইহাদের ষাণ্ডাবিধি কাথ করিয়া সেবন করিলে শোথ রোগ
এবং তৎসহ খাস, কাস, জ্বর ও বমি আরোগ্য হয় ।

শুষ্কত কণ্টকারীর ফলের মধ্যে সৈন্ধব লবণ পুরিয়া ঘূটের আশুনে
পোড়াইয়া ঐ লবণ বাহির করিয়া লইবে—এই লবণ ১/০ আনা মাত্রায়, শীতল
জলে গুলিয়া সেবন করিলে সর্দি ও কফ তরল হইয়া উঠে এবং পেট গরম
হইয়া উৎকাশি হইলে বা কাসিতে কাসিতে বমি হইলে তাহী নিবারিত হয় ।

ডাঃ উইলসন বলেন—কণ্টকারী, তিক্ত বলকারক (bitter tonic) ও
উদরের বায়ু নাশক । পদতলে প্রদাহ ও জলযুক্ত ফস্কুড়ী হইলে ইহার প্রলেপ
উপকারী এবং দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হইলে কণ্টকারী সিদ্ধ জলের উত্তপ্ত
বাষ্প লগাইলে উহার উপশম হয় ।

ডাঃ মোরহেড বলেন—ইহার আর যে যে গুণই বলা হউক, ইহার কফ-
নিঃসারক শক্তিই প্রধান ।

• শোথ রোগের “পুনর্গবাদি চূর্ণ,” কাসের “কণ্টকারী ঘৃত” ও “বাস্ত্রী-
হরীভকী”তে, খাসের “শৃঙ্গাাদি চূর্ণে” “শৃঙ্গীগুড় ঘৃতে” ও “ভার্গাশর্করা”র
এবং “বিষ্ণু তৈলে” ও মহা নারায়ণাদি তৈলে” ও মীহার “অভয়া লবণে”
কণ্টকারী আবশ্যক হয় ।

কদম্ব ।

বাল্লালা মাম—কদম্ব ; হিন্দী—কদম্ব ; ইংরাজী—Nauclea Parviflora.
সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কদম্বঃ প্রিয়কো নীপো বৃন্তপুষ্পো হলিপ্রিয়ঃ । সংস্কৃত নাম—

কদম্ব, প্রিয়ক, নীপ, বৃত্তপুষ্প ও হরিপ্রিয়। অপর নাম—ললনাপ্রিয়, হারিদ্র, অশোকারি, কাদম্ব, বটপদেষ্ঠ, জাপ, কাদম্বা, সীধুপুষ্প, জীর্ণপর্ণ, মহাচ্য, কর্ণপুরক।

কদম্বের গাছ খুব বড় বড় হয়, ঠিক সোজা হইয়া গোড়াইয়া থাকে। গাছের মধ্য ও অগ্র হইতে ডাল পালা চতুর্দিকে বিস্তারিত হইয়া থাকে এবং ঐ ডালে বড় বড় পাতা থাকায় নীচে বেশ ছায়া পড়ে। ইহার ফুল ভাঁটার মত গোলাকার ও সর্বাস্থে গোড়া-হলুদ আগা-শাদা সরল এক ইঞ্চি প্রমাণ সূত্র-বৎ বেষ্টিত থাকে। ফল পাকিলে ঐ গুলি ঝরিয়া যায়। ফুলগুলি দেখিতে অতীব মনোরম ও সুখস্পর্শ; তাহাতে অত্যন্ত মুহূর্তসৌরভ আছে। বর্ষাকালে এই ফুল বৃক্ষের মস্তক আকীর্ণ করিয়া এক অপূর্ব শোভা সম্পাদন করে। কথিত আছে, এই বৃক্ষ ভগবান্দ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় ও ইহার তলদেশে তাঁহার কেলি-নিকেতন ছিল।

কদম্বো মধুরঃ শীতঃ কষায়ো লবণো গুরুঃ ।

সর্বো বিষ্টস্তকৃৎ কক্ষঃ কফস্তানিলপ্রদঃ ॥

রস—মধুর অন্ন কষায়; বিপাক—মধুর; বীৰ্য্য—শীত; গুণ—কক্ষ, বিষ্টস্তকারক, কক্ষকর; প্রভাব—স্তম্ভবর্দ্ধক (ইহার ফলের রস সেবনে স্ত্রীলোকের স্তনের দুধ বাড়ে) ও বায়ুবর্দ্ধক।

মতান্তরে কদম্বের গুণ ।

কদম্বঃ কটুকন্তিকো মধুর স্তববঃ পটুঃ ।

স্তম্ভবৃদ্ধিকরঃ শীতো গুরু বিষ্টস্তকারকঃ ॥

কক্ষঃ স্তম্ভপ্রদো গ্রাহী বর্ণকৃৎ ঘোনিদোষহা ।

রক্ত কৃৎ মূত্রকৃচ্ছ্রক বাতপিত্তং কক্ষং ত্রণম্ ।

দাহং বিষং নাশয়তি হৃক্ষুরা শ্চাস্ততুবরাঃ ।

শীতবীৰ্য্যা দীপকাশ লঘুবাহরোচকাপহাঃ ॥

রক্তপিত্তাতিসারঘ্নাঃ ফলং কচ্যং গুরু স্তমম্ ।

উষ্ণবীৰ্য্যং কক্ষকরং তৎ পকং কক্ষপিত্তজিৎ ॥

বাতনাশকরং প্রোক্ত মুষ্ণিতস্তম্ভদর্শিতিঃ ।

কদম্ব—মধুর, তিক্ত, কষায়, কটু ও লবণরস। ইহা গুরুবৃদ্ধিকারক

(ইহার শুষ্ক ফলচূর্ণ দুগ্ধ সহ সেবনে শুক্র গাঢ় হয়), শীতল, গুরুপাক, বিষ্টভ-
কর, রক্ষ, স্তম্ভবর্জক, ধায়ক, বর্ণকর (কদম ফুলের পাপড়ী ঘৃথের সহ
বাটিয়া মুখে রাখিলে মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হয়)। যোনিদোষহারক (ছালের কাথে
যোনি ধোত করিলে তত্রোগ আরোগ্য হয়), রক্তরোগ (রক্তপিত্ত),
মূত্রকৃচ্ছ (কচি পাতার রস মূত্রকৃচ্ছের উপকারী), বাতপিত্ত, কফ, ব্রণ
(প্রলেপে), দাহ ও বির্ষ প্রশমিত্ত করে। ইহার অঙ্কুর—কষায়রস-প্রধান এবং
শীতবীর্ষা, লঘু, অকচি নাশক, রক্তপিত্ত ও অতিসার নিবারক। ফল—কচি-
কর, গুরু, উষ্ণবীর্ষা, কফকর। পাকা ফল—কফপিত্তর এবং বাতনাশক
বলিয়া ঋষিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে।

প্রয়োগ—ঔষধার্থে কদমের ছালের ও পাতার প্রয়োগ হইয়া থাকে।
ফলের রস অনেকাংশে কাঁচা আমলকীর রসের তুল্যগুণ; কিন্তু তদপেক্ষা দ্বিগুণ
গুরুপাক। এই ফলের উত্তম অন্ন রাখিয়া খাওয়া—খায়—বঙ্গের অনেক
অঞ্চলে ইহার এইরূপ ব্যবহার আছে। কচিপাতার রস পরিষ্কার চিনি সহ
সেবন করিলে বিষাক্ত মেহের প্রথমাবস্থায় বিলক্ষণ উপকার পাওয়া যায়।
ছালের কাথ মেহ ও শ্বेतপ্রদরে উপকার দর্শায়। জরে বা অগ্নি উত্তাপ জনক
कारणे माषा धरিলে, কপালে কদম পাতা রাখিয়া রাখিলে উপশম পাওয়া
যায়। কদমের শিকড়ের ছাল ২ তোলা সিদ্ধ করিয়া কাথ সেবন করিলে,
ক্রিমি নষ্ট হয়, শিশুকে অর্ধতোলা কাথ দিবে। কচিপাতার রসে সৈন্ধব
চূর্ণ মিশাইয়া খাইলেও ক্রিমিরোগ আরোগ্য হয়। ডাঃ কানাইলাল রায়
বাহাদুর বলিয়াছেন যে, ইহার ছাল অরসরূপে ব্যবহার করিয়াও বেশ ফল
পাওয়া যায় ও মুখের ঘায়ে ইহার কুলী উপকারী। মেহ রোগে সোমেশ্বর রস
প্রভৃতি ঔষধে কদম মূলের ছাল আবশ্যিক হয়।

কদম্বের ফল হইতে আয়ুর্বেদমতে একপ্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়, তজ্জন্তই
মদ্যের একটা নাম কাদম্বরী।

কদলী।

বঙ্গালা নাম—কলা; হিন্দী—কেলা বা কেরা; ডাক্তারী নাম—Plan-
tain, *Musa sapientum*. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কদলী সুফলা রস্তু মোচা

বার্ণবল্লভ। সুকুমারা চৰ্ম্মধী, স্বকৃপত্রী নগরৌষধি ॥ সংস্কৃত নাম—কদলী, সুফলা, রস্তা, মোচা, বার্নবল্লভা, সুকুমারা, চৰ্ম্মধী, স্বকৃপত্রী, নগরৌষধি। ইহার অন্তনাম—অংশুমৎফলা, কাজীলা, কদল, সক্রৎফলা, শুক্রফলা, হস্তি-বিবাণী, শুক্রদন্তিকা, নিঃসারা, রাজেষ্ঠা, বালকপ্রিয়া, উরুস্তম্ভা, ভানুফলা, বনলক্ষ্মী, মোচক, রোচক, আরতচ্ছদা, তন্তুবিগ্রহা, অম্বুসারা।

কলার গাছ অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন, যেহেতু ইহা বাড়ীর উঠান-ধারে জন্মে, বাগানেও জন্মে—অন্ততঃ পূজাপার্কণেও মঙ্গলিক উপাদান স্বরূপ গৃহ-স্থের বাড়িতে আনীত হইয়া থাকে। ইহা ভারতবর্ষ, বর্ম্মা, আমেরিকা প্রভৃতি মধ্যম-তাপযুক্ত স্থান সমূহে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই গাছ হস্তীর অতি প্রিয় খাদ্য, তাই ইহার সংস্কৃত নাম “বার্নবল্লভা”; চৰ্ম্মের স্থায় বিস্তৃত পাতা বলিয়া ইহার নাম “স্বকৃপত্রী”; সূর্য্যের আলোক ভিন্ন আদৌ জন্মিতে পারে না বলিয়া নাম “অংশুমৎফলা”; ফল দেখিতে অনেকটা হস্তীর দস্তের মত বলিয়া ইহাকে “হস্তিবিবাণী” বলা হয়; একবার মাত্র ফল হইয়াই গাছ মরিয়া যায় বলিয়া নাম “সক্রৎফলা”; গাছের সার নাই তজ্জন্ত নাম “নিঃসারা”; রাজ-গণের অতি প্রিয় বলিয়া নাম “রাজেষ্ঠা”; বালকেরাও ইহাকে অত্যন্ত ভালবাসে বলিয়া “বালকপ্রিয়া”; মাহুষের পা স্থির ও সোজা হইয়া থাকিলে যেমন দেখিতে হয়, তেমনি বলিয়া নাম “উরুস্তম্ভা”; বনে অর্থাৎ বৃক্ষসমূহের মধ্যে কদলী শ্রেণী থাকিলে বড়ই শোভা হয় বলিয়া নাম “বনলক্ষ্মী”; পত্র ষড়্ বড় বলিয়া “আরতচ্ছদা”; ইহার অঙ্গ মধ্যে তন্তু সমূহ থাকে একত্র “তন্তু-বিগ্রহা” বলিয়া অভিহিত হয় এবং গাছের ভিতরে কেবল জলই সর্ব্ব্ব বলিয়া নাম “অম্বুসারা”। ভারতবর্ষই কলার প্রধান দন্মস্থান, তাঁই পার্কত্যাস্থানে ভাল জন্মে না। হিমালয় পাহাড়ের শৈলপুঞ্জোপরি এক প্রকার ছোট ছোট কলা হয়, তাহাতে বীজই অধিক, ঝাঁস খুব কম কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাই পক্ষীরা লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে দিগ্ দিগন্ত হইতে আসিয়া প্রতিবন্দিতাসহ ধাঁইয়া জীবন রক্ষা করে। পূর্ব্ববঙ্গে ও মালা-বার উপকূলে ইহার অধিক আবাদ হয়। চট্টগ্রামের বনপ্রদেশে এত কলাগাছ আছে যে, দেখিলে চমৎকার লাগে, তখাচ হাতী ও গয়াল নামক মহিষজাতীয় প্রাণী উহাই ধাইয়া প্রাণ ধারণ করে। চট্টগ্রামের গ্রামসমূহেও কলাগাছ ঘাস

দূর্বীর মত অপৰ্যাপ্ত । ষাঠ পড়িয়া থাকিলে এত কলাগাছ জন্মে যে, আবাদ-
কালে তাহা মারিবার জন্ত পরিশ্রম করিতে হয় । সিঙ্গাপুর, মালয় ও ভারত-
বর্ষের দ্বীপপুঞ্জে ইহা বহুলপরিমাণে জন্মে । সেখান্দে প্রায় ৮০ প্রকারের কলা
আছে । চীন দেশে একপ্রকার কলাগাছ আছে, তাহার আদৌ ফল হয় না । আর
এক প্রকার আছে দেখিতে ডুমুরের মত । স্পেনদেশের দাক্ষিণাংশে কলা হয়,
অন্যংশে তাপগৃহ (hot bed) ব্যতীত জন্ম না । আফ্রিকাতেও কলা হয় । কিন্তু
বিলাতে ভাল কলা জন্মে না । রেঙ্গুনে প্রত্যেক বাটিতেই কলাগাছ আছে ।

মৌচাফলং স্বাহ শীতং বিষ্টান্ত কফমুদ গুরু ।

সিদ্ধং পিত্তাম তৃড়্ দাই ক্ষত কয় সমীরজিং ॥

পকং স্বাহ হিমং পাকে স্বাহ বৃংঘাঞ্চ বৃহণম্ ।

সুংতৃষ্ণা নেত্রগদহনু মেহঘ্নং কুচি মাংসকৃৎ । ভাঃ প্রকাশ ।

(সিদ্ধ কাঁচা কলার) রস—মধুর ; বিপাক—মধুর ; বীৰ্য্য—শীত ;
গুণ—সংকোচক ও দ্রব্য উদরভার জনক ; কফনাশক, গুরুপাক, সিদ্ধ, রক্তপিত্তহর,
দাহতৃষ্ণানাশক, ক্ষতক্ষয় (ফুস্ফুসে ক্ষত জনিত বস্মা) নাশক ও বায়ু প্রশমক ।

(পাকা কলার) রস—মধুর ; বিপাক—মধুর ; বীৰ্য্য—শীত ;
গুণ—শীতল, গুরু ও রতিশক্তি বর্ধক, দেহের স্থলতাকারক, সুতৃষ্ণানাশক
(সুতৃষ্ণাকালে ভাল পাকা কলা পাইলে আর কিছু আবশ্যক হয় না), নেত্র-
রোগহর (বায়ুজনিত দৃষ্টিক্ষীণতা দূর করে), মেহনাশক (জালাযুক্ত মেহ ও
বহুমূত্র নিবারক), কচিকর ও মাংসবৃদ্ধিকর ।

রাজ বল্লভ মতে ।

কদলং মধুরং বৃষাং কষায়ং নাতিশীতলম্ ।

রক্তপিত্তহরং হৃদ্যাং কুচ্যাং শ্লেষকরং গুরু ॥

কলা—মধুর, ঋষায়, বৃষা, নাতিশীতল, রক্তপিত্তহর, হৃদ্যা, কচিকর, শ্লেষ-
বর্ধক ও গুরুপাক ।

মতান্তরে কদলীর গুণ ।

কদলী শীতলা গুর্বা বৃষা সিদ্ধা মধুঃ শ্বতা ।

পিত্তরক্তবিকারঞ্চ ধোনিদোষং তথাশরীরং ॥

দৌশাধেঃ বীৰ্য্যকৃৎ সদাঃ ন মন্দাধেঃ হিতা হি সা ॥

কদলী—শীতল, গুরুপাক, গুরুবর্ধক, স্নিগ্ধ, মধুর, পিত্তরক্ত ঘটিত বিকার সমূহের প্রশমক, যোনিদেহবহর (শ্বেতপ্রদরাদি) ও অশ্মরী (পাথুরী) নাশক। ইহা দীপ্তায়ি ব্যক্তির স্ফীয়া বীর্ধাকারক, কিন্তু অগ্নিতেজোহীন ব্যক্তির উপকারী হয় না।

কোমলকদলীর গুণ ।

কোমলং কদলং শীতং মধুরং চ কষায়কং ।

রুচ্যং অন্নং সমুদ্ধিষ্টং বাতপিত্তহরঞ্চ তৎ ॥

কলা অত্যন্ত পকাবস্থার কোমল হইলে মধুর, অন্ন, অত্যন্ত কষায় এবং অধিক রুচিকর ও বাতপিত্ত নাশক হয় ।

মধ্যমকদলীর গুণ ।

তুড়ু রক্তপিত্তদিগদ প্রমেহান্ ফলং কদল্যা স্তরুণং নিহন্তি ।

সংগ্রাহিকং তিক্তকষায় রুক্ষং রক্তাতিসারং শমন্যেং চ ভারং ॥

মধ্যম-পক (ডাঁসা) কলা—রক্তপিত্ত ও মেহ (শ্রাবশীল মেহ) নাশ করে, ইহা সংকোচক, তিক্ত কষায় ও রুক্ষ, অধিক ভার ও রক্তাতিসার প্রশমক (ঘোলের সঙ্গে চট্কাইয়া দিলে) ।

কদলীপুষ্পের গুণ ।

কদল্যাঃ কুস্থমং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু ।

বাতপিত্তহরং শীতং রক্তপিত্তক্ষয় প্রণুং ॥

কলার ফুল—স্নিগ্ধ, মধুর, কষায়, স্বেদ ও গুরুপাক, বাতপিত্তহর, শীতল, রক্তপিত্ত ও ক্ষয় নাশক ।

মোচার গুণ ।

কদলী-মোচকং হৃদ্যং কফপ্লং ত্রিমিনাশনং ।

তৃষ্ণা প্লীহ জ্বরং হস্তি দীপনং বস্তিশোধনম্ ॥ রাজবল্লভ ।

কলার মোচা—হৃদ্য, কফর, ত্রিমিনাশক, তৃষ্ণানিবারক, প্লীহা ও জ্বররোগীর উপকারী, দীপন ও বস্তি শোধক (যুবকজ, কষ্টরজঃ প্রভৃতি নাশক) ।

কদলীকন্দের গুণ ।

বল্যঃ কদল্যাঃ কন্দঃ স্নায়ুঃ কফপিত্তহরো গুরুঃ

বাতলো রক্তশমনঃ কষায়ো রক্ষশীতলঃ ।

কর্ণশূলঃ রজোদোষঃ ক্রোমরোগং নিঘচ্ছতি ॥

কলার কন্দ অর্থাৎ যে ডাঁটার, চারিদিকে কলা বেটেন করিয়া থাকে, তাহা (কচি অবস্থায়) বলকর, কফপিত্তনাশক, গুরুপাক, ঈষৎ বায়ুবদ্ধক, রক্তরোধক, কষায়, রক্ষ, শীতল, কর্ণশূল, রজোদোষ বিশেষতঃ বহুমূত্র প্রশমিত করে ।

কদলীর ভেদ ।

মাণিক্য মর্ত্য্য * হৃদয় চম্পকাদ্যা ভেদাঃ কদল্যা বহুবোহপি সন্তি ।

* উক্তা গুণা স্তৈষধিকা ভবন্তি নির্দোষতা স্নায়ু লঘুতা চ তেষাম্ ॥

মাণিক্য, মর্ত্য্যমান, অমৃত প্রভৃতি কদলীর বহুপ্রকার ভেদ আছে, কিন্তু তাহাদের সকলেরই মধ্যে উক্তগুণ সমুদায় বহুলপরিমাণে বর্তমান এবং তাহারা নির্দোষ ও লঘুপাক । দেশ বিদেশে সৰ্বগুণ কতপ্রকার কলা আছে তাহার বিশেষ রূপে নির্দেশ করা কঠিন ; তবে মোটা মুটি বতগুলি প্রধানতঃ জানা যায়, তাহার নাম ও বর্ণনা যেওয়া হইল :—

• মাণিক্য—এক প্রকার অতি উজ্জলবর্ণ সূক্ষ্ম কলা, বোথায় জন্মে ।

মর্ত্য্যমান—সূত্রী, পীতভ, স্নুগোল, গায়ে ফোটা ফোটা হয়, অতীব সুস্বাদু, বাঙ্গালীরা এই কলাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে, হৃদয় বড়ই উপাদেয় হয় । ইহাকে চাটমকলাও বলে ।

অমৃত—অতীব মিষ্ট, বোথায় উৎপন্ন হয় ।

চম্পক (টাঁপা)—ঘোর পীতবর্ণ, খুব পাকিলে ঈষৎ অন্ন, দেখিতে ছোট, বেশ সুগন্ধি ।

* এই শ্লোকে “মাণিক্য মর্ত্য্যমান” স্থানে কেহ কেহ “মাণিক্যমুক্তামৃত” পাঠ করিয়া বলেন—মর্ত্য্য অর্থাৎ মর্ত্য্যমান কলা আমাদের দেশের নয়, উহা মার্টাবান হইতে আসিয়াছিল । এ কথা আমাদের সম্ভবত বোধ হয় না, যেহেতু মুক্তা নামে কোনও কলা দৃষ্ট হয় না, মর্ত্য্যমান শব্দও বহুকাল হইতে শাস্ত্রে রহিয়াছে ।

ঢাকাই মর্ত্যমান—দেখিতে প্রায় সবুজ, তত সুশ্রী নয়, কিন্তু খাইতে ভাল ।

কালিবৌ বা কাবুলী কলা—কল অত্যন্ত খাট ও মোটা, গাছও খুব মোটা অথচ ঝাঁকুতি, কাঁদি নামিলে মাটা খুঁটেরা দিতে হয় । এই কলা গরম হুখে ফেলিলে গলিয়া যায়, খাইতে মিষ্ট ।

কাঁঠালী—পাকিলে জ্বৎ পীত হয়, মর্ত্যমান অপেক্ষা কম বাছ, চটকাইলে আঠা আঠা হয় । ইহা পূজাপার্বণে অধিক ব্যবহৃত হয় । ইহাকে পূর্ববঙ্গে কদমা বলে ।

লতা কাঁঠালী—ইহাও এক প্রকার কাঁঠালী ; পূর্বোক্ত কাঁঠালী অপেক্ষা অধিক সুবাহ ।

মালভোগ—সুশ্রিষ্ট ও সু-তার, মর্ত্যমানেরই প্রকার-ভেদ ।

চিনি চাঁপা—এক প্রকার চাঁপা কলা, পূর্বোক্ত চাঁপা অপেক্ষা অধিক মধুর ও সু-তার ।

ঠোটে কলা—ছোট ছোট কলা, ঘোর সবুজ বর্ণ, পাকিলে অধিক সুশ্রিষ্ট হয় না, কাঁচা অবস্থায় অত্যন্ত কষায়, তজ্জন্ম উদরাময় রোগীর সুপথ্য ।

কাঁচ কলা—ইহা কেবল কাঁচা অবস্থায় ভুক্ত হয়, অতি উৎকৃষ্ট ও একটা প্রধান ভরকারী ।

ডোগ্রে কলা—কলিকাতার নিকটে জন্মে, পাকিলে এত বীজ হয় যে খাওয়া যায় না । কিন্তু ইহার মোচা সুবাহ, মোচার জন্মই চাখ করা হয় ।

সোনা কলা—দেখিতে ঠিক কাঁচা সোণার রং, মর্ত্যমানের জাতীয়, বোধায় জন্মে ।

বীচাকলা—প্রথমে কাঁচকলার মত দেখিতে, পাকিলে লালের আভা-যুক্ত হলুদ রং হয়, বীচিতে পরিপূর্ণ, বীচি বাছিয়া খাইলে শাঁস অতীব সুশ্রিষ্ট, পাড়াগাঁয়ে স্ত্রীলোকেরা ইহা বড় ভালবাসে ।

অগ্নীশ্বর—লাল রং, ওজনে প্রায় ৩ ছটাক, গরম ভাতে ডুবাইলে স্বস্তের মত গলিয়া যায়, ইহা অত্যন্ত সুবাহ ।

ঘিঞ—ইহাও অগ্নীশ্বরের তুল্য গুণ ও তুল্য-বাদ, কিন্তু কৃপেকাকৃত একটু ছোট ।

অণুপাম—মর্ত্যমান কলার জাতীয়, খাইতে বেশ সুস্বাদু।
বত্রিশছড়ী—বাঁকুড়া জেলায় জন্মে, এক কাঁদিতে ঠিক বত্রিশ ছড়া কলা জন্মে, চাঁপা কলার জাতীয়।

শিঙ্গাপুরী—শিঙ্গাপুর হইতে আসে, বড় বড় কলা হয়, পাকিলেও দেখিতে সবুজ, কিন্তু ভিতরে মোলায়েম ও সুস্বাদু।

কানাই বাঁশী—প্রায় এক হাত লম্বা হয় কিন্তু সরু, বেশ হরিদ্রাবর্ণ, খাইতেও ভাল।

মদনা—কাঁঠালী কলারই জাতীয়, অপেক্ষাকৃত একটু বড়।

তুলসী কলা—ছোট ছোট কলা হয়, বেশ সুস্বাদু ও সুগন্ধি, পশ্চিম দেশে পাওয়া যায়।

দয়ে কলা—যশোহর জেলায় জন্মে, ইহা এক প্রকার বীচা কলা, কিন্তু শস্য টুকু অতীব মিষ্ট নরম ও সু-তার, চিনি সহি জলে গুলিলে অতি উত্তম সরবৎ প্রস্তুত হয়।

সয়া কলা—ইহাও এক প্রকার বীচা কলা, কাঁচা ফলের রস নানারূপ চক্ষুরোগে উপকারী।

সিঁড়ুরে কলা—দেখিতে ঘোর লালবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, ফল বড়, খাইতে ভাল, ইহাকে চীনা কলাও বলে।

বেসিনে কলা—এই কলা বেসিনদেশে জন্মে, স্বাদ অপেক্ষা ইহার গন্ধ অতি মনোহর ; পুষ্প ফেলিয়াও ইহার ঘ্রাণ লইতে ইচ্ছা হয়।

রসথলী—মাদ্রাজে জন্মে, বড়ই সু-রসাল, দেখিতে প্রায় চাঁপার স্থায়।

যবদ্বীপে কলা—যবদ্বীপে এক প্রকার আশ্চর্য কলা জন্মে ; এক গাছে একটা মাত্র ফল হয়, অর্থাৎ সমগ্র মোটাটা যেন জমাট বাঁধিয়া একটা ফলে পরিণত হয়। বাহিরে কলা প্রায় দৃষ্ট হয় না, কাণ্ডের ভিতরেই পুষ্ট ও পকু হইতে থাকে ; সম্পূর্ণ পাকিলে, গাছ ফাটিয়া বাহির হয়। ইহা এত বড় যে, একটা কলার ৪ জনের পূর্ণ আহার হয়। তথায় আর এক প্রকার কলাগাছ আছে, তাহার পাতার উঁটাদিকে খোঁচা দিলে মোমের মত পদার্থ বাহির হয়, তাহাতে বাতি প্রস্তুত হয়।

ফিলিপাইনে কলা—ফিলিপাইন দ্বীপে তদপেক্ষাও ১টা বড় কলা একগাছে উৎপন্ন হয়, ইহা এত ভারি যে, ঠিক ৪ জনের বোঝা।

বেঙুণে কলা—ইহা পশ্চিম ভারতীয় বীণে উৎপন্ন হয়, দেখিতে ছোট, খাইতে খুব সুস্বাদু। তত্ত্বসমূহ বড় লোকেরা ইহা অভ্যস্ত ভাগবাসে।

ওরঙ্কো—আমেরিকায় “ফ্লোরিডা” দেশে ওরঙ্কো নামে এক প্রকার কলা হয়, ইহা গাছে থাকিলে ইহার পিঙ্গলক এতই চতুর্দিকে বিস্তৃত হয় যে, শুধু মানুষ কেন পশুপক্ষীরাও তদ্বারা উন্মত্ত হইয়া ছুটিতে থাকে।

প্রয়োগ—কলা কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়?—এ প্রশ্ন করিলেই সর্বাগ্রে স্বভাবতঃই মনে উঠে যে, ইহাকে দিব্য ঘনদুগ্ধের সহিত চট্কাইয়া উদরসাৎ করিতে হয়। বস্তুতঃ ইহা অপেক্ষা পক রস্ভার সদ্ব্যবহার আর কিছু করনার আসে না। প্রাণিজন্যে যেমন গরু, উত্তিজ্জগতে তেমনি কলাগাছ—উভয়েই মৃৎ-প্রকৃতি, মনুষ্যের চিরসেবক। গরুর যেমন সর্ব অবয়বই মনুষ্যের ব্যবহারে আসে, কলাগাছেরও তেমনি! তাই বৃক্ষি কলা ও দৃখে এমন সুন্দর মিলন! কলার খোড়, মোচা, গেঁড়, পাতা, খোলা, ডাঁটা, ফল, ফুল, ভিতরকার জল সবই উপকারী, কিছুই ফেলিবার নয়। ইহার খোড় অতি উত্তম তরকারী, খাম্বি নিরামিষ উভয়রূপেই বেশ মজে। খোড় জর, হাঁপানি মূত্রকৃচ্ছ ও বাতপিত্ত ষটিত সমস্ত রোগে উপকারী। মোচার ঘণ্ট অসীব মধুর খাম্বা, অথচ বড়ই নির্দোষ, সর্করোগেরই সুপথ্য। কলার গেঁড়ের (শিকড়ের) রস বহুমূত্র রোগে উপকারী, ইহা পরিষ্কার চিনির সহিত সেবন করিলে হিকা আরোগ্য হয়। ইহার তরকারী করিয়াও খাওয়া যায়।

জগদীশ্বর দরিদ্রের আহারের জন্য সোনা-রূপার খালা কলার গাছে রাখিয়া-ছেন,—বলা বাহুল্য যে, উহা তাহার পাতা। অধিকন্ত, হিন্দুশাস্ত্র মতে উহা ধাতব পাত্ৰাপেক্ষা অধিক পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, হবিষ্যান্ন-ভোজন বা বাগযজ্ঞ পূজাদির উপাদান সংস্থাপন, কলার পাত্রেই হইয়া থাকে।

খা, কোড়া, ফোকা প্রভৃতি বাধিতে হইলে কলার মাজ (কচিপাতা) আবশ্যক হয়। আজকাল অনেক হাঁসপাতালে ইহার ব্যবহার হইতেছে। আয়ুর্বেদ মতে পঞ্চাঙ্গী নামক ঔষধ প্রস্তুত কালে কচি কলাপাতা দ্বারা গোবরের শিল নোড়া আবৃত করিতে হয়।

বাহার্য পরের হকার তামাক খান না, তাঁহাদের অপরের বাড়া গিয়া উক্ত নেশার অভ্যাস রাখিতে হইলে, কলার গাছকে স্মরণ করিতে হয়।

সর্বোপরি একটা বড়ই আশ্চর্য্য কথা।—কলার পীতায় অতি সুন্দর কাগজ প্রস্তুত হয়। ১৮৬৪ সালে ডাকার ক্রেইহাওয়ারী একপ্রকার চমৎকার চিঠির কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৫১ সালে ডাঃ হার্টার মাস্ত্রাজ মহাপ্রদর্শনী হইতে কলার পাতে যে কাগজ প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহা ঠিক একপ্রকার পার্চমেন্টের তুল্য, আর এফ প্রকার ঠিক যেন রূপায় পাতের মত। খোলা ডাঁটা প্রভৃতি পোড়াইয়া যে ক্ষার প্রস্তুত হয়, তাহার দ্বারা বেশ কাপড় কাচা হয়, পাড়ারগারে দরিদ্র গৃহস্থেরা এবং ধোপারাও ইহা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। শুনা যায় আজকালকার চলিত লবণ আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইবার পূর্বে প্রাচীন কালে কোন কোন দেশে কলার ছাই ভাটিতে চোয়াইয়া এক প্রকার তীক্ষ্ণ ক্ষার বাহির করিয়া অন্ন বাজনা দিতে ব্যবহার করা হইত। এই ক্ষার স্নীহা যন্ত্রণ ও অল্পপিতে উপকারী। আর এক আশ্চর্য্য কথা—খোলা ও ডাঁটা হইতে যে উত্তম সূতা প্রস্তুত হয় তাহাতে দড়ী কাছি ও কাগজ হয় এবং ঐ সূতায় সুন্দর কাপড় হয়। ঢাকার কলার সূতায় এক প্রকার বহু কারুকার্য্য বিশিষ্ট সুন্দর কাপড় তৈয়ার হয়। ১৮৮৪ সালে কলিকাতা মহাপ্রদর্শনীতে ঢাকার শিল্পী কলার সূতায় যে এক অপূর্ব রূপাল দিয়াছিল তাহা আজ পর্য্যন্তও আছে, উহার মূল্য ৫০ টাকা। পৌষ সংক্রান্তির দিনে গৃহস্থ মহিলারা স্বামি পুত্রের হিতকামনার কলাখোলায় নৌকা জলে ভাসাইয়া থাকেন।

কলা কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায়ই আমাদের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। বিশেষতঃ কাঁচকলা বিশেষ পুষ্টিকর, ইহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে লৌহের গুণ আছে। যে মস্তিষ্ক ও মেধার বলে ভারতের আর্গ্যমনৌবিগণ অপূর্ব তথ্য-সমুদায় আবিষ্কার বা অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থনিচয় বিরচিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভূয়িষ্ঠরূপে এই কাঁচকলা দ্বারা ইহা হইয়াছিল—শাস্ত্রসেবী সাত্ত্বিক পণ্ডিতকুলের কাঁচকলা যে আহাৰ্য্যানের চির-সহচর, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। ব্রহ্মচর্য্য, বিয়ম-বৈরাগ্য, শাস্ত্র-সেবা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ইঞ্জির সং-যমাদি বাহ্য কিছু মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য বা কাম্যরত্ন, কাঁচ-কলা দ্বত সৈন্ধব ও আতপান এই চারিটাই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইবার সাধনীভূত। শুনা যায় বিলাতে কোনও ইংরাজ সর্বদা গীতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন কিন্তু

কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। এইরূপে কিছুকাল ব্যর্থ যাওয়ার পর, কোনও বিলাতগত বাঙ্গালী সাধুর সহিত তাঁহার দেখা হয় ও হিন্দুশাস্ত্র বুঝিবার অসামর্থ্য বিষয়ে তাঁহার কাছে পরিতাপ করেন। তখন ঐ সাধু বলিলেন, সাহেব! যদি ধর্মশাস্ত্র বুঝিবে, তবে প্যাণ্টেলুন ছাড়িয়া এই গৈরিক বসনটা পর, আর মাংসাদি ত্যাগ পূর্বক কাঁচকলা-আতপতলুলাদি ভক্ষণ করিতে থাক ও শাস্ত্র পাঠ কর। এইরূপ করিতে করিতে সাহেবের শাস্ত্রে প্রবেশিনী প্রতিভা আপনা হইতেই ক্রমে উপনীত হইল।

পাকা কলার খণ্ড অনায়াসে গেলা যায় বলিয়া, লোকে অরুচিকর তিলক বা স্ফণাজনক ঔষধ সমস্ত কলার ভিত্তয়ে পুরিয়া খাওয়াইয়া থাকে।

আমাদের দেশে পূজার নৈবেদ্যে পাকা কলা দেওয়া অপরিহার্য্য,—এ ফল দেবতারও স্পৃহণীয়! কলাগাছ গণেশ ঠাকুরের স্ত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বোম্বায়ে পতিব্রত কামিনীরা কলাগাছকে ধন ও আয়ুঃপ্রদ বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। ওখার মাঠে প্রচণ্ড রোজ নিবারণ করিয়া অল্প গাছকে রক্ষা করিবার জন্তুও মধ্যে মধ্যে কলাগাছ রোপণ করা হয়। বর্ষাকালে বৃষ্টির নিম্নস্থান সমূহ জলপ্লাবিত হইলে, লোকে কলাগাছের ভেলা ভাসাইয়া আত্মরক্ষা বা গতিবিধি করিয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার পাকা কলা হইতে একরূপ সুখ-সেব্য মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেখানে কলা গুলিয়া রৌদ্রে দিয়া নানা আকৃতি-বিশিষ্ট পাটালিও প্রস্তুত করে। মেক্সিকো দেশে, ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে পাকা কলা শুকাইয়া পালো (শুঁড়া) করিয়া রাখে। বস্তুতঃ পাকা কলা শুকাইয়া বৃদ্ধিপূর্বক দ্রব্যান্তরের সহিত মিশ্রণদ্বারা সুমিষ্ট “খাবার” প্রস্তুত করিয়া বাঙ্গালীরা যদি বিলাতে পাঠাইতে পারেন, তবে বোধ হয় উহা একটা উৎকৃষ্ট লাভের ব্যবসায় দাঁড়ায়। আমাদের দেশে হুনি ফুড্, মেলিন্স্ ফুড্ প্রভৃতি কত অকিঞ্চিৎকর খাদ্য বিলাত হইতে আনিয়া বিক্রীত হইতেছে, আর আমাদের দেশের লোক এমন সুবিধার দিকে লেশ-মাত্র দৃষ্টি না করিয়া কেবল পরীক্ষায় পাখ ও উমেদারী করিতেই চিরপ্রয়াসী। ইংরাজেরা পাকা কলাকে এত ভালবাসে বলিবার নয়। ঘরে বসিয়া শুধু কলার চাষ করিয়াও অনায়াসে তাহাদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা যায়, তজ্জন্মই এই উক্তি—“তিন শ ষাট ঝাড় কলা করে, থাকগে চাষা ঘরে শুয়ে।”

কলার খোলার ভিত্তরকার জল বড় শৈত্যকর, ইহা মস্তকে মাথিলে উন্মাদ রোগীর মস্তিষ্কও ঠাণ্ডা হয়। শাস্ত্রোক্ত প্রসিক্‌ হিমসাগর তৈলে এই জল বা কদলীমূলের রস আবশ্যক হয়।

কলার মোচার ফুল বা অশ্বাস্তরস্থ ক্ষুদ্র কদলীর রস বহুমূত্ররোগে বিশেষ উপকারী। কবিরাজগণ সচরাচর ইহার রস উক্ত রোগের বটিকা সমূহের অমুপানার্থ ব্যবস্থা করেন। সুপক্ক কলা ও পুরাতন তেতুলের শাঁস জলসহ খাইলে বায়ুপিত্ত জন্ম আশ্বশয় রোগ ভাল হয়। দধি, চিনি, সুপরিপক্ক কলা ও পুদিনার রস পিষিয়া খাইলে আমাশয় ও গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয়। বহুমূত্রের শাস্ত্রোক্ত মুষ্টিযোগ যথা—(১) কদলীনাং ফলং পকং ধাত্রীফলরসং মধু। শর্করা পয়সা পীত মপাং ধারণমুক্তমম্। অর্থাৎ পাকা কলা ১টা, আমলকীর রস ১ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা ও ছন্ধ এক পোয়া এই সমুদায় অতি উৎকৃষ্ট মূত্রধারক হইয়া থাকে। (২) কদলীনাং ফলং পকং বিদারীঞ্চ শতাবরীং। ক্ষীরেণ পায়য়েৎ প্রাত রপাং ধারণ মুক্তমম্। • পক্ক কদলীফল, ভূমিকুয়াগুচূর্ণ ও শতমূলীর রস সমভাগে ছন্ধসহ সেবনে অতিরিক্ত মূত্রশাব নিবারিত হয়। (৩) ভালকন্দঞ্চ তরুণং খজ্জুরং কদলীফলম্। পয়সা পায়য়েৎ প্রাত মূত্রাতিসার নাশনম্ ॥ কচি তালের কঁদের (কন্দের) রস, খেজুর মূলের রস ও পাকা কলা ছন্ধসহ খাইলে মূত্রাতিশাব নিবারিত হয়।

কলা অতিভোজন জন্ম রোগে হাকিমেরা মধু আদা ও গঁদের জল খাইতে দিয়া থাকেন। পাকা কলা ও নেবুর রস চটকাইয়া খাইলে কতকটা ~~অত্র~~ রসের মত লাগে ; উহা অল্পে কচিকারক এবং ষাহাদের আমাশয়ের ধাতু ও সর্বদা পেট গরম হয় তাঁহাদের বড় উপকারী। অতিরিক্ত কলা খাওয়া জন্ম অজীর্ণে আয়ুর্বেদে সৈন্ধব লবণ জলে গুলিয়া খাইবার ব্যবস্থা আছে।

বহুমূত্রের কদলীকন্দযুতে ও হেমনাথ প্রভৃতি ঔষধে কলার মোচার প্রয়োজন হয়। কাস, শোণ, গলগণ্ড, কোষবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগীর পক্ষে কলা কুপথ্য।

ভাষানুবাদ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মনে করিবেন না যে, আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতি, হইয়াছে। দেখাইতে গেলে শ্রবন্ধটির কলেবর বৃদ্ধি হয় তাই বিরত হইলাম। এক কথায় বিজ্ঞান এখনও আমাদের শাস্ত্রান্তর্গত বহুতর বিষয়ের ছাঁচরাশ্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে যে ছ'একটি তত্ত্ব, বিজ্ঞানের সাহায্যে বহির্গর্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহা যে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের অবিদিত ছিল ইহা নহে। আর্য ঋষিগণ তত্ত্ব বিষয়ের কর্তব্যাতামাত্র প্রকটিত করিতে উদ্যত হইয়া উপকারিতাকে গৌণভাবে রাখিয়া গিয়াছেন। উদ্দেশ্য, পাপাসকামধর্মের প্রাবল্য দূরীভূত করিয়া, নিষ্কাম ধর্মেরই জয়পতাকা উড্ডীন করা। তবে সম্প্রতি যুগ মাহাত্ম্যে পাপসকামধর্মের অন্ত্র আধিপত্যে অধঃপাতের পথ পরিকৃত হইবে বলিয়া, গৌণ পক্ষই মুখ্য ও মুখ্যপক্ষ গৌণ এবং অনাদরণীয় হইতে বসিয়াছে। তাহা না হইলে ইদানীন্তন একজন মাত্র বৈজ্ঞানিক আমেরিকান সাহেবের নিকট গঙ্গাজলের লঘুতা ও পাচকতা ইত্যাদি উপকারের কথা একবার মাত্র শুনিয়া আমাদের নব্য সমাজ স্তাহার পক্ষপাতে বদ্ধপরিকর হইলেন কেন? আর আবহমানকাল ত্রিকালজ্ঞ আর্গ্যঋষি-মণ্ডলী যে, এই পবিত্র গঙ্গাজলের পবিত্রস্পর্শে ইহকাল ও পরকাল পবিত্র করিতে ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতেই বা সমাজ সন্ধিহান ছিলেন কেন? কল একই হইল, কেবল গঙ্গাজলের মুখ্য পবিত্রতা দূরে গিয়া গৌণ উপকারিতাই এক্ষেত্রে জয়শ্রী লাভ করিল। তাই বলিতেছিলাম, বিজ্ঞান আশাতঃ মধুর গৌণপক্ষকে তন্ন তন্ন ভাবে দেখাইয়া পাপসকামধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছে। নিষ্কাম ধর্মের একান্ত পক্ষপাতী সেই প্রত্ন ঋষিগণ অনায়াসে সমস্ত অবগত হইয়া থাকিলেও এ পক্ষকে গৌণ রাখিয়া, মুখ্যপক্ষ নিত্য-কর্তব্যতাকেই বিশেষরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। অতএব বুদ্ধিবাদ দোষে ভাষানুবাদের উপকারাভাসেই অনেকেই মুগ্ধ হইতেছেন। ফলতঃ তাহাতে অসুপকারই হইতেছে। আরও

দেখুন, অনেকেরই ধারণা পূর্বে না কি যাহারা কিছু জানিতেন তাহা প্রকাশ না করিয়া অনেককে উৎকণ্ঠিত করিতেন। 'ভাষানুবাদের' প্রভাবে আজ তাহা নাই। ইহা সত্য হইলেও পূর্বেও মন্দ 'ছিল না।' তদ্বারা শাস্ত্রের মর্যাদা ছিল, এবং যথাপাশ্চাত্যই তাহা অর্পিত হইত। সম্প্রতি আত্রঙ্গচণ্ডাল সকলেই বেদে অধিকারী, সকলেই বেদতত্ত্ববিদ। পারিভ্রাত মঞ্জরীতে আজ একা ইন্দ্রাণীর অধিকার নাই, শুনী, শুকরী, বানরী, সকলেরই অধিকৃত হইয়া পদদলিত হইতেছে। বৈজয়ন্তী আজ ভগবানের কর্ণচ্যুত হইয়া বানরের হস্তে খণ্ড খণ্ড হইতেছে। ইহাই যদি সদস্যের সদস্যহার, তাহা হইলে স্বীকার করিলাম ভাষানুবাদ আমাদের প্রভূত উপকারী। হায়! বলিতেও হুঃখ হয়, বেদের নাম হইয়াছে আজ 'চাবার গান'। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে ক্রুহু, অর্জুন উঠিয়া গিয়া আধ্যাত্মিক বাখ্যায় জীব ও ব্রহ্ম আর ধৃতরাষ্ট্র ও মঞ্জয় উঠিয়া গিয়া মন ও বুদ্ধি হইলেন। দুর্যোধন-প্রভৃতি হইলেন আশা। এইরূপ অভিধান ছাড়া অতৃত পূর্বে অচিন্তনীয় অর্থের অবতারণা করিয়া ভাষানুবাদ যদি আমাদের উপকার করিয়া থাকে এবং তাহা হইলে বলিবার কিছুই নাই। তাহা না হইলে ভাষানুবাদ যে, প্রকারান্তরে ভয়ঙ্কর অনিষ্টের সূত্রপাত করিতেছে ইহা কে না বলিবে ?

অনেকের বিশ্বাস, পূর্বে যাহা আমাদের একটা বিশ্বস্তির ভয় ছিল ভাষানুবাদের দ্বারা আজ তাহা নাই। বিশ্বস্তির ভয় নাই সত্য; পরন্তু ভাষানুবাদে নিশ্চিত হইয়া মানসিক উন্নতির অনন্ত নিদান সেই গবেষণাই আমাদের উঠিয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে আর বে কোনও বিষয় চিন্তা পথে আসিয়া প্রতিভার বিকাশ সাধন করিবে ইহার আশা নাই। বোধ হয় কিছু দিন পরে প্রত্যেক কথাতেই পুস্তক খুলিতে হইবে। পূর্বে কোনও এক বিষয়ের চিন্তা করিতে বসিলে তদানুযায়িক কত বিষয়ই জানিতে সক্ষম হওয়া যাইত, সম্প্রতি ভাষানুবাদে নিশ্চিত হইয়া আমাদের যৌশক্তি এতই সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে যে, নিগূঢ় বিষয় ভাবা দূরের কথা, সামান্ত্র একটা বিধি ব্যবস্থা দিতে হইলে বা সংসামান্ত্র একটা শব্দার্থ জানিতে হইলে পুস্তকের পাতা না উন্টাইয়া আর রক্ষা নাই। পূর্বে পাণ্ডিত্য ছিল অন্তরে, সম্প্রতি পাণ্ডিত্যের নিবাস-ভূমি পুস্তক। যখন পরহস্তগত ধন ধনই নয়, পুস্তকহা বিদ্যা বিদ্যাই নয়,

কিবা সুখ, কিবা দুঃখ, সকল সময়
মহতের একভাব, জানিও নিশ্চয় ॥ ২ ॥

অঞ্জলিস্থানি পুষ্পাণি বাসয়ন্তি করদয়ম্ ।
অহো স্তমনসাং বৃত্তিবামদক্ষিণয়োঃ সমা ॥ ৩ ॥

অঞ্জলি ভিতরে পশি থাকে যদি পুষ্পরাশি,
সুবাসিত হয় করদয় ।
বাম দক্ষিণের প্রতি স্তমনার এক রীতি,
কভু তার অগ্রথা না হয় ॥ ৩ ॥

সজ্জনস্ত হৃদয়ং নবনীতং যদ্বদন্তি কবয় স্তদলীকম ।
অন্তদেহনবলসমুদ্ভূতাপাং সজ্জনো দ্রবতি নো নবনীতম্ ॥ ৪ ॥

কিবা নবনীত, কিবা সাধুর হৃদয়,
হুই তুল্য, —কেহ করে নাহি করে জয় ।
যে কবি এ কথা বলে, মিথ্যা কথা তার,
তাহার কথায় আর শ্রদ্ধা রয় কার ?
পরচিত্তে অল্প মাত্র তাপ যেই হয়,
অমনি গলিয়া যায় সাধুর হৃদয় ।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ, নবনীত হায় !
সে তাপে হইয়া তপ্ত গলিতে না চায় ॥ ৪ ॥

অহো মহৎ মহতামপূর্ব্বং বিপত্রিকালেহপি পরোপকারঃ ।
যথাস্তমধ্যে পতিতোহপি রাহোঃ কলানিধিঃ পুণ্যচয়ং দদাতি ॥ ৫ ॥

কি আশ্চর্য্য মহতের মহিমা অপার,
নিজ বিপদেও করে পর-উপকার ।
চন্দ্র পড়িয়াও রাহ-মুখের ভিতরে
মরিতে বসেছে, তবু পুণ্য দেয় নরে ॥ ৫ ॥

পদ্মাকরং দিনকরো বিকচীকরোতি চন্দ্রো বিকাশয়তি কৈরবচক্রেজ্জালম্ ।

নাত্যর্থিতোহপি জলদঃ সলিলং দদাতি সন্তঃ স্বয়ং পরহিতেষু কৃত্যভিধোপাঃ ॥ ৬ ॥

নলিনীর হৃৎ দেখি দেব দিবাকর,
 দরশন দিয়া তার জুড়ান অন্তর ।
 কুমুদিনী বড় কষ্ট পাইতেছে মনে,
 ইহা ভাবিয়াই চন্দ্র উঠেন গগনে ।
 জলদ আপনি জল ঢালে মুক্তিকায়,
 কে কোথা তাঁদের কাছে গিয়া ভিক্ষা চায় ?
 মাহাত্মা পরের হৃৎ আপনি ভাবিয়া,
 মনে সুখ পান তাহা মোচন করিয়া । ৬ ।

ধবলয়তি সমগ্রং চন্দ্রমা জীবলোকং কিমিতি নিজকলঙ্কং নান্নসংস্থং প্রমাণি ।
 ভবতি বিদিতমেতৎ প্রায়শঃ সজ্জনানাং পরহিতনিরতানামাদরো নান্নকার্যো ॥৭॥

চন্দ্রদেব নিজরক্ষি করিয়া বিস্তার
 নিষ্কলঙ্ক করি দেয় জগৎ সংসার ।
 নিজের শরীরে কিন্তু কলঙ্ক যা রয়,
 চেষ্টা নাহি তাঁর তাহা করিবারে লয় ।
 পরহিতে রত রন্থ ধারা সর্বক্ষণ,
 নিজকার্য্যে কভু তাঁরা নাহি দেন মন । ৪ ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ।

তত্ত্বমঞ্জরী—ধর্ম, নীতি ও সমাজ সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা । রামকৃষ্ণ
 চরণাশ্রিত সেবকমণ্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত ও কাঁকড়গাছী যোগেদ্যান ইহাতে
 তাঁহাদিগের দ্বারাই প্রকাশিত ; বার্ষিকসোহাঘ্য এক টাকা মাত্র । পরম-
 হংস রামকৃষ্ণদেবের স্থললিত উপদেশাবলী ইহাতে রীতিমত প্রকাশিত হই-
 তেছে । অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও বেশ শিক্ষাপ্রদ । এক্ষণ মাসিক পত্রিকার
 প্রচার সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় ।

শিরসিজ তৈল ।

বহুদিবস হইতে কেশতত্ত্ব পর্যালোচনা করিয়া এই মহোপকারক তৈল প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা কেশ সঞ্চয়, বাবতীয় পীড়ার শাস্তি কারক। যে যে গুণ থাকিলে কেশের উৎকর্ষসাধন হয়, তৎসমস্তই ইহাতে উপযুক্ত রূপে বর্তমান আছে। মূল্য ৪ ঔন্স শিশি ১৥০ মাণ্ডলাদি ৥০ ডব্বন ১৫।

দম্পতী-বিলাস তৈল ।

এই মনোহর সুগন্ধ গুণকারক তৈল ব্যবহার করিলে মস্তকের মরা মাস প্রভৃতি ময়লা বিনাশ করিয়া কেশ সকলকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও উজ্জ্বল করে। ইহা দ্বারা মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, সর্সদা মন ছুঁ করা ইত্যাদি আরোগ্য হয় এবং মস্তিষ্ক সুশীতল হয়। ইহার গন্ধ অতিশয় মনোরম এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী, ব্যবহার করিয়া স্নান করিলেও সদাশুদ্ধ বিলুপ্ত হয় না এবং সামান্য ক্ষণ মর্দন করিলে ক্রমশঃ মনোরঞ্জন সুবাসিত গন্ধ বহির্গত হইতে থাকে। এই পরম সুগন্ধ তৈল শ্রী পুরুষ সকলেরই চিত্তের নিরতিশয় প্রফুল্লতা সাধক। মূল্য ৮ আউন্স শিশি ৬০।

আসল ফরাসডাক্সার ধুতি সাড়ী ।

বিগত ৪৫-বৎসর হইতে আমরা আসল ফরাসডাক্সার ধুতি, শাটী, ইত্যাদির ব্যবসা আরম্ভ করিয়া কলিকাতা ও মফস্বলস্থ প্রধান প্রধান স্থানের দোকানদারদিগকে অতি সুবিধা দরে কাপড় বিক্রয় করিতেছি। কিন্তু ইহাতে মফস্বলস্থ সম্ভ্রান্ত খুচরা খরিদদারদিগের (যাঁহাদের সামান্য ২৩ ছোড়া কাপড় আবশ্যিক) কোন সুবিধা হইত না। এবার হইতে তাঁহাদের এই অসুবিধা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, আর তাঁহাদিগকে অতি বেশি মূল্য দিয়া স্থানীয় দেশী কাপড়ের দোকান হইতে বা কলিকাতার পাইকারদিগের নিকট হইতে খরিদ করিতে হইবে না।

ভরসা করি, মফস্বলস্থ ভদ্র-মহাশয়গণ আমাদেরিগকে তাঁহাদিগের কার্য-নির্বাহক নিযুক্ত করাইয়া উৎসাহ দিতে বিমুখ না হন।

বিনীত

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রক্ষিত,

চন্দন নগর ।

কবিরাজ শ্রীমুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের
আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয়

২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের এই আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও ঔষধালয় ভারতীয় নৃপতি বৃন্দের কেবল এক মাত্র বিশ্বস্ত ও পৃষ্ঠপোষিত ঔষধালয়। বিদেশীয় রোগিগণ রোগ-বিবরণ লিখিলে যত্ন পূর্বক ত্বরায় বিনামূল্যে ব্যবস্থা প্রেরণ করা যায়।

জ্বাকুসুম তৈল।

জ্বাকুসুম তৈল জগতে অতুলনীয়। ইহার মঠ সর্করণ-সম্পন্ন তৈল আর নাই। বিদ্যাবত্তায়, বুদ্ধিমত্তায় এবং পদগোরবে যাহারা সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহারা প্রত্যহ আদরের সহিত জ্বাকুসুম তৈল ব্যবহার করেন। জ্বাকুসুম তৈল এক্ষণে, প্রত্যেক পদস্থ ব্যক্তির নিত্য ব্যবহার্য ও অতি আদরের বস্তু। জ্বাকুসুম তৈল পরম সুগন্ধি, জ্বাকুসুম তৈল মস্তকের স্নিগ্ধকর, জ্বাকুসুম তৈল পরম হিতকর।

বিশেষরূপে মস্তিষ্ক সঞ্চালন করার যে সকল মনস্বী ব্যক্তিকে মস্তকস্বর্ণন, নিদ্রান্নতা প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতে হইতেছে, তাহাদের জ্বাকুসুম তৈল ব্যবহার করা একান্ত কর্তব্য। মূল্য বড় শিশি ৩ ছোট শিশি ১।

ভারতের উজ্জলতম রত্ন, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি মহাশয় অনারেরল স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র মহোদয় কি লিখিয়াছেন, দেখুন—

মহাশয়ের জ্বাকুসুম তৈল অনেক দিন হইতে আমি ব্যবহার করি। তাহাতে আমি বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। জ্বাকুসুম তৈল মাথা ঘুরায় বিশেষ উপকার করে। ইহা ব্যবহার করিলে সমস্ত শরীর বিশেষতঃ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকে। এই তৈল যেমন সুগন্ধযুক্ত সেইরূপ উপকারী হইত। তারিখ ১৩ ভাদ্র ১৯৮ সাল। শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র।

যাঁহাদিগকে সর্কদা অধিক পরিমাণে মস্তিষ্কের চালনা করিতে হয়, তাহাদের শরীর এবং মন স্নিগ্ধ ও ক্ষতিযুক্ত রাখিতে হইলে প্রত্যহ ইহা ব্যবহার করা একান্ত কর্তব্য, এতৎসম্বন্ধে—

ভারতের অদ্বিতীয় সন্তান, ভুবনবিখ্যাত অনারেরল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কি বলেন দেখুন—

আমি নিজে জ্বাকুসুম তৈল প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা অতি উৎকৃষ্ট তৈল, তাহা নিঃসংশয়িত চিন্তে বলিতে পারি। এই তৈল আমি অত্যন্ত পছন্দ করি। এই তৈল সর্কসাধারণকে ব্যবহার করিবার জন্য অসুরোধ করি জ্বাকুসুম তৈল সমস্ত শরীরের ও মস্তিষ্কের স্নিগ্ধকরক ও মনোহর গন্ধবিধিষ্ট।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঠিকানা—শ্রীদেবেশ্বরনাথ সেন কবিরাজ ২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। ১৮৯৯, নবেম্বর। ১৩০৬, অগ্রহায়ণ।

মূল্য বার্ষিক সত্ৰাক্ষর।

কাম্বুজ

আয়ুর্বেদ ও ধর্মনীতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট-স্থিত

আর্য্য আয়ুর্বেদ কলেজ

হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেন্ট উপাধি ও সন্মোচন পুরস্কার প্রাপ্ত,

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিভূষণ

সম্পাদিত।

বিষয়—আমাদের কি চাই, জীব্যুৎপাদন বিচার, শক্তি-লীলা-বটকম্।

প্রকৃতির শিক্ষা ।

উৎকৃষ্ট ভাবময়ী পদ্য-পুস্তিকা । ইহাতে সৃষ্টির ক্ষুদ্রমহৎ সমস্ত বস্তুকে, এক নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে পাইবেন । পড়িলে ভাবকে রমন প্রকৃতির মনোহর ছাঁচ দেখিয়া উন্মত্ত হয় ও কৃষ্টির হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া, ভগবানের দিকে শ্রোতোরূপে বহিয়া যায় । মূল্য ১০ আনা । মফস্বলবাসী ১০ আনা ডাঃ ট্যাম্প কবিবরাজ মহাশয়ের ২০২ নং কর্ণওয়ালিসের ঠিকানায় পোঠাইয়া লউন ।

“ঋষি”-পত্রিকার নিয়ম ।

১। “ঋষি” বাঙ্গালা মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (চলন্তব্য বিষয় না হইলে) অবচলিত-নিয়মে বাহির হইবে । কোন গ্রাহক কোন মাসের “ঋষি” না পাইলে তাহার পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পানাইতে হইবে । নচেৎ ইহার জন্য আমরা দায়ী নহি । আকার (অনূন) ডিম্বাই ১১ পেজী ৩ ফণা ।

২। মূল্য, অগ্রিম বার্ষিক ১ টাকা । প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৯০ ।

৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ অল্পগ্রহপূর্কক গ্রাহক-নম্বর-সহ নাম-ধাম-আদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন । নূতন গ্রাহকগণ “নূতন” এই কথাটির উল্লেখ করিবেন ।

তবলা তরঙ্গিনী—ঢাকার প্রসিদ্ধ তবলার ওস্তাদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বণিক্য প্রণীত । এম তবলা শিক্ষার্থীর এমন সহজ পুস্তক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই । প্রত্যেক তালের লয় ও মাত্রা এরূপ নখ-দর্পণের মত দেখান হইয়াছে যে, কাহারও সাহায্য ব্যতীত নিজে নিজেই তবলা শিখিতে পারা যায় । মূল্য ১১০ । শ্রীশুরদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায় ।

প্রেমগাথা—সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা শ্রীমতী 'নগেন্দ্রবালা মস্তকী প্রণীত । মূল্য ১ টাকা, ভাল বাধাই ১১০, এমন সুন্দর সুরসাল প্রাণমুগ্ধকর কাবিতা পুস্তক প্রায় দেখা যায় না । ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট । প্রাপ্তির ঠিকানা শ্রীযুক্ত শুরদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান ।

ক্ষেত্রমোহন দে এণ্ড কোং

৪৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা ।

সম্প্রতি বিলাত হইতে শীতোপযোগী নানাপ্রকার বনাত, মার্জ, ফ্লাঞ্জাল, মেরিনো প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি আমদানি করা হইয়াছে । অডার পাইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পোষাক তৈয়ারি করিয়া দেওয়া যায় ।

Civil and Military Tailors, Army Contractors &c. &c.

English Cutter.

45, Radhabazar, — Calcutta.

ঋষি ।

২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যক ।

১৩০৬, অগ্রহায়ণ ।

আমাদের কি চাই ?

আমাদের কি চাই ? ইহার উত্তর কি দিব ? এক কথায় বলিতে গেলে, আমাদের সকলই চাই ! আমরা যে এখন দীন হীন দরিদ্র ! আমাদের যে কিছই নাই ! আমরা মনে করিতেছি, আমরা এখন শিফালাভ করিয়া মহানু পণ্ডিত হইতেছি, হুঃসাধ্য বিষয় গুলিও অনায়াসে করতলগত কামিতে সমর্থ হইয়াছি ; এমন মান এমন পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি আমাদের আর্ধ্যবংশীয়গণও লাভ করিতে পারেন নাই । দর্শন বিজ্ঞানের সুরমা রাশ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা করিতে না পারি কি ? যে বিদ্যাং মালা'বহুদূরে অবস্থান করিয়া মেঘের গলা জড়াইয়া কবিহৃদয়ে অপূর্ণ ভাবলহরী ছুটাইত, আজ তাহা বিজ্ঞানবলে Electric light রূপে চন্দ্রদেবকে পরাস্ত করিয়া আমাদের কাছে আলোক যোগাইতেছে । বিজ্ঞানবলে আজ আমরা কবির উপমা-খণি সেই বিদ্যাংমালাকে যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারি । যে সকল গিরিশ্রেণী আমাদের হুম্মারোহ ছিল, যে সকল দেশ আমাদের অদর্শনীয় ছিল, বিজ্ঞানের করণায়, Baloon রূপ মহা যান আমাদের কাছে সে সকল স্থানেও লইয়া যাইতেছে, সে সকল স্থান অনায়াসে দর্শন করিয়া জনসমাজ হইতে আমাদের কাছে কত "বাহবা" দিতেছে । বিজ্ঞান সাহায্যে না হইতেছে কি—আমরা না পাইতেছি কি !

পাইতেছি অনেক সত্য, কিন্তু হারাইতেছি যে কত, তাহা কি একবার কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন !

যে দর্শন বিজ্ঞান রাশ্যে প্রতিষ্ঠা লাভের স্বপ্ন, আমাদের কাছে রাশি রাশি

অর্থব্যয় করিয়া আত্মীয় বান্ধবদিগকে ছাড়িয়া স্বদেশের মমতা ত্যাগ করিয়া মহাসাগরোপকূলে বাইতে হয়, আমাদের আর্ধ্যবংশীয়গণও তাহা আয়ত্ত করিতে পারেনে নাই এমত নহে। তাঁহারা বিজ্ঞান ও ধর্ম্মরাজ্যে বেক্রম অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, আধুনিক পণ্ডিতগণের সেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিবার সময় এখনও বহু। পশ্চাতে। বৃক্ষতল বা পর্ণকুটীরবাসী প্রাচীন মুনিঋষিগণ প্রকৃতির অভিধানক্রমে পাঠ করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, বহুমূল্য রাশি রাশি বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও, আধুনিক বিদ্বান্ বা বৈজ্ঞানিকগণের, সেরূপ জ্ঞানার্জন করিবার ক্ষমতা, আজও হয় নাই।

তাঁহাদের অতুল জ্ঞান বিজ্ঞানবলেই, আমরা অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহাদের বিজ্ঞান বলেই শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদ সকল জ্ঞাত হইতেছি। হিন্দুশাস্ত্র কেবল ধর্ম্মরাজ্যে অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই নিরস্ত হন নাই; এক এক খানি শাস্ত্রগ্রন্থ মহাবৈজ্ঞানিকতার পরিপূর্ণ। সেই জগৎপূজ্য ঋষিবাক্য সকল যে, অমূল্য বৈজ্ঞানিকতার পূর্ণ, তাহার গভীর তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে, আধুনিক মহামহোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিকগণেরও মস্তক ঘুরিয়া যায়—যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি অবশ্যই ইহা স্বীকার করিবেন।

আমরা নিজ ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন পদ-দলিত করিয়া পদদ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছি; তাই আমাদের এই হৃদ্বিশা, তাই আমরা পদপত্রবৎ অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছি। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার ডুবিয়া গিয়াছি, সুতরাং নিজ ভাণ্ডারের দিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর পাইতেছি না; কাজেই আমাদের অমূল্য সম্পত্তি সকল বহুদূরে গভীর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

স্বীকার করি, আধুনিক শিক্ষাবলে জড়বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইতেছে, কিন্তু কেবল জড় বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনই কি মনুষ্যত্ব! জড় বিজ্ঞান শিক্ষার জন্ত জাতীয়তা বিসর্জন করিতে হইবে, ধর্ম্মপ্রাণতা পদদলিত করিতে হইবে, ইহা শিথিলে কোথায়!

অনেকে মনে করিতেছেন, আমাদের এখন উন্নতির সময়, “অধঃপতন” কথাটা তাঁহাদের নিকট স্বপ্নলব্ধ বাক্যবৎ। বাস্তবিক আমাদের এখন এতই অধঃপতন ঘটয়াছে যে, আমাদের কি অভাব, কি হুঃখ, কিরূপ অধঃপতন হইতেছে, আমরা তাহা নিজেই অনুভব করিতে অসমর্থ। প্রথমতঃ,

আধুনিক শিক্ষা, আমাদের পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের পবিত্রমূর্ত্তি বিদূরিত করিয়া তৎস্থলে Love এর স্বরম্য মূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। আমরা সেই Love এর ফলে, লাভ করিতেছি—বিষম অশান্তি। কেন ? তাহার কি বলিতে হইবে ? আমরা নিজ মনোমত কাহাকেও দর্শন করিয়া তাহার সহিত Love করিলাম, পরিণামে তাহার সহিত পবিত্রীত হইবার অন্ত লালসিত হইলাম ; কিন্তু সমাজের নিয়মানুশোধে বা গুরুত্বের প্রয়োচনায়, অনেক স্থলেই সেই লালসায় বঞ্চিত হইয়া তীব্র অশান্তি ভোগ করিতে হয়। কোনও স্থলে ঘটনা ক্রমে “My love” এর সহিত সন্মিলন ঘটিলে, তাহাতেই কি তৃপ্তি সাধন হয় ! কিয়দিন অতি সুখেই অতিবাহিত হয়, সত্য, কিন্তু পরে যখন পরস্পর পরস্পরের হৃদয়-রাশ্ম্যে প্রবেশ করে, তখন সুখস্বপ্ন ভাঙিয়া যায়, তাহাতে কত অভাব দৃষ্ট হয় ; তখন বুঝিতে পারেন, তাহার সহিত Love ঘটয়াছিল তিনি প্রবঞ্চক শঠ কামুক মাত্র ! তখন Love এর যে আনন্দ যে সুখ তাহা ফুরায়, তাহার স্থান পূর্ণ করিয়া রাখে—অশ্রুজল ও বুক-ভাঙ দীর্ঘ-শ্বাস। Love হইতেই গুপ্তপ্রেমের অভিনয়। এই অভিনয়ে, কত পবিত্রচেতা নরনারী যে, কলঙ্কসাগরে নিমজ্জিত হইতেছেন, তাহার ইয়ত্তা কোথায় ! Loveকারী স্ত্রী হউন বা পুরুষই হউন, Love করিয়া কখনই আত্মহারা হইতে পারেন না, আত্মহারা হইবার মত তাহাতে কিছুই পাওয়া যায় না, তাহার কেবল চাকচিক্য-শালীতাই সার। হিন্দুর প্রাচীন প্রেম ও বর্ত্তমান Loveএ বহু তফাৎ।

“জীবনে অরণে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি” ইহাই হিন্দু প্রেমের মাসুল

এক্ষণে দেখা যাউক, এই Love আসিল কোথা হইতে ! পুরুষাত্য কুচিই Love সৃষ্টি করিয়াছে। হিন্দু শাস্ত্র বলেন,—

“অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী নববর্ষে চ ব্রোহিণী।

দশমে কল্পকা প্রোক্তা তদুর্দ্ধে চ রক্তস্বলা ॥”

ইহা মহাত্মা যশ্ধরই উক্তি। বালাবিবাহের ত্রায় দাম্পত্যপ্রেম গাঢ় করিতে আর কোন প্রথাই সমর্থ নহে। বালাবিবাহিত দম্পতিদ্বয়ের মধ্যে অন্তত Love সঞ্চার হইবার সুযোগ ঘটে না ; তাহারা পরস্পরে পরস্পরের হৃদয়ে ডুবিয়া যায়, অন্তদিকে চিত্ত ধাবিত হইতে পারে না। সুতরাং Love-মূলত “হা হতোস্মি” আসিয়া হৃদয় দগ্ধ করে না ; অতএব হৃদয়ে শান্তির অভাব

থাকে না, হৃদয়ের অমৃতমরণশক্তির ফলে সংসারে স্বর্গীয় শক্তির আবির্ভাব হয়। প্রাচীনকালে বাল্যবিবাহের অমৃতময় ফলেই হিন্দুর পারিবারিক সুখ স্থলভ ছিল। অধুনা বৌবনবিবাহ প্রচলনের জন্ত, অনেকেই লালসিত হইতেছে; কিন্তু অনেক স্থলে ইহার বিষম ফলে, কত নিরপরাধ সহযোগীর হৃদয় পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতেছে, সমাজ তাহার সন্ধান রাখিয়াছেন কি? বর্তমান রুচির জন্তই আমরা আমাদের চিরারাধ্য সুকোমল সুপময় দাম্পত্য প্রেমরত্ন হারাইতে বসিয়াছি, তাহা কি কেহ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন!

আমাদের সমাজে আর একটি তীব্র অশান্তি 'বরপণ'। কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার ও জামাতাকে ঘোতুকাদি প্রদান পদ্ধতি, প্রাচীন কালেও ছিল; কিন্তু তাহা অবস্থা ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত অর্থাৎ যাহার বেরূপ অবস্থা এবং ইচ্ছা তিনি সেই অনুসারে কন্যা ও জামাতাকে ঘোতুকাদি প্রদান করিতেন। এখন কন্যাকর্তার নিকট হইতে বরকর্তা পীড়ন পূর্বক ঘোতুক গ্রহণ করেন। এখনকার বর ঘোতুক, নীলামের মূল্যবৎ হইয়া উঠিয়াছে। অনেক স্থলে, সামান্য পরিবারের মধ্যে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে যে বিপন্নাবস্থায় পতিত হইতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্তে কি বুঝিবে। নিরন্ন মূর্খের হস্তে কন্যা প্রদান করিতে হইলেও অমৃত: ৫০০ পাঁচ শত টাকা চাই; কিন্তু অনেক স্থলে কন্যাকর্তার বাস্তব ভীটা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াও ৫০০ শত টাকা সংগ্রহ করা দায় হইয়া উঠে। এরূপ স্থলে, যাহার দুই চারিটা কন্যা আছে, তাহার কিরূপ

উপস্থিত, সমাজ তাহা একবার ভাবিবেন না কি? এইরূপ বিপন্নাবস্থাপন্ন কন্যাকর্তা যখন সময়ে কন্যা সম্প্রদান করিয়া উঠিতে পারেন না। এ দিকে শাস্ত্র বলেন, কুমারী কন্যার নারীধর্ম ঘটিলে সপ্তপুরুষ নরক গামী হন। সুতরাং কন্যাকর্তাও ধর্মভ্রষ্টাবশতঃ নরক ভোগ করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কন্যাকর্তার এই ধর্মভ্রষ্টতার কারণ কি? বরপণ নহে কি? যদি তাহাই হয়, তবে ইহার জন্ত দায়ী কে? এই বরপণ নব্য শিক্ষার ফল। আমাদের রুচি নীতি নীতি যতই পরিবর্তিত হইতেছে, আমরা ততই ধর্মপ্রাণতা হারাইয়া হীনবল হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। বরপণের বেরূপ আধিকা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সমাজপতিগণের এ বিষয়ে রুচি পরিবর্তিত না হইলে, ভারতে আবার রাজপুতনার স্থায় সেই শোচনীয় কন্যাহত্যা ব্যাপার সংঘটনের আশঙ্কা হয়।

নব্য সভ্যতার সূক্ষ্ম হইয়া আমরা একাগ্রবর্তী পরিবারকে Don't care করিতে শিখিয়াছি। একাগ্রবর্তী পরিবারের মহত্ব আমরা জনস্বাক্ষর করিতে পারি না, ইহাও আমাদের অবনতির একটা কারণ। জন লম্বা হইলে মিশা-মিশি হয়, মানুষের ততই শিক্ষালাভ হয়। একাগ্রবর্তী সংসার, আমাদের জীবনের একটি মহাশিক্ষা ও পরীক্ষার স্থল। এখন আমাদের এই শিক্ষা-লয়ের অভাব ঘটিয়াছে, আমরা নিজে প্রভূত লাভ করিয়া, আত্মকৃতার্থতা লাভ করিয়া, কেবল জনস্বাক্ষর করিয়া ফেলিতেছি মাত্র। একাগ্রবর্তী সংসার হারাইয়া আমরা নিঃস্বার্থতা, সহানুভূতি, উদারতা প্রভৃতি সমস্ত অমূল্য রত্নগুলি হারাইয়া ফেলিতেছি।

এ দিকে, যেমন জড় বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতি হইতেছে, অপরদিকে আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি চতুর্গুণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সকল দিক চাহিয়া নিজ ধর্মশাস্ত্রে অনুরাগ রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিলে, মানব ইহলোক ও পরলোক পরম শান্তি ও সুখে অতিবাহিত করে।

আমরা প্রাচীন রীতিনীতি, ধর্ম, অনুরাগ প্রভৃতি বিসর্জন দিয়া সুখে আছি—এমন কথা কেহ কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন ? প্রাচীন কালের স্বাস্থ্য, আয়ুঃ, ধর্ম, জ্ঞান, সুখ, শান্তি, প্রেম, প্রীতি, দয়া, মমতা প্রভৃতি আমরা শিক্ষিত হইয়া সবই হারাইতেছি। ঐ অমূল্য রত্নগুলি লইয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। যদি মনুষ্যত্বই হারাইতে হইল, তবে অন্তঃসারহীন উন্নতি লইয়া প্রয়োজন কি ? আমরা অধুনা জননীর গর্ভ হইতেই প্রীতি বন্ধন লইয়া ভূমিষ্ট হই, তাহার পর যে কয়টা দিন বাঁচিয়া থাকি তাহাও নানারূপ পীড়ার মুহমান হইয়া আমাদের এখন,—“বয়স না হতে কুড়ি আগে পাকে কেশু”। আমরা এখন প্রাচীন না হইতেই বার্কিকোর পথে উপস্থিত হই। এই সমস্ত অধঃপতনেরই একমাত্র কারণ দেশীয় রুচি রীতি নীতি পরিবর্তন।

হিন্দুশাস্ত্রে দর্শন, বিজ্ঞান, প্রভুতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, স্বাস্থ্যোপদেশ, চিকিৎসা, জ্ঞান, ধর্ম, নাই কি ? বাহা চাহিবে, বাহা প্রয়োজন, ঋষিবাচ্যাত্মশীলন করিয়া দেখ, তাহাই পাইবে। যদি আমাদের প্রকৃতই উন্নতিলাভ করিতে হয়, তবে আমাদের চাই—ঋষিবাচ্যে অনুরাগ।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী।

জব্যগুণ বিচার ।

কমল ।

প্রয়োগ—সকল প্রকার পদ্মেই নানাধিক রক্তরোধক শক্তি আছে, কিন্তু খেত অপেক্ষা নীলপদ্মে ঐ শক্তি অধিক এবং নীল অপেক্ষা লালপদ্মে উহা আরও অধিক আছে । ইহা ঠৈর্তাগুণায়ক, উজ্জ্বল উর্দ্ধগ রক্তশ্রাবে স্তম্ভাবতঃ কফের সংশ্রব থাকায়, ইহার প্রয়োগ অতি বিরল ; অধোগ রক্তশ্রাবে অর্ধাৎ অর্শের রক্তে, স্ত্রীলোকের রক্তপ্রদরে ও মলদ্বার হইতে রক্তনিঃসরণে বায়ুর প্রবলতা থাকায় ইহার যথেষ্ট উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । বেহেতু, শাস্ত্রে উক্ত আছে “উর্দ্ধগং কফসংসৃষ্টম্, অধোগং পবনামুগম্।” অর্থাৎ উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে কফের এবং অধোগ রক্তে বায়ুর সংশ্রব থাকে । রক্ত-রোধার্থ পদ্মের দলের রস এক কাঁচা হইতে আধ ছটাক মাত্রাধি, একটু পরিষ্কার চিনি সহ দিতে হয় । শীতবীৰ্য্য ও পিত্তজনক বলিয়া পদ্মদলের প্রলেপ বাতরক্তের দাহ ও পিত্তজনিত গাত্রদাহ নাশ করে । গ্রীষ্মকালে কোমল পদ্মপত্রোপরি শয়ন করিলে, শীতলপাটী অপেক্ষাও উহা অধিক আরাম-দায়ক হইয়া থাকে । সংস্কৃত নাটকাদিতে দৃষ্ট হয় যে, নায়ক বা নায়িকার বিরহজনিত গাত্রদাহ উপস্থিত হইলে, কমলপত্র শব্দে অবলম্বিত হইত । কবি কালিদাস লিখিয়াছেন, হৃদয়ের বিরহজ্বালায় শকুন্তলা পদ্মপত্রশায়িতা হইয়াছিলেন । লক্ষ্মীদেবীর পদ্ম-পত্রে অবস্থিতি কি তাঁহার প্রকৃতিগত অস্থি-রতা নিবারণের স্তম্ভ ?

কতিপয় মুষ্টিযোগ :—(১) কচি পদ্মপত্রের রস গোড়া-ঘারে বিশেষ উপকারী । (২) নীলপদ্মের রস নাসিকা দ্বারা পান করিলে তদন্তে প্রবল তৃষ্ণার শাস্তি হয় । (৩) নীলোৎপল, বটের বুরি, কুড়, মধু ও খই এই সমস্ত এক সঙ্গে পিষিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে । এই গুড়িকা মুখমধ্যে ধারণ করিলে শীঘ্র পিপাসার শাস্তি হয় । (৪) কচিপদ্মপত্র ও কুঙ্কতিল, চিনি সহ পেষণ করিয়া ছাগছত্ৰসহ পান করিলে, অর্শের রক্তশ্রাব নিবারিত হয় । (৫) কচিপদ্মপত্রের রস চিনি সহ পান করিয়া উক্তরূপ কচিপত্র মলদ্বারে লাগাইয়া কোপীন পরিয়া থাকিলে, মলদ্বার নির্গম (হারিস) দূরীকৃত হয় ।

(৬) পদ্মের ডাঁটা দধি করিয়া সেই ক্ষার সৈদ্যাদালপত্রের রসের সহিত প্রলেপ দিলে পাখনাকণ্টক (শরীরে ও মুখে, পদ্মকণ্টকাবৃত্তের দ্বারা যে চক্রাকার উদ্ভগত হয় তাহা) আরোগ্য হয় ।

(৭) পদ্মপত্র, বেণামূল, কুড়, রক্তচন্দন, হরিদ্রা ও কুম্ভুম একত্র জল সহ পিষিয়া মুখে লেপন করিলে মেচেষ্টা, নীলিকা, ব্রণ প্রভৃতি নানা মুখদুষ্ক পীড়া দূরীভূত হয় ।

(৮) পদ্মফুলের ভিতরে যে হরিদ্রাবর্ণ রেণু থাকে, তাহা চন্দন-ঘষার সহিত লাগাইলে জ্বালীযুক্ত ঘামাচি আরোগ্য হয় । (৯) রক্তকমলের মূলের (গেঁড়ের) রস রক্তপ্রদরের অতিউৎকৃষ্ট ঔষধ ।

পদ্মবীজের গুণ ।

পদ্মবীজঃ হিমং স্বাহ্ কষায়ং তিক্তকং শুষ্ক ।

বিষ্টম্ভি বৃষ্যাকক্ষণ গর্ভসংস্থাপকং পরম্ ।

কফবাতকরং বল্যং গ্রাহি পিত্তাশ্রদাহনুং ॥

পদ্মবীজ শীতল, স্নিগ্ধ ও দ্রবং তিক্ত-কষায়, শুষ্কপাক, বিষ্টম্ভকর, শুক্রের গাঢ়তাকারক, রক্ষ, গর্ভসংস্থাপক (শুষ্ক বীজচূর্ণ হৃৎ ও চিনি সহ পারস প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলে, গর্ভশ্রাবের আশঙ্কা দূরীভূত হয়) কফ-বাতকর, বলবর্দ্ধক, সংকোচক, রক্তপিত্ত ও দাহপ্রশমক ।

পদ্মের বীজ শুকাইয়া উৎকৃষ্ট জপের মালা প্রস্তুত হইয়া থাকে । এই বীজের শাঁস, মিশ্রীসহ কাঁচা খাইলে উত্তম জল-খাবার হয় এবং যথাবিধি রন্ধন করিলে অতীব সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয় । উহা মেহ ও বৃহ্মত্র রোগীর বড় উপকারী ।

পদ্মের গেঁড় হইতে যে মূল নিম্নাভিমুখে ভূমির মধ্যে প্রবেশ করে তাহাকে মৃগাল বলে ; তাহা দেখিতে অতীব শুভ্র । কাব্যে ইহা কোমল ও শুভ্রবস্তুর উপমানস্থল বলিয়া বর্ণিত আছে । ইহা সুস্বাদু, তৃষ্ণাহর ও দাহনাশক ।

শাস্ত্রোক্ত উশীরাসব ও প্রসিদ্ধ চ্যবনপ্রাশে নীলোৎপল, ফলকল্যাণ যুক্ত রক্তোৎপল, বায়ুরোগের পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈলে খেতপদ্মের প্রয়োজন হয় ।

কমলা গুড়ি ।

বাল্লা নাম—কমলা গুড়ি ; হিন্দী—করোলা বা কহীলা ; ইংরাজী—
Malatus philippensis. সংস্কৃত পর্যায় :—কাম্পিন্যঃ কৰ্কশশ্চক্রো রক্তাসো
 রোচনোহপি চ । সংস্কৃত নাম—কাম্পিন্য, কৰ্কশ, চক্র, রক্তাঙ্গ, রোচন ।

ইহা দেখিতে ইষ্টকের সূক্ষ্মচূর্ণের দায়, কিন্তু তদপেক্ষা সাতিশয় লঘু, হরিদ্রা-
 চূর্ণ অপেক্ষাকৃত অধিক লাল হইলে যেরূপ হইত ইহা দেখিতে ঠিক তদ্রূপ ।
 ইহা একপ্রকার গাছের ফলের গাত্রসংলগ্ন রেণু মাত্র ; ঐ গাছ ভারতের সমুদ্র
 সন্নিকটে, সিংহল, চীন, আরব প্রভৃতি স্থানে জন্মে । কমলাগুড়ি বাজারে
 বণিকের দোকানে ধূলা-বালি-মিশ্রিত অবস্থায় কিনিতে পাওয়া যায় । ব্যবহার-
 কালে কাপড়ে ছাঁকিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয় ।

কাম্পিন্যঃ কফপিত্তাস্ত্র ক্রিমিগুম্মোদর ব্রণান্ ।

হস্তি রেচী কটুশ্চ মেহানা হবিষাশ্মুৎ ॥

রস—ঈষৎ কটু ; বিপাক—কটু ; যৌর্য্য—উষ্ণ ; গুণ—কফ-
 পিত্তহর, রক্তদোষ, ব্রণ ও বিবনাশক ।

প্রভাব—রেচক, ক্রিমি, গুম্ম, উদর, মেহ ও অশ্মরীনাশক ।

প্রয়োগ—ইহার প্রধান গুণ এই যে, ইহা মল-খিরেচক কিন্তু অস্ত্রে
 বেদনা জন্মায় না । ইহা স্পর্শে অত্যন্ত কৰ্কশ বলিয়াই বোধ হয় ক্রিমির
 গাত্র সংসর্ষণ করিয়া উহাদিগকে নিহত ও রেচন গুণে নিকাশিত করে ।
 চূর্ণের জলসহ সেবন করাইলে শীঘ্র ক্রিমি বিনষ্ট হয় ।

ভাবমিশ্র বলেন—কম্পিন্যচূর্ণ কৰ্ব্বাদ্বঃ গুড়েন সহ ভক্ষিতম্ ।

পাতয়েৎ তু ক্রিমীন্ সর্সান্ উদরস্থান্ ন সংশয়ঃ ॥

অর্থাৎ কমলাগুড়ি চূর্ণ ১ তোলা, গুড়ের সহিত সেবন করিলে উদরস্থ
 সমস্ত ক্রিমি বিনষ্ট হয় (আজকালকার দিনে ১ তোলা দিলে অতিমাত্রা
 হয় ; মাত্রা শেষে দেখুন) । রেচকত্ব হেতু ইহা গুম্ম, জলোদর, বাতোদর,
 শ্লীহা, বক্রৎ প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গুম্মাদি রোগে ইহার সহিত
 কোনও ক্ষার বস্তু মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে অধিক উপকার হয় ।

ইহা প্লোকে 'মেহনাশক' বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কিরূপ মেহনাশক ?

(১) বিষাক্ত মেহের প্রথমাবস্থায়, ইহা দ্বারা ঋণ্য পরিমাণে মলভেদ করা হলে, সঞ্চিত দোষের নির্গমন হেতু ও ইহার বিষনাশকগুণে উপকার পাওয়া যায়। (২) ইহা মূত্রাঘাত রোগে উপকারী ; উদরস্থ হইলে, মলভাঙে বেগ উৎপন্ন করিবার সম-সময়ে, ইহা মূত্রাশয়ও প্রতিঘাত দিয়া থাকে, তজ্জন্ত ইহার মূত্রনিষ্কাশন শক্তিও দৃষ্ট হয়। নানা বাহ্যিক কারণে, উহাতে সোরা প্রভৃতি মূত্রকারক উপকরণ মিশাইলে, উক্ত শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (৩) যদি কোষ্ঠবদ্ধতা ও বন্ধতের দোষে ক্ষারমেহ (ফস্ফেট নির্গম) বা লালামেহ উৎপন্ন হয়, তবে ইহার প্রয়োগে উক্ত দোষ নিবারিত হইয়া ফল দর্শাইয়া থাকে। এই রোগে আমলকীর জল অনুপান দেওয়া শ্রেয়ঃ।

ইহা অশ্মরীনাশক,—মূত্রনাশীতে প্রতিঘাত দিবার শক্তি আছে বলিয়াই, ইহা পাথুরী বাহির করিতে সমর্থ ; কিন্তু পাথুরী বড় হইলে, ইহা দ্বারা ফল দর্শায় নহে। কুলথকলায়ের কাথের সহিত কমলাগুড়ি দিলে ইহার অশ্মরীনাশক শক্তি বৃদ্ধি হয়।

চরক সূত্রস্থানে বলিয়াছেন—কমলা গুড়ি, তুঁতে, হরিদ্রা, হীরাকস, গন্ধক, ধূনা, মনঃশিলা ও করবীর ছাল চূর্ণে, সর্বপ তৈল মাখাইয়া গায়ে দিলে কুষ্ঠ কণ্ডু প্রণ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

কমলা গুড়ির মাত্রা—দেড় আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত। সাধারণতঃ ১০ আনা সেবনে দু' তিন দান্ত হয়। মুহূর্ত্ত ব্যক্তিকে ১২ আনা দিলেই যথেষ্ট। অনুপান গরম জল।

শাস্ত্রীয় ধারস্তর দ্বতে, ভাবপ্রকাশ-দ্বত মেহের কম্পিলাদি চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধে কমলাগুড়ি আবশ্যক হয়।

কমলালেবু ।

বাঙ্গালা নাম—কমলালেবু ; হিন্দী—মিঠানিমু ; ইংরাজী—Orange. সংস্কৃত নাম—মিষ্টনিম্ব, নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, তক্ষুঙ্গক, মুখপ্রিয়। ইহার গাছ প্রায় বাতাবীলেবুর মত উচ্চ হয়, পাতা সাধারণ লেবুপত্রের মত। ফল অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন। গাছ অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঁচে। শুনা যায়

একটা কমলাগাছ, পাঁচশত বর্ষ পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। ইহা উচ্চে প্রায় ৩০ হাত এবং শুঁড়ী প্রায় ৮ হাত বিস্তৃত হয়। এক একটা গাছে ৫০০ হইতে ৬০০০ ফল ধরিতে দেখা যায়। কমলালেবু নাম হইল কেন বলিয়া মতভেদ আছে। কেঁহ বলেন, আসামে কমলা নদীর তীরে বৃহৎ পরিমাণে জন্মে, তজ্জন্ত এই নাম। কেহ বলেন, ত্রিপুরার রাজধানী 'কমিল্লা' হইতে প্রথম আনীত হওয়ার এক্ষণ নাম। কাহারও অনুমান, কমলা অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবীর বর্ণের জ্ঞান বর্ণই এই নামের কারণ। এ দেশে নারেকা বলিলে অল্প এক প্রকার অন্নমধুর লেবুকে বুঝায়। কিন্তু ভাবমিশ্র নারঙ্গ (নাগরঙ্গ) শব্দে কমলাকেই অভিপ্রেত করিয়াছেন। কমলালেবুর প্রধান জন্মস্থান, নেপাল, সিকিম, শ্রীহট্টের খাসিয়া-পল্লতাঞ্চল, নাগপুর ও দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চল। নাগপুরী কমলা, গ্রীষ্মকালেও কলিকাতায় পাওয়া যায়; উহা অত্যন্ত মধুর, অন্নরসু নাই বলিলেই হয়। হার্জিলিঙ্গে ছোট ছোট এক জাতীয় কমলা হয়, তাহা বেশ সুমিষ্ট। দূর-দৈর্ঘ্যান্তরে বলিয়া, আমরা শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত কমলা খাইয়া কলের কত প্রশংসা করি, কিন্তু কলের জন্মস্থানে গাছ-পাকা ফল যিনি আশ্বাদন করিয়াছেন, তিনি যৎপরোনাস্তি শ্রীত ও বিস্মিত হইয়াছেন। গাছ-পাকা ফল দুগ্ধের সহিত খাওয়া যায়, দুগ্ধ নষ্ট হয় না। এই কলের বিশেষত্ব এই যে, হাঁহার আদি জন্মস্থান ব্যতীত অন্যত্র রোপণ করিলে, প্রায় সাধারণ অল্পলেবুতে পরিণত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই ফল ভারতবর্ষীয় নহে, চীন বা অন্তদেশ হইতে প্রথম আনীত হইয়াছিল; কিন্তু আমাদের ধারণা এই—প্রাচীনকালে মধ্যভারত নাগলোক নামে খ্যাত ছিল। এখনও আমরা তাহারই চিহ্নস্বরূপ নাগপুর, ছোটনাগপুর প্রভৃতি নামগুলি দেখিতে পাই। মধ্যভারতকে নাগলোক নামে অভিহিত করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। 'সংস্কৃত নাগ' অর্থে পর্কত, হস্তী, সর্প ও জাতি-বিশেষের নাম বুঝায়। "অগি সঞ্চলনে" অর্থাৎ অগ ধাতুর অর্থ সঞ্চলন, 'ন' ও 'অগ' এই দু'এর যোগে 'নাগ' শব্দের উৎপত্তি। যাহা সঞ্চলন করে না, মূল শব্দার্থ হিসাবে তাহাই প্রথম নাগ নামের যোগ্য। পর্কত সঞ্চলন করে না, তাই পর্কতের আর এক নাম নাগ। হস্তী ও সর্প প্রভৃতি পার্শ্বত্যাগ্রদেশে প্রধানতঃ বিচরণ করে বলিয়া উহারও ক্রমে পর্কতের নামে নাগ নাম প্রাপ্ত

হইয়াছে। মনুষ্যের মধ্যে যে জাতি, মধ্যভারতের অরণ্যসকুল পার্বত্যপ্রদেশে হস্তী ও সর্পের স্তায় বিচরণ করিত, তাহারাও নাগ নামে খ্যাত না হইয়া যায় নাই। মধ্য-ভারত প্রধানতঃ পার্বত্যপ্রদেশ বলিয়া নাগলোক, মধ্য-ভারত সর্প ও হস্তীর আবাসভূমি ছিল বলিয়া নাগলোক, আবার ঐ স্থান পার্বত্য নাগজাতির আবাসভূমি ছিল বলিয়া প্রাচীন ঋষিদিগের নিকট নাগলোক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই নাগলোকে প্রচুর পরিমাণে কমলালেবু জন্মে বলিয়াই, ঋষিরা কমলালেবুর নাম 'নাগরঙ্গ' দিয়াছেন। নাগলোক রঞ্জিত করিয়া থাকে বলিয়াই 'নাগরঙ্গ' নাম হইয়াছে। এক্ষণেও সেই পুরাকালের স্তায় নাগপুর প্রভৃতি প্রদেশ, নাগরঙ্গের স্বর্ণবর্ণে শোভাযুক্ত হইতে দেখা যায়।

ভারতের মধ্যপ্রদেশের স্তায়, ভারতের পূর্বাঞ্চল আসাম প্রদেশও কেবল যে কমলালেবুর অল্প স্প্রসিদ্ধ তাহা নয়। আসামভূমি নাগপুর প্রদেশের স্তায় পার্বত্য প্রদেশ বলিয়া এক হস্তী, সর্প ও নাগজাতির সিবাস্থান বলিয়াও স্প্রসিদ্ধ। প্রাচীন পৌরাণিক নাগজাতির অবশেষ (আম্বাদিগের বিশ্বাস) এখনও ভারতে নাগজাতিরূপে বিদ্যমান। খুব সম্ভব জনমেজয়ের নাগযজ্ঞের পর, অবশিষ্ট নাগকুল, আসামের অরণ্যসকুল গিরি-গুহার পলায়ন করিয়া আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। আশ্চর্য্য এই যে, ভারতের যে যে অংশে নাগেরা প্রবেশলাভ করিয়াছে, সেই সেই অংশ নাগরঙ্গের রঙ্গক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। যেমন আমাদের দেশে ইংরাজ জাতির প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে, ভারতের উদ্যান-বিলাসী তরুলতাও রোপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেইরূপ সম্ভবতঃ নাগেরা যে দেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দেশে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জন্মভূমির 'নাগরঙ্গ' রোপণ করিতে ভুলে নাই।

মিষ্টনিষ্কলং স্বাহু গুরু মাকৃতপিত্তমুৎ।

গররোগবিষধ্বংসি কফোৎক্রেণি চ রক্তহং।

শোষাকচি তৃব্যচ্ছর্দিহরং বলাঞ্চ বৃংহণম্ ॥ ভাঃ প্রঃ।

রস—অন্নমধুর ; বিপাক—অন্ন ; বীৰ্য্য—উষ্ণ ; গুণ—গুরু, বায়ু ও পিত্তনাশক, কফের উদ্রেক ও নিঃসরণকারী, রক্তশ্রাব নাশক, ক্ষয়, অরুচি, তৃষ্ণা ও বমিনাশক, বল ও পুষ্টিকর। প্রভাব—বিষদোষ নাশক

(বিষ শরীরে হইয়া অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনা জন্মাইলে, ইহার রসপানে উহার উপশম হয়) ।

নারঙ্গো মধুরান্নঃ শ্রীৎ দীপনং বাতনাশনম্ ।

কমলালেবু মধুরান্ন, স্নায়ুদীপক, ও বায়ুনাশক ।

মধুরং কিঞ্চিদন্নঞ্চ হৃদ্যাং ভক্তপ্ররোচনম্ ।

তুর্জ্বরং বাতশমনং নারিঙ্গফলঃ শুক্ৰাঃ (চরক)

নাগরঙ্গ মধুর, কিঞ্চিৎ অন্ন, অগ্নে রুচিজনক, অধিক খাইলে জীর্ণ হয় না, বায়ুনাশক ও ঈষৎ গুরুপাক ।

কমলালেবু প্রধানতঃ চারি প্রকারের আছে ; যথা—মোগলাই, কেও-
নলা বা নারিঙ্গী, লালকমলা, মান্দারিন্ ।

মোগলাই—ইহার ছাল বড় পরিষ্কার, দেখিতে একটু বড়, পীতাত্ত, স্বক্ অত্যন্ত আলগা একটু টানিলেই উঠিয়া পড়ে । এই লেবুর সন্মুখান নাগপুর, দিল্লী, আম্বার, গুরগাঁও, লাহোর, মুলতান, পুনা, মালদ্বা, কুর্গ, ত্রীহট্ট, ভোটান, নেপাল ও সিংহল । এই সব দেশে ইহার রীতিমত চাষ হয় ।

কেওনলা—মোগলাই অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জন্মে । এই জাতীয় লেবু যত্নপূর্বক আবাদ করিলে, ভারতের সর্বত্রই উৎপন্ন হইতে পারে ।

লালকমলা—(Malta orange) এখন হিমালয় ও দ্বারজিলিঙ্গে যে সবুজ রঙ্গের কমলা হইতেছে, তাহা এই কমলারই অবনতি মাত্র । এই কমলা খুব সুস্বাদু । গুজরানবালায় এই জাতীয় এক প্রকার কমলা জন্মে, উহা খাইতে বড় সুস্বাদু, একত্র ইহা ইংরাজের অতি প্রিয় ; তাহারাই ইহাকেই সর্বোৎকৃষ্ট কমলা বলিয়া সমাদর করিয়া থাকেন ।

মান্দারিণ—দেখিতে অতি সুন্দর, বর্ণ প্রায় লালকমলার তায়, খাইতে ভাল । এই কমলার একটু গুণাধিক্য এই যে, সকল প্রকার কমলা অপেক্ষা ইহার পাতায় ও ফলে সঙ্গত অধিক । ইহা চীন হইতে খাসিয়া গিরি পর্যন্ত পার্শ্বীয় ভূখণ্ডে উৎপন্ন হয় ।

প্রয়োগ—কমলালেবুর প্রধান প্রয়োগ কি ? তিন চারি মাস পর্যন্ত নিত্য নিত্য রসনার সহিত তাহার পরিচয়-করণ । যেহেতু শীতের কয়েকটা দিন ভক্তদিগকে মজাইয়া, সহসা তাহার অন্তর্ধান হয় । অন্নমধুর কমলালেবুর

রস ভক্ষণে বক্রতের ক্রিয়া যথাবৎ পরিচালিত, পিত্তের প্রাবল্য নিবারিত ও বায়ু প্রশান্ত হয় । এতদ্বশে, কোন কোন, কমলালেবু উপর উপর বড় শিশ্ন-দর্শন, কিন্তু অভ্যন্তরীণ আস্থাদের অস্বাধিক্য হেতু, ক্রেতার, অত্যন্ত নৈরাশ্র-জনক হইয়া থাকে । সে গুলি খাইতে/হইলে, সৈন্ধব লবণের সহিত খাওয়া উচিত, নতুবা স্নেহ্যর বৃদ্ধি হইতে পারে । পিপাসাযুক্ত নবজরে, মিষ্ট কমলা-লেবু অবাধে খাইতে দেওয়া যায় ; তাঁহাতে উপকার বই অপকার নাই ।

কাজের লোক হইলে, যেমন তাহাকে সকলে নানাক্রমে খাটাইয়া লয়, কমলালেবু জিনিস্‌টা ভাল বলিয়া নিপুণ গৃহিণী বা পাচিকারা ইহা হইতে নানাপ্রকার আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিয়া লন । নিম্নে কয়েকটা উল্লিখিত হইতেছে—

কুমলালেবুর পোলাও— কমলালেবুর কোয়া একসের, উহার রস আধসের, চিনি আধ পোয়া, চাউল আধসের, ঘৃত এক পোয়া, ছোট এলাচের দানা দুইআনা, দাকচিনি দুই আনা, লবঙ্গ এক আনা, কিস্মিস্ আধ পোয়া, বাদাম আধ পোয়া, পেস্তা আধ পোয়া, জাকরান্ চারি আনা, ক্ষীর আধপোয়া, লবণ এক তোলা ও জল একসের ; এইগুলি অগ্রে যোগাড় করিকে। তার পর, প্রথমে ছটাকখানেক ঘূতে বাদাম, পেস্তা ও কিস্মিস্‌গুলি একে একে ভাঙ্গিয়া তুলিয়া রাখিবে । পরে পাকপাত্রে আধপোয়া ঘৃত চড়াইয়া, তাহাতে গরম মসলাগুলি আধভাঙ্গা করিয়া, চাউলগুলি ঢালিয়া দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকিবে । দুই একটি চাউল ফুটিতে আরম্ভ হইলে, ক্রমে ক্রমে উহাতে লেবুর রস খাওয়াইতে থাকিবে । রসটা খাওয়ানর পর, গরমজল ও লবণ দিয়া পাকপাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে । পোলাওয়ে স্বল্পপ মুছতাপ দিতে হয়, সেই অল্পস্বায়ী মুছতাপ দিতে হইবে । চাউল সিদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়া আসিলে, তাহাতে বাদাম, পেস্তা, কিস্মিস্, ক্ষীর, লেবুর কোয়া, চিনি প্রভৃতি বাকি উপকরণগুলি অবশিষ্ট ঘূতের সহিত ঢালিয়া দিয়া অল্পক্ষণ দমে রাখিয়া নামাইলেই কমলালেবুর পোলাও রন্ধন হইল । তবে ইহার লেবু খুব মিষ্ট ও বেশ বড় দেখিয়া কেনা উচিত ।

কমলালেবুর অমৃতী—একটা পাত্রে তিনটা হাঁসের ডিম ভাঙ্গিয়া, তিনটা কমলালেবুর রসের সহিত বেশ ভাল করিয়া মিশাইয়া রাখিতে হইবে ।

আর, সেই লেবুর খোলাগুলিতে খানিকটা চিনি ঘষিয়া ঘষিয়া বেশ সুগন্ধ হইলে, দেড়পোয়াটাক পুরুসরওয়ারা ঘন ছুধের সহিত মিশাইবে। পরে পুরোক্ত মিশ্রিত ডিমের সহিত একটু জায়ফলের গুঁড়া দিয়া, সমস্তটাই একত্র মিশাইবে। পরে, উহা একটা চীনে মাটির পাত্রে রাখিয়া গরমজলের উপরে স্থাপিত করিয়া ঘন করিবে। ঘন হইলে উহাতে চিনি ছড়াইয়া বোতলে তুলিয়া রাখিবে।

কমলার মেঠাই—একটা লেবুর খোসা জলে সিদ্ধ করিয়া নরম হইলে সেই খোলাটির সঙ্গে দেড়পোয়া গরম সর (ছুধের) * আধপোয়া চিনি আর চারটা ডিমের হরিদ্রাংশ একত্রে বেশ করিয়া চটকাইয়া মিশাইয়া লইয়া, একটা চীনে মাটির পাত্রে (অর্থাৎ জারে) ঢালিয়া ঐ পাত্রেটা গরমজলে রাখিয়া উহা ঘন করিয়া লইবে। পরে কুহুম কুহুম গরম থাকিতে সমস্ত লেবুর রসটা উহাতে দিলেই ইহা প্রস্তুত করা হইবে।

কমলালেবুর পিঠা—আধপোয়া দোবরা অর্থাৎ দানাওয়ারা চিনিতে দুটা লেবুর খোসা ঘষিয়া, তার হালুদ অংশটা তুলিয়া ফেলিবে এবং একপোয়া টাটকা সরের মাখন তুলিয়া, লেবু-ঘষা চিনিটা গুঁড়া করিয়া একত্র মিশাইয়া, তাহাতে একটু লবণ, কিঞ্চিৎ ময়দা ও তিন-চারটা ডিমের হরিদ্রাংশ মিশাইয়া রাখিবে। আর অল্প আধপোয়া চিনির রসে লেবুর খোসাগুলি পাক করিয়া খস্টি দিয়া কুচি কুচি করিয়া লইয়া, ডিমের শাদা অংশটার সঙ্গে বেশ করিয়া কেনাইয়া, সমস্ত পদার্থগুলি একত্র মিশাইয়া, ইচ্ছামত ছাঁচে একটু বৃত্ত মাখাইয়া, আন্দাজমত উক্ত মিশ্রিত পদার্থ ঢালিয়া দিবে। তাহার উপর সামান্ত চিনি ছড়াইয়া দশ বা বার মিনিট আন্দাজ সময় ঐ ছাঁচ আগুনের আঁচে রাখিলেই পিঠা প্রস্তুত হইল ; তখন ছাঁচ হইতে তুলিয়া লইবে।

কমলালেবুর পায়স—এক সের ছুধ ঘন করিয়া জাল দিয়া, তাহাতে আধপোয়া চিনি এবং একটু নুতন গুড় বা পাটালী দিবে। ছুধ ঘন হইয়া আসিলে, বেশ বড় বড় কমলালেবু পাঁচ ছয়টা ছাড়াইয়া কোয়া বাহির করিয়া কোয়ার ছুধারের খোলাটা ফেলিয়া দিয়া, আন্ত আন্ত কোয়া

* সর অভাবে ঘন ছুধ হইলেও চলিয়া যায়।

উক্ত ছুখে ফেলিয়া দিবে । একটু ফুটিয়া উঠিলে নামাইয়া লইলেই পায়স প্রস্তুত হইল ।

কমলালেবুর সরবৎ—আধসের পরিমাণ কমলালেবুর রসে এক ছটাক মিশ্রীচূর্ণ পুনঃ পুনঃ ঝাঁকি দিয়া মিশাইয়া, উহাতে আধখানি পাতি লেবুর রস দিবে । উহাতে রুড় এলাচ ১০।১১টা খেঁতলো করিয়া ছ'একটা আন্ত স্নগন্ধি গোলাপ (অভাবে ১ তোলা গোলাপজল) অর্দ্ধ বণ্টা ডুবাইয়া রাখিয়া পেষ্ট ছাঁকিয়া লইবে । ইহা অত্যন্ত শৈত্যকর ও বায়ুনাশক ।

শীতের শেষে, কমলালেবু তাহার গায়ের খোলাগুলি মাত্র চিহ্নস্বরূপ রাখিয়া, প্রায় এক বৎসরের মত বিদায় লয় । শাস বা সার অপেক্ষা খোলা চিরকালই হের বলিয়া গণ্য । কিন্তু কমলার পক্ষে সে কথা খাটিবে না । ইহার খোলা উদরাময়, অজীর্ণ, উদরাধ্বান, ক্রিমি প্রভৃতি রোগের মহৌষধ । ডাক্তারেরা এই খোলা হইতে চোয়ান আরক ঐ সব রোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন । কবিরাজগণ শুদ্ধখোলার চূর্ণ বা কাথ (মুউরী প্রভৃতি মশলার সংযোগে) প্রয়োগ করেন । খোলার বেশ একটু সদৃশক ও সুস্বাদ থাকার ইহা ছোট এলাচ দারুচিনি প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের পাণের মসলার সহিত এক শ্রেণীতে বসিবার বিশেষ অধিকারী । এমন কি, পূর্বোক্ত নাম-জাদা মসলা দিগের অনুপস্থিতিতে পাণের মধ্যে উপবেশন পূর্বক একাই আসন্ন জম-কাইতে পারেন,—বিশেষ গুণ এই—ইনি সময়ে একটু আদর পাইলে অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য ও গৃহস্থপোষানো ।

• মুষ্টিযোগ—(১) কমলালেবুর খোসাচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ, মুউরী, ষোয়ানু ও নিষাদল প্রত্যেক সমভাগ, বিটলবণ অর্দ্ধভাগ, পাতিলেবুর রসে মাড়িয়া ৬৭ রতি প্রমাণ বড়ী করিয়া দিনে ছ'তিনবার জল সহ সেবন করিলে, অগ্নিপিত্ত, পেটফাঁপা, বক্রতের দোষ ও অগ্নিমান্দ্য উপশমিত হয় ।

(২) কমলার খোসা, জৈত্রী ও ছুখের সর একত্র বাটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে বয়োব্রণাদি আরোগ্য হয় । ভারতবর্ষীয় ফার্মাকোপিয়ার মতে, এই খোসা শুধু অগ্নিবর্দ্ধক ও অজীর্ণহর নহে, (তিক্তত্ব হেতু) সাধারণ দুর্বলতারও বিশেষ উপকারী ।

খোলা ও ফুল হইতে একপ্রকার অতি তরল তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা ব্যথা ও প্রদাহযুক্ত স্থানে মর্দনে উপকার দর্শায় ।

পাতা চোরাইয়াবে অল পাওয়া যায়, তাহা অর্ধছটাক মাত্রায় প্রয়োগে স্নায়বিক বিকার ও মূছারোগে উপকার দর্শে ।

কমলালেবুর সুগন্ধি পাতা চোরাইয়া একপ্রকার অতীব মনোহরগন্ধযুক্ত তরল তৈল প্রস্তুত হয় । তাহাকে "নিরোলি অয়েল" বলে । আঙ্গকালকার বিলাতী বা দেশীয় অধিকাংশ গন্ধ দ্রব্যেই এই তৈলের কিছু না কিছু সংশ্রব থাকে । বৈজ্ঞানিকেরা উহা হইতে 'নিরোলি ক্যাম্ফর' নামক এক প্রকার মহাসুস্বাদি কর্পূর প্রস্তুত করিয়া থাকেন ; উহা উদরাখ্যান অঙ্গীর্ণ প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী ।

কয়েতবেল ।

বাঙ্গালা নাম—কয়েত বা কংবেল ; হিন্দুস্তানী—কোইথ ; ইংরাজী—*Feronia elephantum*. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কপিথস্ত দধিথঃ শ্রাৎ তথা পুস্পফলঃ স্তম্ভঃ । কপিপ্রিয়ো দধিফল স্তম্ভা দস্তশঠোহপি চ ॥ বাঙ্গালা নাম—কপিথ, দধিথ, পুস্পফল, কপিপ্রিয়, দধিফল, দস্তশঠ । ইহার অন্যান্য নাম—গ্রাহী, ময়্যথ, দেবপাদাঢা, মাল্লর, মঙ্গলা, নীলমল্লিকা, চিরপাকী, গ্রন্থিফল, কুচফল, কপীষ্ট, গন্ধফল, দস্তফল, কাঠিলফল, করঞ্জফলক ।

কপিথ বৃক্ষ ভারতের সর্বত্রই জন্মে । প্রায় মহুঘোর ৩৪ গুণ উচ্চ হয় । ফল বেলেগ মত, কিন্তু তদপেক্ষা ছোট ও ধূসর বর্ণ । পাতা অনেকটা কামিনী ফুলের পাতার মত ছোট ও চক্ চকে । ফুল ক্ষুদ্র ও শ্বেতবর্ণ । বর্ষাকালে ইহার কলিকা আবির্ভূত হইয়া ক্রমে ফলের আকারে পরিণত হয় । শীতকালে ফলগুলি পরিপক হয় । বাহির হইতে সহসা পকাপক কিছু বুঝা যায় না, তবে পকাবস্থার হাতে করিলে হালকা বোধ হয় ও আভ্যন্তরের শাঁস মেটে-কাল রং হইয়া যায় ।

কয়েতফলের এইটা বড় আশ্চর্য-জনক শক্তি এই যে, একটা ফল হাতীর উদরস্থ হইলে উহার সারভাগ অদর্শন হইয়া যায়, এবং অখণ্ডিত গোলাকার

আবরণটা মলের সহিত বাহির হইয়া আইসে। তাই কবির উক্তি—
 “নির্জ্জগাম যদা লক্ষ্মীর্গজ্জুককপিথবৎ” অর্থাৎ লক্ষ্মী যখন চলিয়া যান, তখন
 ইস্তিকিত কপিথের ছায়, মানুষ অকস্মাৎ কখন কিরূপে অন্তঃসারহীন
 হইয়া পড়ে, বুঝিতে পারা যায় না।

কপিথমামং সংগ্রাহি কষায়ং লঘু লেখনম্ ।

পকং গুরু ত্বাহিক্কাশমৎ বাতপিত্তজিৎ ।

আদন্নতুবরং কণ্ঠশোধনং গ্রাহি দুর্জ্জরম্ ॥

রস—অন্ন মধুর ও ঐষং কষায় ; বিপাক—অন্ন ; বীৰ্য্য—উষ্ণ ;
 গুণ—অপকাবস্থায় অধিক কষায়ত্বহেতু মলমূত্রধারক, লঘু, দেহের
 রসশোধক। পকাবস্থায় ঐষং গুরুপাক ও দুর্জ্জর, সংকোচক, কণ্ঠশুদ্ধিকর,
 ত্বষ্ণা ও বাতপিত্তনাশক। প্রভাব—হিক্কানাশক।

পকং তু শীতলং বুযং কণ্ঠশুদ্ধিকরং স্মৃতম্ ।

শ্বাসং ক্ষয়ং রক্তপিত্তং বাস্তি বাতং শ্রমং তথা ।

হিক্কাং কাসং নাশয়তি বীজ্জং হৃদযথাপহম্ ।

শীর্ষব্যথাং বিষং চৈব বিসর্পং চাপি নাশয়েৎ ॥

বীজ্জতৈলং চ তুবরং গ্রাহকং স্বাহ পিত্তহুৎ ।

আত্মোবিষং কফং চৈব হিক্কাং বাস্তিঞ্চ নাশয়েৎ ॥

বিষনাশকরং পুষ্পং পৰ্ণং বাস্ত্যতিসারহুৎ ॥ (নিঃ স্ফঃ)

ইহার পক ফল শীতল, বুযা, কণ্ঠশোধক, শ্বাস ক্ষয় ও রক্তপিত্তগ্ন, বমি,
 বাত, শ্রম, হিক্কা ও কাসের উপশমকর। ইহার বীজ হৃদয়-বেদনা, শিরঃ-
 শূল, বিষ ও বিসর্প নাশ করে। বীজের তৈল কষায়-মধুর, সংকোচক,
 মূষিক বিষ নাশক, কফ, হিক্কা ও বাস্তি (বমন) প্রশমক। পুষ্প বিষনাশক।
 পত্র বমি ও অতিসার, প্রতিকারক।

প্রয়োগ—ইহার পত্রের রস, পাকাফলের শাঁস, কচি ফলের কাথ
 ও গাছের ছাল ঔষধার্থ প্রযুক্ত হয়। পাকা ফলের শাঁস ছাড়া পত্রাদি সমস্ত
 অঙ্গই ন্যূনাধিক কষায় ; স্তবরাং সংকোচন-উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।
 কচি পত্রের রস ২ তোলা, পরিষ্কার চিনি সহ সেবন করিলে, বমি ও অতিসার
 নিবারিত হয়। খাঁচী সর্ষপতৈল, দধি, গোলমরিচ চূর্ণ, কাঁচা লঙ্কা, লবণ,

চিনি ও সুপক্ক কয়েংবেলের শাঁস সংযোগে, যে অতি-মধুর চাটনী প্রস্তুত হয়, তাহা মুখরোচক ও অল্পে কচিপ্রদ।

“লাজা কপিথ মধু মাগধিকোষণানাম ।

লেহো ধ্রুবং সকল বর্ম্য কচিপ্রশাস্ত্যে ॥”

খই চূর্ণ, কয়েংবেলের শাঁস, মধু, পিপুল ও মরিচচূর্ণ মিশাইয়া অবলেহ প্রস্তুত করিয়া থাকিলে, সকলপ্রকার বর্মি ও অকচি উপশমিত হয়।

“হিকার্নঃ মধুসংযুক্তং কাশীশং দধিনাম চ”

অর্থাৎ কয়েংবেলের শাঁসের সহিত অল্প হীরাকস মিশাইয়া মধুসহ লেহন করিলে হিকা আরোগ্য হয়।

চূর্ণং পঞ্চ কষায়্যাণং কপিথরসসংযুতম্ ।

কর্ণশ্রাবে প্রশংসস্তি পূরণং মধুনা সহ ॥

অর্থাৎ পঞ্চ কষায় চূর্ণ (আম জাম প্রভৃতি), কয়েংবেলের রস ও মধুর সহিত কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণ হইতে পুঁজাদি নিঃসরণ উপশমিত হয়।

জম্বাত্রপত্রং তরুণং সমাংশং কপিথ কার্পাস ফলঞ্চ সার্দ্রম্ ।

কৃত্বা রসং তং মধুনা বিমিশ্রং শ্রাবাপহং তং শ্রবদস্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥

কচি জামপাতা, কচি আমপাতা, কয়েংবেল, কার্পাসফল ও আদা এই সকলের রস (খেঁংলো করিয়া আঙুনে বলসাদিয়া বাহির করা), মধু মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণের ক্ষত ও পুঁজ পড়া প্রশমিত হয়।

নল্লকী জিঙ্গিনী জম্বু ধবত্বক্ পঞ্চগল্লবৈঃ ।

কষায়ৈঃ সাধিতঃ স্নেহঃ পিচুঃ শ্রাদ্ বিপ্নু তাপহঃ ॥

নল, চোরকাঁচকী, জামছাল, ধবছাল এবং আম, জাম, কয়েংবেল, টাবালেবু ও বেল ইহাদের পত্রের কাথে তৈলপাক করিয়া তুলা সংযোগে ঘোনিতে প্রবিষ্ট করাইলে, বিপ্নু রোগ (নিত্য বেদনায়ুক্ত ঘোনিরোগ বিশেষ) আরোগ্য হয়।

কপিথকুমুকান্নাং সলাজং শর্করায়ুতং ।

সপ্তমে শীততোয়েন গর্ভশূল-নিবারণম্ ॥

সপ্তম মাসে কয়েংবেল, সুপারি মূল, খই ও চিনি শীতল জলের সহিত সেবন করিলে গর্ভশূল (গর্ভশ্রাবের উপক্রমে) নিবারিত হয়।

পত্রৈর্বেদর চাঙ্গেরী কাকমাচী কপিথজৈঃ ।

শিশোরুখ্যমাতীসারনাশনং মূর্ধ্নলোপনম্ ॥

কুলপত্র, আমরুল, কাকমাচী ও কয়েংবেলপত্র বাঢ়িয়া কর্তকে প্রলেপ দিলে শিশুর বমি ও অতিসার নিবারিত হয় ।

কপিথবৃক্ষের কাঠ, গৃহের আসনের প্রস্তুত করিবার বিলক্ষণ উপযোগী । ইহা হইতে এক প্রকার শুভ্রবর্ণ র্দ দিহির হয় ; উহা বোম্বাই অঞ্চলে আম-শূল, মেহ প্রভৃতির ঔষধ রূপে প্রযুক্ত হয় ; অথচ কাগজ প্রভৃতি সংযুক্ত করিবার লক্ষণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

করঞ্জ ।

বঙ্গীলা নাম—করমচী, নাটা বা কাঁটা করঞ্জ, ডালকরঞ্জ বা ডহরকরঞ্জ ; হিন্দী—করোদা, কর জুবা ; ইংরাজী—Carrissa Coromdas & Pongamia Glabra. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—(একঃ) করমর্দঃ পাককৃষ্ণঃ করাম্শচ করাম্বুকঃ । (অত্রঃ) করঞ্জো নক্তমালশ্চ পুস্তিকশ্চিরবিধিকঃ ।

এই গাছ পাঁচ প্রকারের আছে—অন্নকরঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, বিষকরঞ্জ ও মাকড়াকরঞ্জ । প্রথমোক্ত তিন প্রকারই সচরাচর শাস্ত্রোক্ত ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইতেছে ।

(১) অন্নকরঞ্জকে সাধারণ ভাষায় করমচা বলে, ইহা অবশ্য অনেকই দেখিয়াছেন । ইহার গাছ মানুষের মত বা তদপেক্ষা একটু উচ্চ হয় ; ডাল-পালা কণ্টকযুক্ত ; পাতা ছোট ছোট, ভিতর-চওড়া হু'দিকে সরু ; ফল ছোট নারকেলী কুলের মত, কাঁচায় সবুজ রং, পাকিলে ঈষৎ লালের আভাযুক্ত গভীর কালরং হয় । ইহা অত্যন্ত অন্নসাধিত ।

(২) নাটাকরঞ্জের গাছ লতানো হয় ; ভূমির উপরে দাঁড়াইয়া চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে । পাতা, ডাল, ফল সমস্তই কণ্টকময় । খাট মোটা শিমের মত অথচ ক্ষুদ্র কণ্টকাবৃত ফল হয়, তাহার ভিতরে গোল গোল ক্ষুদ্র কুলের আয় মন্থণ ধূসরবর্ণ কঠিন আবরণযুক্ত বীজ থাকে । ইহার শাস অত্যন্ত তিক্ত ।

(৩) ডহরকরঞ্জ প্রায় শির' যোল হাত উন্নত হয় এবং শুঁড়ী প্রায় নারিকেল গাছের মত স্থূল হয়; খাতাগুলি পাকুড় পাতা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট, ফল কচি বাদামের স্থায়। সাধারণ করঞ্জের সহিত ইহার কোনও সাদৃশ্য নাই। ইহাকে পশ্চিম দেশে মহাকরঞ্জও বলে।

অন্নকরঞ্জের গুণ ।

করমর্দফলং চার্দ্ৰম্নং পিত্তকফপ্রদম্ ।

ভেদনং চোক্ষবীৰ্য্যঞ্চ বাতপ্রশমনং শুক্ৰ ।

পকমুক্তং হিতং পিত্তে তন্মূলং ক্রিমিমূং সরম্ ॥ (নিঃ ভূঃ)

কাঁচা করম্চা অতি অন্ন, কফপিত্তজনক, ভেদক, উষ্ণবীৰ্য্য (পিত্তকে বর্দ্ধিত করে এবং সেই বর্দ্ধিত পিত্ত দেহের উষ্ণতা জন্মায়), বায়ুনাশক ও শুক্ৰপাক। পাকা করম্চা পিত্তরোগে হিতকর। অন্ন করম্চার ক্রিমি নাশক ও সারক।

নাটাকরঞ্জের গুণ ।

করঞ্জো জ্বরতৃগ্দোষনাশনং দস্তদার্য্যক্ৰম্ ।

কটুকো ভেদন স্তস্য ফলং নয়নপুষ্পহম্ । (নিঃ ভূঃ)

নাটার ফল, কচি পত্র বা মূল জ্বরনাশক, চক্ষুরোগগ্র, দৃষ্টির দৃঢ়তাকারক (চূর্ণ করিয়া দাঁত মাঞ্জিলে), তিক্তরস, ভেদক, এবং বিশেষতঃ ইহার ফল চক্ষুর ছানির পক্ষে উপকারী।

ডহর করঞ্জের গুণ ।

করঞ্জঃ কটুকস্তীক্ষ্ণো বীৰ্য্যোক্ষো যোনিদোষহম্ ।

কুষ্ঠোদাবৰ্ত্ত শুক্রাশৌ ত্রণ ক্রিমি কফাপহঃ ॥

তৎপত্রং কফবার্তাশঃ ক্রিমিশোথহরং পরম্ ॥ (ভাঃ প্রঃ)

ডালকরঞ্জ তিক্ত, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীৰ্য্য, যোনিরোগহর (ছালের কাথে ধৌতি দ্বারা), কুষ্ঠ, উদাবৰ্ত্ত, শুক্র, অশ, ত্রণ, ক্রিমি ও কফনাশক। ইহার পাতা কফ, বায়ু, অশ, ক্রিমি ও শোথের প্রতিকারক।

প্রয়োগ—অন্নকরঞ্জ রন্ধন করিলে উৎকৃষ্ট মুখরোচক অন্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঔষধপক্ষে ইহা প্রধানতঃ অগ্নিমান্দ্যাধিকারের বটিকা প্রভৃতির

মধ্যে অল্পরসের ভাবনা দিবার জন্ত ব্যবহৃত হয় । নাটাকরঞ্জ, আকন্দ, সিজ, সৌন্দালপত্র ও জাতীপত্র গৌমুত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ, ধবল ও উৎকট চর্মরোগ দূরীভূত হয় ।

নাটাকরঞ্জ এদেশে জ্বর বলিয়া বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ । গৃহের নিকটে এই গাছ থাকিলে গৃহবাসীদিগের জ্বর হইবার আশঙ্কা কম থাকে—এতদূর পর্য্যন্ত লোকের বিশ্বাস । বস্তুর, নাটাবীজের ১ শাঁস ১০ আনা মাত্রায়, ২৩ রতি গোলমরিচ চূর্ণের সহিত ক্লিয়র্দিন সেবন করিলে, পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয় । কাঁচা হরিদ্রা ও কাঁচি নাটার পাতা বাটিয়া গায়ে মাখিলে ব্রণ কণ্ডু প্রভৃতি আরোগ্য হয় ।

ডহরকরঞ্জের প্রয়োগ, শাস্ত্রীয় ঔষধে অপেক্ষাকৃত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা কফ ও পিত্তবিকার, পুরাতন জ্বর, চর্মরোগ, বাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয় । ডহরকরঞ্জ চূর্ণ, শঙ্খভস্ম, লৌহ ও রূপাভস্ম কাঁচার পাত্রে স্তনদ্রবের সহিত লাগাইলে চোখের পাতায় মাংসবৃদ্ধি দূরীভূত হয় ।

ডহরকরঞ্জ বীজ, হরিদ্রা, হীরাকস ও হরিতাল মধুসহ মাড়িয়া প্রলেপদিলে অলস (পাঁকুই) রোগ ভাল হয় । করঞ্জবীজ, ত্রিফলা ও নিমপাতা ঘৃতে সিদ্ধ করিয়া, সেই ঘৃত লাগাইলে শিশুর মলদ্বারের ক্ষত প্রশমিত হয় ।

ডহর করঞ্জ, কৈবর্ত মুখা, আপাং মূল, জাতীপত্র ও করবীর মূল এই সমস্ত কঙ্কের সহিত তৈল পাক করিয়া, মস্তকে মাখিলে টাক রোগ ও খুস্কী আরোগ্য হয় । শুধু করঞ্জবীজ-নিঃসৃত তৈলও চর্মরোগে উপকারী ।

ব্যোমং করঞ্জস্য ফলং হরিদ্রে মূলং সমাবাপ্য চ মাতুলুনাঃ ।

ছায়াবিশুষ্কা শুড়িকা কৃতান্তা হন্যাবিসৃচীং স্কন্দনাঙ্গনেন ॥

শুঠ, পিপুল, মরিচ, ডহর করঞ্জ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গৌড়ালেবুর শিকড় জলে মর্দন করতঃ বাটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ার শুকাইয়া রাখিবে । ইহার অঙ্গন দিলে মুছাঁ প্রভৃতি উপদ্রব সহ বিষচিকা রোগ বিনষ্ট হয় ।

শাক্তোক্ত জ্বরের মুদ্রাঘোটক রস গণিতকুষ্ঠারি রস (কুষ্ঠের) পৃথীমার তৈল ও উপদংশের করঞ্জাদ্য ঘৃতে করঞ্জ আবশ্যক হয় ।

শক্তি-লীলা-ষট্‌কম্ ।

প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বায় সভাপণ্ডিত কাববর বাণেশ্বর বিদ্যা-
লকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঈলোক স্বভাবতঃ কেশ-বন্ধন-প্রিয়
হইলেও কালী কি কারণে কেশবন্ধন না করিয়া ‘এলোকেশী’ মূর্তি ধারণ
করিলেন?” বিদ্যালকার মহাশয় সত্যায় বসিয়া তৎক্ষণাৎ এই মহাভাবপূর্ণ
কবিতাটী রচনা করিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন :—

দেব্যাঃ কেশচয়ো নিরীক্ষ্য ষ্ঠিতিতান্ দেয়ান্ মুনীনু পাদয়োঃ

সন্সারাদ্যতয়া চ তত্র পরমোৎকর্ষং ত্রিদেহাহপতৎ ।

স্বা কালী চরণং গতস্ত শরণং নো বন্ধনং সন্তবেদ্

ইত্যাবেদয়িতুং ববন্ধ ন হি তং তনুক্রকেশী বভৌ ॥ (১)

দেব ঋষি আদি যত যে আছে ষ্ঠায়,
সবাই আসিয়া মার পড়ে রাঙা পায় ;
মাথা হতে দেখি কেশ করিল বিচার-

চরণ ছুথানি মার একমাত্র সার !

কি ফল হইবে আর থাকিয়া মাথায়,
তাই কেশ ছুটে এসে চরণে লুটায় ।

যে জন আশ্রয় করে শ্রীপদ মাতার,
এ ভব-বন্ধন কভু নাহি হয় তার ;—

ত্রিভুগতে এ কথাটী জানাতে সদাই

কেশ না বাধেন মাতা ;—“এলোকেশী” তাই ! (১)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র উক্ত বিদ্যালকার মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন, “কালী
উলঙ্গ হইয়া থাকেন কেন ?” বিদ্যালকার মহাশয়ও তদুত্তরে তৎক্ষণাৎ
কহিলেন :—

গিরীশে প্রত্যাষে নিশি চ দিবসান্তে চ দিবসে
প্রসূভৌ জন্তূনাং জগতি জনয়িত্বি প্রতিদিনম্ ।

পরিব্যাপ্তা বস্ত্রাবরণসময়ং নৈব লভসে

ভবত্যা নাথং ভগবতি ভবতোব স্ততরাম্ ॥ (২)

দ্বিবসে রাত্রিতে পুনঃ প্রত্যাষে সন্ধ্যায়

জগতের মাতা হয়ে, পড়েছ মা ! দায় ।

প্রসব করিছ কত, সীমা নাহি রয়,
কাপড় পরিতে মাগো ! না পাণ্ডু সময় !
তাই বলি, ওমা কালি ! ছেলের গ্যার •
উলঙ্গ হইয়া থাক, লজ্জা কিবা তবয় ! (২)

ভগবতী দ্বিভূজা না হইয়া দশভূজা হইলেন কেন, ইহার কারণ দেখাইয়া
কবি কহিতেছেন :— •

পশুপতে রখিলেমু গলেমু সা যুগপদর্পয়িত্তং কুম্ভমশ্রজম্ ।
পরিণয়ে দ্বিভূজা হিমশৈলজা দশভূজা কিমুজায়ত লীলয়া ॥ (৩)
পার্বতী বিবাহ-কালে শিবের গলায়
আহ্লাদে মাতিয়া পুষ্প-মালা দিতে ধায় ।
একবারে পঞ্চানন-গলে কি করিয়া
ছুটী হাতে মালা দেন, না পান ভাবিয়া ।
দ্বিভূজা না থেকে তাই দশভূজা হয়ে, •
শিবের গুলায় মালা দেন পরাইয়ে ! (৩)

মহাদেব অদ্যাপি ভগবতীর চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন ; ইহার
কারণ কি, তাহা জানাইবার জন্ত কবি কহিতেছেন :—

মাতঃ কালি তবাক্তিব ফুল্লকমলং কৈবল্যদং শীতলং
বিম্বশ্চোন্নসি কালকূটকবলজালাপমুত্তো হরঃ ।
কালগ্রাসবিনাশকারিণি করালান্ত্রে মহেশপ্রিয়ে
সংপ্রাপ্যাতুলনির্বৃতিং কিমু ভয়াদদ্যাপি তন্নোজ্বতি ॥ (৪)

করাল-বদনা কাল-ভয়-বিনাশিনী
মহেশ-মোহিনী মাগো ! পর্ত-নন্দিনী ।
হায় কি অপূর্ব তব চরণ-কমল, •
একে মুক্তিপ্রদ, তায় পরম শীতল ।
তাই-মাগো ! মনে মনে বুঝিয়া শঙ্কর,
চরণ দুখানি তব বক্ষের উপর
রাখিয়া, পরম স্থখে বিভোর হইয়া
দুর্জয় বিবের জালা গিয়াছে ভুলিয়া ।

ছাড়িলে খিষের আলা পাছে বেড়ে, ধার,

অদ্যাপি শঙ্কর তাই ছাড়িতে না চায় ! (৪)

কালী দৈন্ত দারু জিহ্বা কাটিয়া একরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন কেন,
ইহার হেতু দেখাইয়া কবি কহিতেছেন :—

স্বর্গীকসাং স্তুতিগিরাভিনবেন্দুচূড়বক্ষ্যে হিরুচচরণা শরণাগতানাম্ ।

নংগ্রামমুক্তবসনা দশনাগ্রদষ্টনত্র প্রসর্গরবসনাতিহিরেন কাণী ॥ (৫)

দেবতা-গণের হুংথ করিতে বিনশ

অম্বর-বধের হেতু করিয়া প্রয়াস,

উন্নত হইয়া কালী করিলেন রণ,

টলিতে লাগিল ধরা অমনি তখন ।

হলো আজ সর্বনাশ, ভাবি দিগম্বর

পেতে দেন নিজ বক্ষ ধরার উপর ।

চৈতন্ত লভিয়া কালা ভাবেন তখন ;—

কি করিমু ! স্বামি-বক্ষে দিলাম চরণ !

উলাঙ্গ হইয়া পুনঃ পড়িমু হেথায় !

হিব কেটেছেন কালী, তাই ত লজ্জায় ! (৫)

কালী স্বীয় কটিদেশে করশ্রেণী ও গলদেশে মুণ্ডমালা ধারণ করিয়া
থাকেন ; ইহার হেতু নির্দেশ করিয়া কবি কহিতেছেন ;—

বদন্তং ত্ত্র্যাম ক্ষণমপি ভজন্তং তব পদে

জপন্তং বা জন্তং জননি জম্বরন্তং তব মনুম্ ।

চতুর্বাহুং কর্তুং কমপি চতুরাস্তং কমপি কিং

করশ্রেণীকাঞ্চীং বহসি বহমুণ্ডশ্রজমপি ॥ (৬)

ওমা কালি ! তব নাম যে করে স্মরণ,

যে বা সেবে ক্ষণকাল তোমায় চরণ,

যে মন্ত্র জপিলে জন্ম নাহি হয় আর

সে মন্ত্র মুখেতে যায় রহে অনিবার,

হায়রে সংসারে তার নাহি থাকে হুখ,

কারে কর চতুর্ভুজ, কায়ে চতুর্মুখ !

কটিতটে করশ্রেণী, মুণ্ডমালা গলে

তাই মাধো ! ধর তুমি মহা কুতূহলে । (৬)

ঋষিঃ

২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা।

১৩০৬, পৌষ।

চরকীর নীতি ।

ন-সংখ্যাকালমতিপাতয়েৎ—কর্তব্য বিষয়ের জন্ত যে কালটুকু নির্দিষ্ট থাকে, তাহার অপব্যয় করিও না।

নাপরীক্ষিত মভিনিবিশেৎ—অপরীক্ষিত বিষয়ে অর্থাৎ যে কার্যের দোষ বা গুণ, শুভ বা অশুভ পরিণাম অথবা সাধ্যত্ব বা হুঃসাধ্যত্ব বিষয়ে তোমার কিছু জানা নাই, তাহাতে সহসা হস্তক্ষেপ করিও না।

নেন্দ্রিয়বশংগঃ স্যাৎ—ইন্দ্রিয়ের বশগামী হইও না; যথাস্থানে যথা-প্রয়োজন পঞ্চেন্দ্রিয় পরিচালনা কর, তাহাতে দোষ নাই; কিন্তু, মনের উপরে আধিপত্য টুকু হারাইয়া, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অবিরত স্বয়ং পরিচালিত হইও না। চক্ষুঃ কর্ণ ভ্রুগাদি কোনও ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তুর যখন রসাস্বাদন করিবে, তখন ইচ্ছামাত্রেই বিরত হইতে পার এই শক্তিটুকু যেন তোমার হাতে থাকে। শক্তিহীনের স্রায় স্রোতে গা ঢালিয়া দিও না।

ন চঞ্চলং মনোনুভ্রাময়েৎ—মন যখন চঞ্চল হইয়া বিশৃঙ্খলভাবে নানা দিকে ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন সেই বিভ্রান্ত মনকে যেন সেই সেই দিকে আরও ঠেলিয়া দিও না।

ন বুদ্ধীন্দ্রিয়াণামতিভারমাদধ্যাৎ—তোমার বুদ্ধি ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গণের বত টুকু শক্তি, তদতিরিক্ত পরিচালনা দ্বারা তাহাদিগকে অতিভায়া-ক্রান্ত করিও না।

ন চাতিদীর্ঘসূত্রী স্ত্রীং—মনঃস্থ ও অভিতপ্রত কার্যের সম্পাদন-
কালক্কে জ্ঞানশ্রবণতঃ ক্রমেই ঐত্তরোত্তর ভবিষ্যৎ-গর্ভে ফেলিও না । (ক্রমশঃ)

গান্ধীর্ষ্য ।

গান্ধীর্ষ্য ক্ষুদ্র কীট হইতে অনন্ত প্রকৃতি পর্য্যন্ত সকল বস্তুতেই দেখিতে
পাওয়া যায় । বৃহত্তর গান্ধীর্ষ্য সর্কামুমেয় এবং মানব-হৃদয়ের উপর
অধিকতর আধিপত্য বিস্তারক ; ক্ষুদ্র পদার্থের সামান্য গান্ধীর্ষ্যকে তৎপার্শ্ব-
স্থিত বহু পদার্থের চঞ্চলতা চঞ্চলতার পরিবর্তিত করে, মানুষকে সহজে
অনুভব করিতে দেয় না ।

যখন মধ্যাহ্নে প্রকৃতি গান্ধীর্ষ্যের তানে বাঁধা থাকে, জগৎ নিশ্চেষ্ট হয়,
সংজ্ঞায়ুক্ত হইয়াও অলসতার বিজড়িত হয়, কর্মশূন্য হইয়া পড়ে ; জগতের
বৃত্তি নিচয়ের সংশোধক তন্ত্রী পরস্পর পঞ্চমস্বরে থাকিয়া যায় গান্ধীর্ষ্যের
নিঃশব্দ তালে বাঁধা পড়ে । পক্ষীর অবিরাম নাদী কণ্ঠ, বৃক্ষ পত্রের অবিরাম
মর্ম্মর শব্দ—সেই এক তালে বাঁধা । বায়ু নিশ্চল নিঃশব্দ জীবন্ত, সূর্য্য
ধীরে ধীরে অনন্তমানে আপন পথে, অন্তান্ত গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যের পশ্চাতে
তাহার গান্ধীর্ষ্য দেখিয়া চিত্র পুত্তিলকাবৎ—তারাত্ত সেই একতানে বাঁধা ।
পুষ্প তন্দ্রাভিভূত, স্কৃতিহীন, স্রিয়মাণ । জগতের বৃহত্তম গ্রহ উপগ্রহ হইতে
ভূগকোষ মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত সেই একতানে বাঁধা পড়িয়াছে ।
প্রকৃতির জড়তা মনুষ্যের স্বচ্ছকু মধ্য দিয়া হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়, মনুষ্য-
প্রাণ সেই তানে বাঁধা পড়ে । ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র চৈতন্য অনন্ত চৈতন্তের
সহিত সাম্য রাখে, সম্পূর্ণ উদাসীন হয়, স্রষ্টা ভুলে, সৃষ্টি ভুলে, আপন ভুলে,
অপর ভুলে,—গন্থীর উদাসীন্তের ছবি সর্বত্র বিদ্যমান ।

প্রভাতের নবীন সূর্য্য অমুরংগে সোহাগের করে দীর্ঘিকার কমল উন্মেষ
করে, তরঙ্গের শীর্ষককে সূর্য্যপাতে মুড়িয়া দেয়, জগৎপ্রাণ মনুষ্যপ্রাণে
কার্যের লহর তুলিয়া দেয় ; সাক্ষ্য রবি বিদায়কালে আকাশকে অলঙ্কারে
সাজায় ; প্রভাতের বাতাসও প্রেমিকের মত সোহাগ করে, ফুলের দামের
কাছে “ভয় নাই আমি সন্ধ্যাকালে আবার আসিব” বলিয়া আদর করে,

ফুলও সকল ভুলিয়া আনন্দের পাপ্‌ড়ী ছড়ায়, ফুলের গন্ধ মানুষকে বিলাস, মানুষ হাসে, সে হাসিতে ফুল আরও হাসে, বাতাস একজনের কথা অপূরণকে বলে, সে কভু কাঁদে, কভু হাসে, বাতাস আপন মনে নিজের খেলায়, একটা লতাকে একটা বৃক্ষে ফেলিয়া দেয়, বৃক্ষ প্রত্যাখ্যান করে, বাতাস ক্রৌড়াশীল বালকের ছায় হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায় । বাতাস মানুষ নয়, সে তাহার কথা রাখে, সন্ধ্যাকালে স্নানবার আনিয়া, আবার ফুল হাসিল, আবার মানুষ জুড়াইল, কিন্তু মধ্যাহ্ন সূর্য্যের গম্ভীর ভাবে, বাতাস ফুলের কথা ভুলে যায়, রক্তরস ভুলে যায়, সেই গম্ভীর ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ গান্ধীর্ষ্যময় ।

নিশীথে জগৎ সুপ্ত, মধ্যাহ্নের অলসতার বিজড়িত নিস্তেজ ভাব নহে, এখন সংজ্ঞাশূন্য তাই নিস্তেজ, মধ্যাহ্নের অলসতার প্রভাতের কার্য্য-পন-স্পরার যে স্মৃতি থাকে এখন সে স্মৃতি পর্য্যন্ত নাই, নিশীথের ভাব অলসভাব নয়, শাস্ত্য । নিশীথকালে চিন্তার প্রশস্ত সময় । চিন্তাবিদগ্ন প্রাণ পৃথিবী পানে চাহিয়া সর্বত্র শাস্তির ছবি দেখে, চতুর্দিক শান্তিময় দেখিয়া নিজ মনের অশান্তি বিগুণ জলিয়া উঠে, চাহিয়া চাহিয়া শান্তিমূর্ত্তি দেখে, কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়, পুনঃ চিন্তার স্রোত বিগুণবেগে প্রধাবিত হয়, চিন্তার মধ্যে কোনও পদার্থের শাস্তিমাথা ছবি দেখিলে বৈষম্য জাগিয়া উঠে ; পুনঃ অধীর হয়, অস্থির হয়, অশান্ত হয় । আকাশে তাহার মনের ছবি দেখিতে পায়, ক্ষুদ্র-তম জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে বৃহত্তম পর্য্যন্ত স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপ্ত, সকলই কর্ম্মযুক্ত, স্তরায় অধীর অস্থির অশান্ত । একটা নক্ষত্র অপরাটের পাশে চাহিয়া নেত্রপ্রাপ্ত সঙ্কুচিত করিতেছে—বুঝি এ প্রেমের দেখা ! মনুষ্যপ্রাণ আকাশেও প্রেমের খেলা দেখিয়া নয়ন অপসারিত করে, আর আকাশ পানে চায় না । নিশীথের গান্ধীর্ষ্য দেখিলে স্রষ্টার বিরাট মূর্ত্তি মনে পড়ে । কচিং শৃগালের ফুৎকারে, ঝিল্লীর আরাবে, পিচকের নাদে এ শাস্তির কিছুই অশান্তি হয় না, বিরাট শাস্তির তাত্‌কালিক স্থিরতা হেরিয়া জাগ্রত অবস্থার স্বপ্ন-দৃষ্ট ভয়ের ছায় এই সকল সামান্য উপদ্রবকে অনায়াসে উপেক্ষা করা যাইতে পারে ।

লিখন-পঠনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময়, পাতলা কাগজ-পত্রগুলির বায়ুকর্ভুক সঞ্চালন বা অপসারণ নিবারণ-মানসে আমরা তৎসমুদায়ের উপরে

একটা প্রস্তরগোলক অবস্থাপিত করি,—কর্তব্যোন্মুখ মনের পক্ষে গান্ধীর্ষ্যও সেই ভাব-স্বরূপ। ফলতঃ গান্ধীর্ষ্য মনঃক্ষেত্রের বৈষম্য-বন্ধুরতা বিদূরিত করিয়া চিন্তাকে সচ্চিন্তা, অন্তর্দৃষ্টি, বিবেকিতা, বিনয় শ্রদ্ধতি সদৃশের আবাস-যোগ্য করিয়া তুলে। তাই, কবি লিখিয়াছেন—

তরলতা ত্যজি জল ব্যঞ্ছ হয়েচে বাই,
অমনি সে শুভ্রবর্ণ আর মলিনতা নাই ।
অনায়াসে ভেদ্য ইহা নাহি ত এখন ঝং,
সংসর্গ হয়েচে এর অতি প্রিয় সুখাধার ।
আরো দেখাওবে ইহা জলোপরি ভাসমান,
স্বজাতি-সমাজে যেন পেয়েছে সর্বোচ্চস্থান,
“এক তরলতা গেলে এত গুণ ক্রমে আসে”
বরফ হইয়া, জল তাই যেন উপদেশে ॥ শ্রীএককড়ি দে ।

স্বামী ও স্ত্রী ।

সরসী রূপিণী নারী,

স্বামী তায় স্ফুটিত কমলা

আকাশের চাঁদ সে গো,

স্বামী তার চন্দ্রিকা বিমল ॥ (১)

প্রফুল্ল-প্রহ্নন নারী,

স্বামী তার আলো করা হাসি ।

সোণার প্রদীপ সে গো,

স্বামী তার স্নিগ্ধ তেজোরশি ॥ (২)

মৃতদেহ সম নারী,

স্বামী তায় জীবন যৌবন ।

শুক্লিসম নারী হাস,

স্বামী তায় মুকুতা রতন ॥ (৩)

ঐ বিশ্ব মাঝারে সতী, পতি-পদ-সার ।

পতি বিনা অস্ত গতি নাই অবলার ॥ (৪)

শ্রীচারুচন্দ্র রায় ।

দ্রব্যগুণ বিচার ।

করবীর ।

বাঙ্গালা নাম—করবী ; হিন্দী—কনৈলী বা কনের ; ইংরাজী—Nerum odorum. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—করবীরঃ শ্বেতপুষ্পঃ শতকুম্ভো হৃদ্যমারকঃ । দ্বিতীয়ো রক্তপুষ্পশ চণ্ডাভৌ লগুড় স্তথা । সংস্কৃত নাম—করবীর, শ্বেতপুষ্প, শতকুম্ভ, অম্বমারক ; অগ্রনাম—প্রতিহাস, প্রচণ্ড, বীর, কুম্ভ, স্থলকুম্ভদ. দিব্য-পুষ্প, হরিপ্রিয়, গৌরীপুষ্প ।

করবীর গাছ অনেকেই দেখিয়াছেন ; যেহেতু, ইহার পুষ্প নয়ন-রঞ্জক বলিয়া অনেকেই বাড়ীর পার্শ্বে বা বাগানে রোপণ করিয়া থাকেন । এই গাছ মনুষ্যের অপেক্ষা কিছু উচ্চ হয়, ডাল লম্বা লম্বা, পাতা সরু ও দীর্ঘ । পুষ্পের বর্ণভেদে ইহা পাঁচ প্রকারের আছে ; শাস্ত্র বচন বর্ণনা—“হয়ারিঃ পঞ্চধা প্রোক্তঃ শ্বেতো রক্তশ্চ পাটলঃ । পীতঃ কৃষ্ণঃ সমুদ্ভিদ্বিঃ শ্বেতশ্চৈতান্ শুগান্ শৃণু ॥” শ্বেত, লোহিত, পাটল, পীত ও কৃষ্ণ শাস্ত্রোক্ত এই পঞ্চপ্রকারের মধ্যে পাটল ও কৃষ্ণবর্ণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না । এই বৃক্ষ সপ্ত উপবিষের মধ্যে একতম, তীক্ষ্ণতায় ধুস্তর, অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উন । শ্বেতকরবীর গুণ—

কটুস্তিক্তশ্চ তুবর স্তীক্ষ্ণা বীর্যেণ চোষ্ণদঃ ।

ব্রণলাঘবক্লম্নেত্রকোপ কুষ্ঠ বিষাপহঃ ।

কফার্শঃ ক্রিমিকণ্ডুয়ো ভক্ষিতো বিষবন্মতঃ ।

রক্তবর্ণঃ শোধকঃ শ্ৰাৎ কটুঃ পাকে চ তিক্তকঃ ॥

কুষ্ঠাদি নাশকো লেপাদথ পাটলবর্ণকঃ ।

শীর্ষপীড়াং কফং বাতং নাশয়েদिति কীর্তিতঃ ॥

রক্তাদেশ্চতুরো ভেদান্ বিদ্যাৎ শ্বেতহয়ারিবৎ ॥

(শ্বেতকরবীর) রস—কটুতিক্ত কষায় ; বিপাক—কটু ; বীর্য—তীক্ষ্ণ ; গুণ—দেহের উত্তাপজনক, ব্রণশোধক, কুষ্ঠঘ্ন, বিষহর, কফ ক্রিমি ও কণ্ডু-নাশক, উদীরস্থ হইলে বিষবৎ কার্য করে । প্রভাব—নেত্রকোপহর ও

অর্শোনাশক । ইহা ক্রিমিনাশক 'উক্ত হইল, অথচ ভক্ষণেও বিষক্রিয়া করে,—ইহার মীমাংসা কি ? ক্রিমি রোগাধিকারের শাস্ত্রোক্ত ঔষধ সমূহের মধ্যে—দেখিবে, কয়েকটির মধ্যে (কুঁড়ল ও মনঃশিলা প্রভৃতি) বিষের প্রয়োগ আছে । এইরূপ করবীর-ঋষিও ক্রিমিনাশক ; কিন্তু, লৌকিক ব্যবহার ধরিতে গেলে, উদরস্থ ক্রিমিনাশের জন্য এই বিষ সেবন না করাই ভাল ; যেহেতু, ক্রিমির অস্ত্রান্ত্র মূহ ঔষধও ত আছে । বাহ্যক্রিমি (অর্থাৎ ক্ষতের ভিতরে যে গুলি জন্মে তাহাদের) বিনাশের জন্য ইহার প্রলেপ বিশেষ উপকারী অথচ আশঙ্কাহীন, সুতরাং এস্থলে ক্রিমিহর অর্থে বাহ্যক্রিমিহর বুঝাই উচিত ।

লোহিতবর্ণ করবীর—মলভেদক ও বমিকারক ; ইহা তিক্তরস ও পাকে কটু । ইহা আভ্যন্তরিক প্রয়োগের উপযোগী নহে, কেবল বাহ্য প্রলেপে কুষ্ঠাদি নাশক হইয়া থাকে ।

পাটলবর্ণ করবীর—শিরঃপীড়া নাশক ও কক্ষবাতঘ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ । সংক্ষেপে, লোহিতাদি চারিপ্রকার করবীরেরই গুণ প্রায় খেতকরবীর তুল্য । বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই । কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে, চিকিৎসা শাস্ত্রে যেখানে শুধু করবীর লিখিত আছে, সেখানে খেতকরবীরই বুদ্ধিতে হইবে ।

একটী বিবেচ্য কথা—বঙ্গদেশে 'কল্কে ফুল' বা 'ঘণ্টাকরবী' নামে যে এক প্রকার বৃক্ষ দৃষ্ট হয়, তাহার পাতা করবীর পাতারই মত । গাছ অপেক্ষাকৃত বড় ও বিস্তীর্ণ হয় ; ফুল সুন্দর হরিদ্রাবর্ণ, দেখিতে ক্ষুদ্র ঘণ্টা বা কল্কে (ছ'কার উপরিস্থ কল্কে) ন্যায় । এই বৃক্ষের ডাল পাতা মূল প্রভৃতি সর্বাঙ্গই বিষাক্ত ; বিশেষতঃ, ইহার ফল অধিকতর বিষাক্ত । ফলগুলি দেখিতে অনেকটা স্বক্বর্জিত শৃঙ্গাটকের (পানিফলের) তুল্য । আয়ুর্বেদে এই বৃক্ষের পৃথক্ উল্লেখ না থাকায় এবং ইহার করবীর-সহ আকৃতি ও বিষাক্ততা বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায়, আমাদের বিশ্বাস—উক্ত শ্লোকে যে পীত করবীরের উল্লেখ আছে, তাহা ইহাই—অথ' কিছু নহে । এই বৃক্ষের ফল অত্যন্ত বিষাক্ত ; ইহার মূলের ছাল ক্ষতরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

প্রয়োগ—সকলপ্রকার করবীর মূল, ছাল এবং পত্র (কখন কখন পুষ্পও) ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহার যত শক্তি উল্লিখিত হইয়াছে,

তন্মধ্যে কুষ্ঠহর শক্তিই প্রধান । ইহা আভ্যন্তরীণ বাহ্য এই উভয় প্রয়োগেই কুষ্ঠাদি নানা প্রকার অত্যাৎকট চর্মরোগের প্রতিকারী । ইহার দ্বিতীয় শক্তি জ্বরনাশন । তৃতীয় বাতব্যাথা, ব্রণশোধ ও নেত্রকোপন প্রশমন ।

ক্ষতনাশক মুষ্টিযোগ—শ্বেতকরবীর শিকড়, শুনাচূর্ণ, মেটে সিঁদূর, নিম-পাতা ও কর্পূর একত্রে তাত্রপাত্রে ঘৃতসহ সিদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিলে, নানা প্রকার দূষিতপচা বা, এমন কি গরমী বাও আরোগ্য হয় । শ্বেতকরবীর মূলের রস ১৬ তোলা, গব্যহৃৎ ৬৪ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া উহা দ্বারা দধি প্রস্তুত করিবে । পরে ঐ দধি মছন পূর্বক নবনীত উদ্ধৃত করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে, বহুকালীয় হ্রাসাধ্য ক্ষত ও বিণ্ডক ও দুরীভূত হয় ।

করবীরের ডালে সাবধানে (অর্থাৎ চোক না গিলিয়া) দাঁতন করিলে, মুখরোগ ও দন্তরোগ আরোগ্য হয় ; শাস্ত্রোক্তি যথা—

“করঞ্জ করবীরার্ক মালতী ককুভাশনুঃ ।

শস্ত্রস্তু-দন্তপবনে যে চাপ্যোবংবিধা ক্রমাঃ ॥”

কুষ্ঠহরযোগ—করবীরছাল চূর্ণ, মনঃশিলা ও হরিতাল একত্র ঘৃতসহ মাড়িয়া প্রলেপ দিবে । জ্বর নাশক যোগ—শ্বেতকরবীর ছাল চূর্ণ ও শোধিত মনঃশিলা সমভাগে বকফুলের রসে মাড়িয়া, মটর প্রমাণ বড়ী করিয়া খাওয়াইলে, পালাজ্বর ও কৃষ্ণজ্বর আরোগ্য হয় ।

বাতহর মুষ্টিযোগ—করবীর পাতা সৈন্ধবসহ বাতের ফোলায় উপরে প্রলেপ দিলে উহার উপশম হয় । এবং শ্বেত করবীর ছাল চূর্ণ অকিন্দ্রের আঠায় মাড়িয়া, মটর প্রমাণ বড়ী করিয়া, আধ ছটাক গরুর চোণাসহ নিত্য প্লাতঃকালে গিলিয়া খাইলে, বাত উপশমিত হয় । নেত্রকোপ নাশক প্রক্রিয়া—চোখের মধ্যে রক্তাচ্ছন্ন স্ফীতি, প্রদাহ বা ক্লিন্নভাব হইলে, শ্বেতকরবীর পাতার রস জল মিশাইয়া চোখে ফোট দিলে বিশেষ উপকার হয় ।

মাত্রা—শ্বেত করবীর মূলের বা গাছের শুষ্ক ছাল চূর্ণের আভ্যন্তরিক মাত্রা ২ হইতে ৩ রতি পর্য্যন্ত । ইহা হইতে বতই অধিক হইবে, ততই দেহের গ্নানি, অবশেষে অতিমাত্রায় বিবক্রিয়া উপস্থিত হয় । বাহ্যপ্রয়োগে মাত্রার তারতম্যে হানি নাই, তবে মস্তিষ্কের নিকটবর্তী স্থানে দিতে হইলে, অত্যন্ন পরিমাণে লেপ দেওয়া উচিত ।

শ্বেতাকর্করবীরঞ্চ অশ্বিত্রাং মূলমুচ্ছারং ॥

তণ্ডুলোদকপানিন পৃথক্ চাতুর্থনাশনম্ ॥ ভৈঃ রঃ

অর্থাৎ অশ্বিনী ঋক্রে শ্বেত ঋকন্দ কিম্বা শ্বেতকরবীর মূল তুলিমা (কাঁচায় ৬ রতি মাত্রা) চপলুনি জলদ্বিহ বাঁটিয়া সেবন করিলে, চাতুর্থক জ্বর নিবারিত হয় ।

রক্ত করবীর পুষ্পং জাত্যাশ্বখাশন মল্লিকাশচ ।

এতৈঃ সমন্বৈস্তৈলং নাসার্শোনাশনং পকম্ ॥

অর্থাৎ লাল করবীর ফুল, জাতিফুল, অশনপুষ্প ও মল্লিকাপুষ্প প্রত্যেক ১ তোলা, তৈল এক পোয়া, যথাবিধি পাক করিয়া নশ্র লইলে নাসার্শঃ (Polypus) উপশমিত হয় । এরূপ লৌকিক বিশ্বাস আছে—শ্বেত করবীর ডালের লাঠী প্রস্তুত করিয়া হাতে করিয়া বেড়াইলে সর্পভয় থাকে না ।

শ্বেতকরবীর মূল যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইলে গর্ভিনীর গর্ভপাত হয় ।

স্নিগ্ধপাত-জরের উত্রৈলোক্যচিস্তামণি গলগণ্ডের “গুঞ্জাদাতৈল” ভগন্দরের “করবীরাদ্য তৈল” কঠের “বিষতৈল” “মরিচাদি” “সোমরাজী” ও “করবীর তৈলে” করবীর আবশ্যক হয় ।

করলা ।

বান্দালা নাম—করলা বা করেলা, উচ্ছে ; হিন্দী—করোলী ; ইংরাজী Momardica Charansia. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কারবেল্লং কঠিল্লং শ্রাং কারবেল্লী ভতো লঘুঃ । সংস্কৃত নাম—কারবেল্ল, কঠিল । অগ্রনাম—কঠিল্লক, সুষবী, শুষবী, কারবেল্লক, উদ্ধাসিত, তোয়বল্লী, কণ্ডুর, কাণ্ডকটুক, স্কৃকাণ্ড, উগ্রকাণ্ড, নাসাসংবেদন, পটু । ক্ষুদ্রে উচ্ছের সংস্কৃত নাম—কারবেল্লী । ইহা সচরাচর ‘উচ্ছে’ নামেই প্রসিদ্ধ, কেহ কেহ ‘পুটলে উচ্ছেও বলিয়া থাকে ।

উভয় প্রকার উচ্ছেই ভারতের প্রায় সর্বত্রই জন্মিয়া থাকে । করলা উচ্ছে সচরাচর ১০।১২ অঙ্গুলি দীর্ঘ হইয়া থাকে । উর্ধ্বরা ভূমি হইলে ১৭।১৮ অঙ্গুলি পর্যন্ত হইতে দেখা যায় । কিন্তু, খুদ্রে উচ্ছে প্রায়ই ৩।৪ আঙুলের বড় হয় না ।

কারবেঃ হিমং তেদি লঘু তিত্তমীভালম্ ।

জরপিত্তকফাজরং পাণ্ডু মেহক্রিমীন্ হরেৎ ॥

তদগুণা কারবেয়া স্তাদ্ বিশেষাদীপনী লঘুঃ ॥ ভাঃ প্রঃ ॥

(করলার) রস—তিত্ত ; বিপ্লাক—কটু ; বীৰ্য্য—শীত ; গুণ—
কফপিত্ত নাশক, বায়ুর অবিরোধী, লঘু, জর পাণ্ডু ও ক্রিমি (তিত্তহেতু)
নাশক। প্রভাব—ভেদক, মেহনাশক। উচ্ছের গুণাদি করলার স্থায় ;
বিশেষতঃ, ইহা অগ্নিদীপক ও করলা অপেক্ষাও লঘু।

প্রয়োগ—করলা উচ্ছে ও পুটিলে উচ্ছের মূল, পাতা, ফল, ফুল
প্রভৃতি সমস্তই ঔষধ বা পথ্যরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কল—উৎকৃষ্ট তর-
কারী ; তিত্ত বলিয়া সকলের পিত্ত না হইলেও ইহার কফপিত্ত নাশক, কচি ও
বলকারক গুণ থাকতে, জরাস্ত্রে তৃষ্ণার ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপযোগী।
ইহার ফুল—ধারক ও রক্তপিত্ত নাশক। রক্তপিত্তরোগে দ্রুত সৈন্ধব মুক্ত
করলা কুলের তরকারী খাওয়ার ব্যবস্থা করিলে পথ্য ও ঔষধ উভয় উদ্দেশ্যই
সাধিত হয়।

উচ্ছেপাতার রস আধছটাক, একটু গরম করিয়া ১০ আনা বিটলবণ
সংযোগে পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। শুষ্ক বস্তার প্রলেপে ক্ষত শীঘ্রই
আরোগ্য হয়। মিমপাতার অভাবে ইহার শুষ্ক পাতালতা-মুদ্র জলে বা
ধোওয়ান চলিতে পারে। পাতার রস জরয়। কৃবিরাছগণ পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে
অত্র ঔষধের অল্পপান রূপে ব্যবহার করিয়া পাকেন। পুরাতন জ্বরেও ইহার
প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অনেক পালাজ্বরের ঔষধে ইহার রসের ভাবনা
আবশ্যক হয়।

“স্বধনীমূললেপেন প্রবিষ্টা তু বহির্ভবেৎ ।”

অর্থাৎ করলার মূল জলে-বাটিয়া প্রলেপ দিলে প্রবিষ্টে ঘোনি বহির্গত হয়।

স্বধনী পত্রনির্ধ্যাসং হরিদ্রাচূর্ণ সংযুতম্ ।

রোমাণ্ডী জর বিস্ফোট মসুরী শাস্ত্রে পিবেৎ ॥

করলা পত্রের রস, হরিদ্রাচূর্ণ সহ সেবন করিলে, হামজ্বর, বিস্ফোট ও
বসন্ত উপশান্ত হয়।

স্বষবীপত্র পত্রী কর্ণমোট কুঠারকাঃ ।।

পৃথগেতে প্রলেপেণ গন্তীরত্রণরোপনাঃ ॥ .

করলা পাতা, শালিঞ্চশাক, কর্ণমোট ও কুঠারক এই কয়েটির কোন একটা বাটির প্রলেপ দিলে শীত্ৰইত্রণ আরোগ্য হয় ।

নবজ্বরের বৈদ্যনাথ বটা, জীর্ণজ্বরের শীতারি রস, বিদ্যাবল্লভ রস, প্রভৃতি ঔষধে উচ্ছে পাতার রসের প্রয়োজন হয় ।°

কচুর ।

ষাঙ্গালা নাম—কচুর বা শচী ; হিন্দী—কচুর ; ইংরাজী—Curouma Gedoaria ; সংস্কৃত;পর্যায়ঃ—কচুরো বেধমুখাশ্চ দ্রাবিড়ঃ কল্পকঃ শচী । সংস্কৃত নাম—কচুর বেধমুখা, দ্রাবিড়, কল্পক, শচী । অত্র নাম—কর্শা, কাশ্যা, দুর্লভ, গন্ধমূলক, গন্ধসার, জটাল ।

ইহা একপ্রকার স্মার্দ্রক জাতীয় গাছের মূল । মৃত্তিকামধ্য হইতে উত্তোলন পূর্বক ধুইয়া চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া শুকাইয়া বিক্রয়ার্থ বণিকের দোকানে রক্ষিত হয় ।

কচুরো দীপনো রুচ্যঃ কটুকস্তিক্ত এব চ ।

স্বগন্ধিঃ কটুপাকঃ শ্রাৎ কুষ্ঠাশৌ ত্রণ কাসহৃৎ ।

উষ্ণো লঘুঃ হরেচ্ছাসং গুল্ম বাত কৃফ কুমীন্ ॥ ভাঃ প্রঃ ।

রোচনো দীপনো হৃদ্যঃ স্বগন্ধিস্তগ্ণবিবর্জিতঃ ।

কচুরঃ কফবাতন্ত্রঃ শ্বাস হিক্কাশমাং হিতঃ ॥ চরক ।

রস—কটু তিক্ত ; বিপাক—কটু ; বীর্য্য—উষ্ণ ; গুণ—অমি-দীপক, রুচিকারক, লঘু, স্বগন্ধি, বাতশ্লেষ্মহর, ত্রণ, শ্বাস, কাস ও ক্রিমিরোগ নাশক । ইহা শুষ্কীর সমগুণ । প্রভাব—কুষ্ঠ, অর্শ ও গুল্ম নাশক ।

প্রয়োগ—ইহা প্রাধানতঃ কাসরোগে ও বাতব্যাধির নানাবিধ তৈলে, জ্বর ও অন্ত্র অনেক রোগের পাচনাদিতে এবং গৃহস্থগণ কৃত সাধারণ স্বগন্ধি তৈলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

কর্ণিকার ।

বান্ধালা নাম—কর্ণিকার বা ছোট সোঁদাল; হিন্দী—লঘু বাহবা; ইংরাজী—Species of Cassia; সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কর্ণিকারঃ পরিব্যাধঃ পাদপোৎপল ইত্যপি। সংস্কৃত নাম—কর্ণিকার, পরিব্যাধ, পাদপোৎপল। অল্প নাম—ক্রমোৎপল, বৃক্ষোৎপল। ইহা একপ্রকার সোঁদালজাতীয় বৃক্ষ, পুষ্পপত্রাদি অপেক্ষাকৃত ছোট, বৃক্ষও সাধারণ সোঁদাল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

কর্ণিকারঃ কটুস্তিক্তস্তবরঃ শোধনো লঘুঃ ।

রজনঃ স্তম্ভদঃ শোধনেন্নয়াশ্র ব্রণ কৃষ্টজিৎ ॥ ভাঃ প্রঃ ।

রস—কটু তিক্ত কষায়; বিপাক—কটু; বীৰ্য—উষ্ণ; গুণ—কফনাশক, লঘু, রজন, স্তম্ভদেয়, শোধনাশক। প্রভাব—মলশোধক, ব্রণ, কৃষ্ট ও রক্তগত রোগনাশক।

প্রয়োগ—সাঁদালর ত্রায়; কালিদাসকৃত গ্রন্থে ইহার পুষ্প সাতিশর শ্রিয়দর্শন বলিয়া বর্ণিত আছে; সাধারণ ঔষধাধিতে ইহার প্রয়োগ কম।

কর্দম ।

বান্ধালা—কাদা; হিন্দী—কাদো; ইংরাজী—Clay; সংস্কৃত—কর্দমঃ পঙ্কঃ মৃৎ ইত্যাদি।

মৃত্তিকা জল-মিশ্রিত ও মর্দিত হইলেই কর্দম হয়, কিন্তু এস্থলে ঔষধ-শক্তিদ্বারা যে কর্দমের উল্লেখ হইতেছে, তাহা ঐরূপ অবস্থাপন্ন মৃত্তিকা পৃথিবী (বাসী) হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দিনে সূর্য্যকিরণ ও রাত্রে চন্দ্র-রশ্মির বিকীরণ হেতু উহাতে শ্ৰেণাস্তর উৎপন্ন হয়। কৃত্রিম ও স্বাভাবিক ভেদে কর্দম দুই প্রকারে উদ্ভূত হয়। প্রথম, মনুষ্যকর্তৃক জলক্ষেপ ও হস্তালোড়ন দ্বারা যে কোনও স্থানে উৎপাদিত হয়। দ্বিতীয়, বর্ষাকালে ধরাতেলে বৃষ্টিপাত ও তদুপরি গো-মনুষ্যাদির পদ নিপীড়ন দ্বারা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। শেষোক্ত কর্দমেই ঔষধীয় শক্তি অধিক আছে। মৃত্তিকা-শব্দ চলিতভাষায় ভুল্লেখ্যচক; এরূপ লৌকিক উক্তি প্রচলিত আছে—“কার্য্য মাটি হইল বা

মাটির দরে পাওয়া” ; সুতরাং ‘মাটিতে ঔষধীয় শক্তি, একথা শুনিলে সহসা বিশ্বয়কর বোধ হইতে পারে, কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত, যে মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিয়া অগণিত উদ্ভিজ্জাদি নিজ নিজ অপূর্ণ শক্তিনিচয় সংগ্রহ করিতেছে তাহাতে শক্তির অভাব কেমন হইবে? মৃত্তিকা “ক্ষিত্যপ্ তেষো-মরুদ্ব্যোম” এই পঞ্চভূতের অগ্রগণ্য; ইহাতে অস্ত্রাত্ত ভূতের অংশও আছে—সোজাকথায় মাটিতে জল, তেজঃ, মরুৎও রহিয়াছে। পাশ্চাত্যমতে— এক মৃত্তিকা ভিন্ন চারিটির অধিক মৌলিক পদার্থের সংযোগে গঠিত পদার্থ অতীব বিরল। উক্ত মতে, মৃত্তিকার গঠনোপকরণ চতুর্দশটি মৌলিক পদার্থ, তন্মধ্যে আটটি বাষ্পীয় প্রভৃতি নানাবিধাত্মক এবং ছয়টি ধাতব পদার্থ।

কর্দমো দাহপিভার্তি শোথয়ঃ শীতলঃ সরঃ ।

কর্দমের রস—স্থানভেদে মধুর, লবণাক্ত ও কষায় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কষায় বায়ুর, লবণাক্ত পিত্তের এবং মধুর মৃত্তিকা কফের প্রকোপক হইয়া থাকে। উক্তি আছে—“কষায় মারুতং পিত্ত মূষরা মধুরা কফম্।” বীৰ্য্য—শীতল; গুণ—দাহ, পিত্তরোগ ও শোথয় এবং সারক। দাহয় অর্থাৎ শৈত্যবশতঃ ইহার প্রলেপ দেহগত বা অঙ্গগত জ্বালা নিবারণ করিতে সমর্থ। পিত্তরোগয় অর্থাৎ ইহার বাহুপ্রয়োগ ভ্রাজকপিত্তের প্রশমক বলিয়া তুজ্জনিত ব্রণাদি উদগম বিদূরিত করে। পুনশ্চ, ইহা “শোথয়” উক্ত হইয়াছে, তবে কিরূপ শোথের উপকারী? বাতপিত্তজনিত (হস্ত-পদাদির) স্থানিক শোথে প্রলেপ দিলে, তাই কারণে উপকার দর্শায়; প্রথম, ইহা উক্ত দোষদ্বয়ের স্বতঃই প্রশমক; দ্বিতীয়, ইহার প্রলেপ শুষ্ক হইবার কালে সংকোচনক্রিয় সংঘটিত হয়, তদ্বারা শোথের উপশম হইতে পারে।

মৃত্তিকা যে নানাবিধ উৎকট চন্দ্রবোগের উপকারী, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই—অনেক বাতরক্ত ও কুর্গ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসাস্তে হতাশ হইয়া পরিশেষে তুলসীতলার মাটি বা গঙ্গাতটের মাটি সর্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে পরিশেষে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। অবশ্য, এস্থলে বিশ্বাস এবং জব্যশক্তি দুইই ধরিতে হইবে।

মাটির ঈদৃশী শক্তি থাকিলেও অনাবৃত ক্ষতমধ্যে অসাবধানে মাটি নিক্ষেপ করা উচিত নহে, যেহেতু তন্মধ্যে উহা আবদ্ধ হইয়া চারিদিক হইতে

পুরিয়া উঠিলে অভ্যস্তর পূজ ও যন্ত্রণার বৃদ্ধি, এমন কি নালী পর্য্যন্ত হইতে পারে।

• কর্দম "সারক" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এ কিরূপ ? • তবে, বেল পেঁপে প্রভৃতি না খাইয়া কাদা খাইলেই ত হয়। তাহা নহে। উক্ত ফলাদি বেরূপ পরিপাক পাইয়া উহাদের নিঃসারাংশ মলরূপে স্বয়ং বহির্গত হয়, অল্প আবদ্ধ মলকেও বহির্গত করে, • কর্দমের মেরূপ শক্তি নাই। কর্দম স্বয়ং পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া, উহার প্রায় সর্বাংশই অধঃপথে নির্গত হইয়া যায়, তৎসঙ্গে কোষ্ঠ-সংলগ্ন মলকেও নিঃসারিত করে।

(১) কলসীতে গঙ্গাজল বা অন্ত্র কোনও স্রোতস্বতীর জল ধরিয়া রাখিলে, নীচে যে কর্দম সঞ্চিত হয়, তাহার শৈত্যগুণ সমধিক। ইহা নাভির চারিদিকে প্রলেপ দিয়া শয়ান থাকিলে, পেট ফাঁপা ও আবদ্ধবাত ও মূত্ররোধের প্রতিকারে হয়।

(২) প্রাস্তরে শস্তক্ষেত্রে কলার উৎপন্ন হইলে, ক্রমে পরিপক ও সংগৃহীত হইবার পর যখন গৃহে আনীত হয়, তখন সেই কলয়ন্তূপের মধ্য হইতে মাটির চটা উঠাইয়া রাখিতে হয়। এই চটা উদরে প্রলেপ দিলে কলসীর নিম্ন-সঞ্চিত মাটির বে,বে গুণ, তদপেক্ষা সমধিক গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) কোনও কোনও নৃদীর তটে যে কোমল পাতলা মৃত্তিকার স্তর পাওয়া যায় তাহারও এই শক্তি আছে।

(৪) আঠালো মাটি দিয়া নিত্যনিত্য দাঁত মাজিলে, দাঁত বহুকাল শক্ত থাকে।

• (৫) ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর তীরে একরূপ অত্যন্ত আঠালো সূন্দর লালবর্ণ মৃত্তিকা পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকার পুস্তলিকাদি প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক রোদ্রে শুকাইয়া রাখিলেই পোড়ানো জিনিস • বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ শক্তও হয়। এই মাটির গুণ প্রায় গৈরিকের (গিরিমাটির) তুল্য, গিরিমাটির গুণ বথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

(৬) কর্দম শুষ্ক ও দগ্ধ হইলে তাহাতে গুণীস্বর উপনীত হয়। পোড়া-মাটি শোধক, সঙ্কোচক ও কিয়ৎপরিমাণে রক্ত রোধক। ফোলা ও ব্যাধাস্ক স্থানে পোড়ামাটির গুঁড়া (তামাকের গুল প্রভৃতি দ্রব্যাস্বরের সহিত)

প্রলেপ দিবার নিয়ম আছে। পোড়ামাটির চূর্ণ সহিত দাঁত মাজিলে মাড়ী-পুঞ্জ ফোলা ও রক্ত-পড়া নিবারিত হয়। এই চূর্ণ ৩৪ রতি যথায়ুক্ত অনুপানে সেবন করাইলে রক্তপিত্তের রক্তশ্রাব নিবারিত হয়। আঠাধোঁ মাটি পোড়াইয়া লইলে, এই শক্তি অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মূলকথা এই—মৃত্তিকার মধ্যে যে স্বাভাবিক ধাতব অংশ আছে, উহা অগ্নি-দগ্ধ হইলে অস্ত্রান্ত্র অংশের হ্রাসপ্রাপ্তি হেতু সেই ধাতবাংশের 'অমধিক প্রকটন হইয়া থাকে; এই ধাত্বংশই উল্লিখিত শক্তির হেতুভূত। চরকসংহিতার সূত্রস্থানে শোণিতাহাপক দশবর্গ যথা—“মধু মধুক কধির মোচরস মৃৎকপাল লোহ গৈরিক প্রিয়ঙ্গু শর্করা ইতি দশেমানি শোণিতাহাপকানি ভবন্তি।” মৃৎকপাল শব্দের অর্থ “খাপরা বা খোলা”।

(৭) স্ত্রীলোকেরা পোড়া মাটি খাইতে ভালবাসে, ধাতুবিশেষে ইহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর হইয়া থাকে, ইহা রক্ত-সংকোচক ও পাণ্ডুরোগজনক।

কপূর ।

বাল্লা নাম—কপূর; হিন্দী—কপুর; ইংরাজী—Champhor. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—পুংসি ক্লাবে চ কপূরঃ সিতালত্রো হিমবালুকঃ। ঘনসারচন্দ্র-সংক্রো হিমনামাপি স স্ত্বতঃ ॥ ভাঃ প্রঃ ॥ সংস্কৃত নাম—কপূর, সিতাল, হিমবালুক, ঘনসার, চন্দ্র, হিম। এতদ্ভিন্ন কপূরের আরও অনেক গুলি নাম ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, স্মাতার্থ সে গুলির উল্লেখ করা গেল; যথা—ভক্তসার, ভঙ্গাহ্বর, রেণুসার, রেণুসারক, ক্ষটিকাদ্রিভিৎ, ক্ষটিকাল, ভঙ্গবেধক, শিলা, তারাল, সিতালক, হই, হিমাঙ্কর, চন্দ্রভঙ্গ, হিমবালুকা, সিতাল, ভবধীশ, কুম্ভ, গোর, চন্দ্রাদিক, এবং চন্দ্রবাচক শব্দগুলি।

কপূর একপ্রকার বৃক্ষের সার। ঐ গাছ যাবা, সুমাত্রা, বর্ণিয়ো, জাপান, চীন প্রভৃতি স্থানে জন্মে। সচরাচর কপূর পরিষ্কৃত অবস্থায় বাজারে বিক্রীত হয়। উহা খেতবর্ণ ও উগ্র গন্ধ বিশিষ্ট; বাতাসে রাখিলে উবিয়া যায়, একত্র কাচের শিশির ভিতরে রাখিয়া উত্তমরূপে ছিপি বদ্ধ করিয়া

রাধিতে হয়। প্রচলিত নির্মামুসারে উবিয়া বাইবার ভয়ে, গোটাকতক গোল-
মরিচ উহাতে দিয়া রাখা হয়; কিন্তু ইহাতে কৃতদূর ফল হয় বলা যাকনা।

* ইহার পোতকাদি নানা প্রকার ভেদ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, কিন্তু সচরাচর উহা
ছাপ্রাপ্য ও চলিত না থাকায়, সে বিষয়ের উল্লেখ করী গেল না।

কপূরঃ শীতলো বৃষাশ্চক্ষুষ্যো লেখনো লঘুঃ ।

স্মরভিমধুরস্তিক্তে কফপিত্ত বিষাপহঃ ।

দাহতৃষ্ণাশ্চবৈরশ্চ মেদো দৌর্গন্ধ্য নাশনঃ ॥

রস—কটু তিক্ত মধুর; বিপাক—কটু; বীৰ্য্য—শীত; গুণ—
কফপিত্ত নাশক, লঘু, লেখন, বৃষা, স্মগন্ধি, চক্ষু রোগে হিতকর, মেদো-
নাশক; প্রভাব—দাহ, তৃষ্ণা, মুখের বিরসতা ও হর্গন্ধ নাশক। কপূর ত
গরম জ্বিনিস্ বলিয়া সকলেই জানেন, তবে কেন ইহা “শীতল” অভিহিত
হইল? ইহার মর্ম্ম এই,—(১) স্পিরিট প্রভৃতি উদ্বায়ি বস্তুমাত্রই স্পর্শ-শীতল
হইয়া থাকে; কপূরও অনেকেংশে এই জাতীয়। তবে কপূরের সহিত জল-
মিশ্রিত হইলে, এই শক্তির অধিকতর উপলব্ধি হয়। এই জাতীয় বস্তুগুলি
উবিয়া বাইবার কালে সংসৃষ্ট পদার্থের তাপহরণ করে। (২) জ্বরাদি
রোগে দৈহিক উষ্ণা বৃদ্ধিত হইলে, কপূর এই উত্তাপ অপনোদনে সমর্থ।
(৩) ধমুষ্টেকার অপস্মার প্রভৃতি বায়ুরোগে স্নায়বিক উত্তেজনা ও আক্ষেপ
(খঁচুনী) প্রশমিত করিয়া রোগীকে “ঠাণ্ডা” করে। তজ্জন্তও ইহাতে
শীতলতা আরোপিত হইয়াছে। ফল কথা অনেক স্থলে আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যগুণের
শাস্ত্রোক্ত বিশেষণ গুলি সহসা বোধগম্য না হইলেও, সকলগুলিই সার্থক
সন্দেহ নাই। হিন্দুস্থানীরা কপূর শীতল বলিয়াই ব্যবহার করে।

প্রয়োগ—সচরাচর ইহা পানের অন্ততম মসলা রূপে ব্যবহৃত হয়;
দ্রব্য-বিশেষের হর্গন্ধ নাশ এবং কোন কোন ষিঠাই স্মগন্ধ করিবার জন্তও ইহা
প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কপূর, খঁচুনি জ্বিনিস্ শূল অজীর্ণ ভেদ নিবারক।

ওলাউঠার রক্ষাকারী, বাতাসের হর্গন্ধহারক। স্বাঃ সাঃ।

ঔষ্যসাধনের এই শ্লোকটিতে কপূরের প্রধান প্রয়োগ সংক্ষেপে উল্লিখিত

আছে। যখন গ্রামের মধ্যে বিস্ফটিকা (ওলাউঠা) রোগের প্রাহুর্ভাব হয়, তখন অকালবৃদ্ধবনিতার মিকটী কপূর বড় আদর পাইয়া থাকে। সকলের বিখ্যাস—কপূরের আত্মা লইলে ওলাউঠা আক্রমণ করিতে পারে না। কেহ শিশির, ভিতর পুরিয়া, কেহ বা পুটিলি বাধিয়া, সঙ্গে রাখিয়া দেন, মধ্যে মধ্যে ইহার আত্মা লইয়া থাকেন। বস্তুতঃ কপূর (বিঘ্ন, আক্ষেপনাশক ও ধারক গুণ বশতঃ) ওলাউঠা রোগের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রবল ভেদ বসি বন্ধ করিতে ও আক্ষেপ (খেঁচুনি) নিবারণ করিতে ইহার শক্তি অসাধারণ। ওলাউঠার প্রথম অবস্থায়, কপূরের জল সেবন করিলে, রোগ আর প্রবল অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। "ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় ডাক্তারেরা স্পিরিটক্যাম্ফর (একপ্রকার কপূরের আরক) প্রয়োগ করিয়া থাকেন। "খটিকা মিশ্র" এই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় (ঋষির ২য় বর্ষ, ১১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ওলাউঠার বাজরাদির প্রবল অবস্থায়, যখন নাড়ী ক্ষীণ, জিহ্বা শুষ্ক, অন্ন অন্ন প্রলাপ প্রভৃতি উপসর্গ বর্তমান থাকে ও ক্রমে হস্তপদাদি শীতল হইয়া আইসে, তখন মকরধ্বজ কপূর ও মধুসহ প্রয়োগ করিলে, ক্রমে হস্তপদ উষ্ণ হইতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় মকরধ্বজ, কপূর ও মৃগনাভি মধু অল্পপানে সেবনে সদ্য ফল দৃষ্ট হয়। সান্নিপাতিক বিকারের উৎকৃষ্ট ঔষধ "বৃহৎ কপূরী ভৈরব" প্রভৃতি ঔষধে কপূরের প্রয়োগ আছে। গ্রীষ্মকালে অনেকে জলে কপূর দিয়া পান করিয়া থাকেন ; ইহাতে জল দোষহীন, শীতল ও সুগন্ধ হয়। ওলাউঠার মারি ভয়ের সময় ঐরূপে জল পান করা ভাল।

হিঙ্গুল মহিফেনক মুস্তকেন্দ্রযবং তথা ।

জাতীফলক কপূরং সর্বং সংমর্দা যত্নতঃ ॥

জলেন বটিকা কার্ঘ্যা দ্বিগুণা পরিমাপতঃ ।

ঘোরাং বিস্ফটিকাং হস্তি বটিকা নাত্র সংশয়ঃ ॥

জরাসিসারিণে দেয়া তথা তীসার রোগিণে ।

গ্রহণী ষট্ প্রকারে চ রক্তাতীসার উৎথনে ॥

হিঙ্গুল, আফিং, মুখা, ইন্দ্রযব, জায়ফল ও কপূর সমভাগ, জলে মাড়িয়া ছই রতি প্রমাণ বড়ী করিবে। ইহার নাম কপূর রস। ইহা বিস্ফটিকার প্রবল অবস্থাতেও বিশেষ ফল দর্শায়। জরাতীসার ও প্রবল রক্তাতীসার

প্রভৃতির পুরাতন অবস্থায় ইহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। চিকিৎসক-পরিশৃঙ্খ স্থানে “খটিকা মিশ্র” নামক ঔষধ ও এই কপূর রস এই দুইটা ঔষধ প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহেই থাকা আবশ্যিক ; কারণ, ওলাউঠা অতি ভয়ঙ্কর রোগ ; দূর হইতে চিকিৎসক আনিতে আনিতেই হয়ত রোগীর অবস্থা ধারাপ হইতে পারে। ঐরূপ অবস্থায় ঐ দুইটা ঔষধ প্রয়োগ করিলে, অধিকাংশ স্থলেই চিকিৎসকের বিনা সাহায্যেই রোগের অবস্থা অনেকটা ভাল হইয়া থাকে। এই ঔষধে দান্ত বন্ধ হইলে, আর প্রয়োগ করা উচিত নয়। গোলমরিচ চূর্ণ ১, শোধিত হিং ১ ও কপূর ২ ভাগ ; ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় এই যোগটা সহজ অঁখচ উৎকৃষ্ট ঔষধ। আতপ চাউল ধোয়া জল সহ সেব্য।

অতিসার রোগের অগ্রাণু ঔষধের অল্পপান স্বরূপে কপূরের জল প্রযুক্ত হয়। শিশুদিগের পেটের অস্থখে, পাতলা হুখের সঙ্গে অল্প কপূরের জল মিশাইয়া খাওয়ান উচিত। শিশুদিগের উদরাময়ে হুখের সহিত শুধু চূর্ণের জল না দিয়া, অত্যল্প কপূরের জলও দেওয়া ভাল।

কপূর ঘর্ষকারণক। কপূরের জল সেবনে ঘর্ষ নির্গত হইয়া জরাদির দাহ প্রশমিত হয়। নবজরে, এক বিহুক তুলসী পাতার রসে ১ রতি কপূর ও এক বা দেড় আনা সোরা দিয়া সেবনে ঘর্ষাদি নির্গত হইলে জর ভাল হয়।

সর্দি হইলে অম্নেকে কপূর শুঁকিয়া থাকেন। ইহাতে নাক দিয়া জল পড়া, মাথা কটকটানি প্রভৃতি প্রশমিত হয়। বস্তুতঃ, ইহা সর্দির প্রথম অবস্থায় ঐরূপে ব্যবহার করা ভাল ; কিন্তু সর্দি বসিয়া গেলে উহা দ্বারা উপকার হয় না, অনিষ্ট হইতে পারে।

সর্দিতে খালি পানের ভিতর ছোটএলাচ, তুলসী পাতা, লবঙ্গ, একটুকরা আদা ও কপূর দিয়া খাইলে, শীঘ্রই সর্দির উপশম হয়। (আয়ুর্বেদ সোপান)

সর্দি হইয়া যদি শ্বাসের ভাব হয়, নিশ্বাসে টান লাগে, গলা সাঁই সাঁই করে, তাহা হইলে কপূরের প্রয়োগে বেশ ফল হয়। কপূরের একটা প্রধান গুণ এই যে, ইহা আক্ষেপ নিবারক ; এজন্য আক্ষেপ যুক্ত রোগে (শ্বাসাদিতে) প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই ফল দর্শে।

১৫১২০ ফোঁটা তুলসী পাঁটার রসে আধ রতি কপূর দিয়া সেবন করা-
ইলে, শিশির কাসি ও বৃক্ক টান শীঘ্রই আরোগ্য হয় ।

জননেদ্রিয়ের ঋযথা উত্তেজনা নিবারণার্থ কপূর ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।
স্বপ্নদোষ রোগে এই উদ্দেশ্যেই কপূরের প্রয়োগ দেখা যায় । কপূর ২ রতি
ও কাবাবচিনির গুঁড়া ১০ আনা একত্রে পাতলা চূণের জল সহ অথবা কপূর
২ রতি ও আফিং আধ ধান, ঠাণ্ডা জলসহ শয়নের পূর্বে সেবন করিলে স্বপ্ন-
দোষ নিবারিত হয় । জ্বীলোকের কামোদ্গাদ ও ষোনি কপূর প্রভৃতিতেও
উহা প্রয়োগ করিলে উপকার হয় । প্রসবাস্তে হেঁতাল ব্যথা ও কষ্টরঞ্জঃরোগে
ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

ছরীর শিকড়, বকুলের বীচি ও শাঁস, আমলকী ও কপূর সমভাগে
পুরাতন গুড়ের সহিত বাটিয়া, ছোট কুল আঁঠী প্রমাণ বড়ী করিয়া নারিকেল
জলের সহিত রাত্রে শয়নকালে সেবন করিলে স্বপ্নযোগে গুক্রক্ষয় হয় না ।
(আয়ুর্বেদ সোপানি) ।

বিষাক্ত মেহে যখন অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, প্রসার করিতে কষ্ট, ভিতরে ঘা ও
টাটানি প্রভৃতি বর্তমান থাকে, তখন সামান্ত উত্তেজনাতেই রোগী বিষম
যন্ত্রণা অনুভব করে । এই অবস্থায় কপূর, সোরা, খেতচন্দন, কাবাবচিনি ও
অত্যল্প আফিং সহ প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই উপকার দর্শে । কিন্তু এস্থলে
আফিং সাবধানে ব্যবহার কর্তব্য, নতুবা উহার শক্তিতে প্রস্রাবের অন্ততা
হইয়া মূত্রনালীর জালা বাড়িতে পারে । সঙ্গে সঙ্গে বহুল পরিমাণে মূত্রকারক
বস্তু থাকিলে উক্ত বিঘ্ন না হইয়া যথেষ্ট উপকার হয় ।

মূত্রে বিবন্ধে কপূরচূর্ণং লিঙ্গে প্রবেশয়েৎ । ভৈঃ রঃ ।

অর্থাৎ মূত্ররোধ হইলে লিঙ্গমধ্যে কপূর চূর্ণ প্রবেশ করাইলে মূত্র
নির্গত হয় ।

বটক্ষীরেণ সংযুক্তং স্কন্ধং কপূরজং রজঃ ।

ক্ষিপ্ৰমগ্নতো হস্তি গুক্রক্ষাপি ঘনোন্নতম্ ॥ চক্রদত্ত ।

বটক্ষীর ও কপূরের স্কন্ধচূর্ণ একত্র মর্দন করিয়া চক্ষের চতুর্দিকে প্রলেপ
দিলে ঘনোন্নত নেত্রগুক্রও শীঘ্র বিনষ্ট হয় ।

একছটাক শিমুল মূলের রসে ২ রতি কপূর ও ১০ আনা কাবাবচিনি চূর্ণ

প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, শুক্র গাঢ় ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং স্বপ্নদোষাদি ধাতুদৌর্বল্যের বিবিধ উপসর্গ দূরীভূত হয় ।

কপূরের ক্রিমি (রক্তজ, বাহুমলজ বা পুরীধজ) নষ্টক শক্তিও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। খোস পাচড়া প্রভৃতি চর্মরোগে, ইহা দ্বারা অন্তরস্থ ক্রিমি (কণ্ডু উৎপাদক স্কন্দ-স্কন্দ কীট) বিনষ্ট ও ইহার করুপিত নাশক শক্তিতে পূঁজ রসাদি শোষিত হওয়াতে, শীত্ৰই উহা আবেগ্য হইয়া থাকে। শ্বেত-চন্দন ঘষার সহিত কপূর মিশাইয়া দেহে মাখিলে, গ্রীষ্মকালের ঘামাচি চুল-কানির বিশেষ উপশম হয়। নারিকেল তৈলে কপূর মিশাইয়া মাখিলে মাথার উকুন ও সামান্ত রকমের খোস পাচড়া ভাল হইতে দেখা যায়। কপূর ও গন্ধক সমভাগে লইয়া নারিকেল তৈলে মিশাইয়া লাগাইলে ২।৩ দিনেই পাঁচড়া শুকাইয়া যায়। নিমপাতার জলে উত্তমরূপে পাঁচড়া ধুইয়া ইহা লাগান উচিত।

কপূর পুরিতং বহুং সস্বতং সংপ্ররোহতি ।

সদ্যঃ শঙ্কতং পুংসাং ব্যথাপাকবীর্জিতমু ॥

কপূর চূর্ণ ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া সদ্যোক্ষতে (কাটা ঘা প্রভৃতিতে) পূরণ করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে, বেদনাদির নিবৃত্তি হয় ও ক্ষত পূরিয়া উঠে।

যে সকল ঘায়ে বেদনা, টাটানি প্রভৃতি থাকে না; অথচ শীত্ৰ আরাম হইতেও চায় না, অল্পাধিক পরিমাণে পূঁজ ঝরিতে থাকে, সেক্ষেপ স্থলে ঘা উত্তমরূপে ধোয়াইয়া কপূর যুক্ত কোন প্রলেপ লাগাইলে, উহা জ্বলন্ত রক্তমীত ও পরিষ্কার হয় এবং পূঁজাদি নিঃসরণ ক্রমে বন্ধ হইয়া শীত্ৰই আরোগ্যোন্মুখ হইয়া থাকে।

দাঁতের গোড়া ফুলিয়া বেদনা জন্মাইলে, কপূর গোলমরিচ, বিটলবণ ও তামাকপাতা চূর্ণ সহ ত্রৈ বেদনার উপর চাপিয়া খরিয়া থাকিলে, অল্প সময়ের মধ্যেই উহার কটকটানি ফোলা প্রভৃতি নিবৃত্ত হয়। বালক দিগের দাঁতে পোকা লাগিলে, ফুলথড়ির গুঁড়া সহ কিঞ্চিৎ কপূর ও সামান্ত পরিমাণ কুড়চীছাল চূর্ণ মিশাইয়া দাঁত মাজিতে দেওয়া ভাল। কপূরের হুর্গন্ধ নিবারক শক্তিও থাকতে, এইরূপে প্রস্তুত দস্তমঞ্জর সচরাচর ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বিটলবণ মরিচের গুঁড়া কপূর আর সুপারী পোড়ায়।

টিপিয়ে লাগালে সর্দির কোলাব্যাধা দাঁতের গোড়ায় ॥ স্বাঃ সাঃ

কপূরের কিঞ্চিৎ পরিমাণে রজঃকারক শক্তি দৃষ্ট হয়। হিং মুসব্বর প্রভৃতি অশ্রান্ত রজঃকারক ঔষধের সহযোগে কপূর উহাদের শক্তি বর্দ্ধিত করে ও বাধকের (রজঃ বন্ধ হওয়ার জন্য বাধকের) পেটবেদনা শিরঃপীড়া প্রভৃতি উপদ্রব প্রশমিত ও রজঃস্রাবকে নিয়মিত করে।

হিং কপূর দারুচিনি পুরাণ সিদ্ধি দুর্লভমূল্য।

ঋতুর পূর্বে বেটে খেলে শীঘ্র সারে বাধকশূল ॥ স্বাঃ সাঃ

নানাবিধ শূল রোগেও কপূরের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আপাংকার, তেঁতুল-চটাভস্ম ও শোধিত হিং চূর্ণ ১০ আনা মাত্রায়, কপূর জলের সহিত সেবন করিলে নিঃসন্দেহে শূল যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

শূলের বেদনা কালে বড় এলাচের দানা, কপূর ও একটুকরা মিশ্রী মুখের মধ্যে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে ঢোক গিলিলে, কথঞ্চিৎ বেদনার উপশম হয়। (আয়ুর্বেদ সোপান)।

নানাবিধ বাতের বেদনা ও নানা প্রকার ফিকব্যাধার তৈল সহ কপূর মিশাইয়া মালিশ করা যায়। কেরোসিন তৈল ও তর্পিন তৈল সমভাগে মিশাইয়া তাহাতে কপূর দিয়া ফিকব্যাধা ও বাতের ব্যাধার মালিশ করিলে তৎক্ষণাৎ ব্যাধা ভাল হয়। (আয়ুর্বেদ সোপান)।

ডাক্তার ডিউইস্ ঋতুর প্রাক্কালীন অপস্মারে হিং বা আফিং সহযোগে র্ত্তি পর্য্যন্ত মাত্রায় কপূর ব্যবহা করিয়া থাকেন। ডাক্তার টিন্ট বলেন, ঋতু এক কালে বন্ধ হওয়ার যদি শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়, তবে ওডিকলোনের সহিত কপূর মিশাইয়া মস্তকে মর্দন করা উচিত।

শাস্ত্রোক্ত মেহরোগের কপূরাদি লৌহ ও বৃহস্পৃশ্বরে এবং অজীর্ণের মহারাজ নৃপবল্লভ ও কতিপয় মোদকে, কহের লক্ষ্মীবিলাস এবং বাতব্যাধির নানাবিধ তৈলে ও বীর্ধ্যন্তের মন্থথালরস, বৃহচ্ছ্রোদয় মকরধ্বজে ও বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রসে কপূর আবশ্যিক হয়।

ভগবৎ প্রাতঃস্মরণ স্তোত্রম্

(ব্রহ্মানন্দ-বিরচিতম্)

(১)

প্রাতঃ স্মরামি ফণিরাজতনৌ শরান্নং নাগামরাসুরনরাদিজগরিদানম্ ।
বেদৈঃ সহাগমগণৈরুপগীয়মানং কান্তারকেতনবতাং পরমং নিধানম্ ॥

ফণিরাজ অনন্তের মাথার উপর
শয়ন করিয়া যিনি রনু নিরন্তর,
দেব-দৈত্য-নাগ-নর-যুত ত্রিভুবন
যাঁর সৃষ্টি-কার্য্যাবলি খ্যাত সর্বক্ষণ,
নিগম-আগম যাঁর গায় গুণচয়,
বনবাসী ঋষিদের যিনিই আশ্রয়,
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে গাত্ৰোত্থান করি
তঁাহারেই ভক্তিভরে মনে মনে স্মরি !

(২)

প্রাতঃভজামি ভবসাগরবারিপারং দেবর্ষিসিদ্ধনিবটৈর্বিহিতোপহারম্ ।
সন্দৃপ্তদানবক্ষদমদাপহারং সৌন্দর্য্যরাশিজলরাশিসুভাবিহারম্ ॥

গার ক'রে দেন যিনি ভব-পারাবার,
দেব-ঋষি-সিদ্ধগণ পূজা করে যাঁর,
পরম দুর্দান্ত যত রহে দৈত্যগণ
তুহাদের সূৰ্প যিনি করেন হরণ;
যিনি সিদ্ধসুতা, যিনি সৌন্দর্য্য-আধার
সেই লক্ষ্মীদেবী স'নে বিহার য়াহার,
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে গাত্ৰোত্থান করি
তঁাহার ভজনা করি মন প্রাণ ভরি !

(৩)

ঐত্নমামি শরদধরকাস্তিকাস্তং পদারবিন্দমকরন্দজুবাং ভবাস্তম্ ।
নানাবতারহৃতভূমিভরং কৃতাস্তং পাথোজকম্বুরর্থপাদকরং প্রশাস্তম্ ॥

শরতের স্নানিশ্চল আকাশের মত
যাঁহার স্নন্দর কাস্তি দ্বোভে অবিরত,
যাঁর পাদপদ্ম-মধু পিলে একবার
এ সংসারে জন্মভয় নাহি থাকে আর,
যিনি নানা অবতার ধারণ করিয়া
এই ত্রিলোকের ভার দিগেন নাশিয়া,
শঙ্খ চক্র আর পদ্ম নিত্য যাঁর করে,
কৃতাস্ত প্রশাস্ত যিনি সংসার ভিতরে,
প্রাতঃকালে শয্যা হ'তে গাত্রোথান করি
তাঁর পদে প্রণিপাত করি প্রাণ ভরি !

(৪)

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং ব্রহ্মানন্দেন কীর্তিতম্ ।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুথায় সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
ব্রহ্মানন্দ-বিরচিত এই শ্লোকচয়
অতি সারবান্ বস্তু মহাপুণ্যময় ।
প্রাতঃকালে যদি ইহা পঠে কোন জন,
যত কিছু পাপ তার পলায় তখন !

শ্রীপূর্ণচন্দ্রদে, বি. এ

আদর্শ কুলস্রী ।

হিন্দু কুলস্রীকে ঠিক কীরূপ হওয়া উচিত, তাহা কি ভাই তোমার এখন আর মনে আছে?—খাঙ্কিবে কিরূপে? চতুর্দিকে যখন পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও পাশ্চাত্য-রুচির প্রলয়ঙ্করী মুহাবাত্যায় বিতাড়িত হইতেছে, তখন আর গৃহাভ্যন্তরে সেই সুখ-শীতল মন্দ-মলয়ানিল কিরূপে অনুভব করিবে? কুলস্রীর যে সেই শাস্ত্রোক্ত “অসূর্য্যম্পশ্চা” মহা গৌরবান্বিত উপাধিটি ছিল, তাহা স্মরুচি শব্দীর অকুতো-বিমুখ ওত-প্রোত লুপ্তনে এককালীন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এখন বহির্দিশে বৈঠকখানায় বাবুরা যখন পরস্পর খাদের সুরে আলাপ করিতে থাকেন, অন্তঃপুর হইতেও কাংশ-বিনিন্দী পঞ্চমসুর নিঃসৃত হইয়া ঐকতানের ব্যবস্থা করিয়া দেয়।

কিরূপে কথা কহিবে, কিরূপে চাহিবে কিরূপে উঠিবে বসিবে এসমস্ত বিষয়ে পূর্বে একটা নিয়ম ছিল—এই নিয়ম মাতা হইতে কন্യാয়, স্বশ্রী হইতে বধূতে সংক্রামিত হইত। এক্ষণে সেরূপ অভিভাবিকা নাই, শিক্ষার্থিনীও নাই। কুলবধূর সমস্ত জিয়ারতলাপই সূনির্দিষ্ট, পদ্ধতি-সম্মত ও সীমাবিশিষ্ট ছিল। তাহার পদসঞ্চারের সীমা আবাস গৃহ পর্য্যন্ত, আর অধিক দূর নয়। তাহার ব্যাক্যোচ্চারণের সীমা সমবধূকা সঙ্গিনীর কর্ণবিবর পর্য্যন্ত। তাহার হস্তের সীমা স্বকীয় অধরপল্লব-পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে,—সেই হস্তরেখা দস্ত-বিস্তারী তার-শব্দে পর্য্যবসিত হইত না। আর তাহার কদাচিত্ কখন অভিমান হইলে সেই অভিমানের একটা সীমা থাকিত—সীমা মৌনের নিঃশব্দ রাজস্ব পর্য্যন্ত। তাহার কামনার সীমা পতিদেবের সন্তোষসাধন-প্রয়াস পর্য্যন্ত, তাহার দৃষ্টির সীমা বিজ চরণসঙ্গুলির অগ্রদেশ পর্য্যন্ত। এইরূপে কুলবধূর সমস্তই সীমা-বিশিষ্ট। নিঃসরণোন্মুখ জলোধের অস্ত্রান্ত্র সব পথ বন্ধ করিলে, যেমন অবশিষ্ট একটা পথের প্রোত বড়ই প্রবল হইয়া পড়ে, যেমন অন্ধের দৃষ্টিশক্তির অন্তর্ভূত ক্ষমতানিচয় বিনুপ্ত হওয়ায়, স্পর্শ শক্তি শতগুণ বাড়িয়া যায়, সেইরূপ উল্লিখিত নীতি-নিয়ন্ত্রিত কুলস্রীগণের একটা দিকে বড়ই প্রচণ্ড বেগবন্তা আসিয়া পড়ে। তাই তাহাদের সকলই সীমাবদ্ধ, সকলই গণ্ডী-

স্বার্থকে বলা তাঁহাদের প্রেমের সীমা নাই, তাহা অগাধ, অসীম, অনবচ্ছিন্ন।
এই কথা গুলি প্রাচীনকবি সংক্ষিপ্ত সুললিত শ্লোকে গাঁথিয়াছেন—

সঞ্চারো রতি মন্দিরাবধি সখীকর্ণাবধি ব্যাহতম্
হাস্তং চাধর পল্লাবাবধি মহামানোহপি মৌনাবধি ।
চেতঃ কান্তসমীহিতাবধি পদ্মভ্রাসাবধি প্রেমদ্বগম্
সকলং সাবধি নাবধিঃ কুলমুবাং প্রেমঃ পরং কেবলম্ ॥

গ্রন্থাদির সমালোচনা ।

নবযুগ—সাপ্তাহিক পত্র । বিশেষ দক্ষতা ও উৎসাহের সহিত পরিচালিত হইতেছে। সম্পাদক বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় একজন ক্ষমতাবান স্বনামধন্য পুরুষ। বাঙালীরা এই যে, এমন সুন্দর কাগজ খানি কেবল ডাক-মাগল লইয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার দিন দিন উন্নতি হউক এই প্রার্থনা।

আনন্দকানন—কাশীধাম হইতে শ্রীঅন্নদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। বিষয়—ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের পর্যালোচনা। উদ্দেশ্য অতি মহৎ। বার্ষিক মূল্য ১৮০ আনা মাত্র। ঈদৃশ পত্রিকার প্রচার যত হয় ততই দেশের মঙ্গল।

চৈতন্য পত্রিকা—শ্রীচৈতন্য ধর্ম বিষয়ে শ্রীযুক্ত ভবকিঙ্কর মহোদয় কর্তৃক লিখিত ও পরিচালিত। আকার ক্ষুদ্র হইলেও সারকথা আছে।

দৈনিক চন্দ্রিকা—পূর্বে এই দৈনিক পত্রিকা খানি বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইত। এক্ষণে ইহার ভার দক্ষতার হস্তে উপনীত হইয়াছে। শুধু সংবাদাদি না লিখিয়া ইহার অঙ্গ নানাবিধ সাহিত্য ও নৈতিক প্রসঙ্গ দ্বারা পরিশোভিত দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইতেছি। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত মহাশয় ইহার পরিচালক ও সভাপতি। কালীবাবুর উদ্যোগতার সহস্র ধন্যবাদ !

মিনার্ভা ও বেঙ্গল থিয়েটার—এই দুই রঙ্গালয়ে নীতিশিক্ষামূলক ও ধর্মরূচি প্রবর্তক পৌরাণিক প্রসঙ্গের অভিনয় হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা শ্রোতৃগণের কথঞ্চিৎ উপকার সাধন হয় কিন্তু যেখানে (বেঙ্গল মুখে) শুধুই স্টাটকনভেলের কথা, সেখানে কেবল সেই হৃদভেদিনী ছুরিকা, তাহাও সবার বিষ-মাধানো !!

ঋষি ।

২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ।

১৩০৬, মাঘ ।

চরকীয় নীতি ।

(ভোজন-দোষ)

মানবদেহের প্রপীড়নকারী রোগ সমুদায়ের মধ্যে অনেক গুলি ভোজন-দোষ হইতে উৎপন্ন হয়। ভোজন-দোষ বহুপ্রকারে সংঘটিত হয়, যথা দুপাচ্য দ্রব্য ভোজন, সুপাচ্য দ্রব্যের অতিমাত্রায় ভোজন, অর্জীর্ণ সবে ভোজন, অধ্যশন অর্থাৎ ভোজনের পরেই ভোজন, বিষমাশন অর্থাৎ কখন অত্যন্ত কখন অত্যধিক এবং কখন যথাকালে কখন অকালে আহার, বিরুদ্ধাশন অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ আহার্য সমুদায় মিশ্রণপূর্বক ভোজন ইত্যাদি। ভোজন সযত্নীয় প্রায় সমস্ত অনিয়ম গুলিই লোকে ন্যূনাধিক অবগত থাকিতে পারেন, কিন্তু কোন্ বস্তুর সহিত কোন্ বস্তুর বিরোধ,—কোন্ গুলি একত্র আহার করিলে উৎকট রোগাশঙ্কা আছে তাহা শাস্ত্রোপদেশ ব্যতিরেকে জানা দুর্ঘট। তজ্জন্ত এস্থলে চরকোক্ত পরস্পর বিরুদ্ধ দ্রব্যসমুদায়ের তালিকা প্রদত্ত হইল।

• দুগ্ধের সহিত—মৎস্য, মাংস, লবণ, নারিকেল, অধিক কাঁঠাল, বংশা-স্কুর, বনসুগ, মাষ, লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি কোন প্রকার লভাকল, তণ্ডুলের পিষ্টক, শুক শাক, ছাতু, কোন প্রকার অন্ন, গাখী, কংবেল, জাম, মদ্য, প্রভৃতি। মূলা, রসুন, সজ্জনাশাক ও তুলসী আহারান্তে দুগ্ধ সেবন বিরুদ্ধ।

• স্নাতের সহিত—মধু ও অস্ত কোন প্রকার স্নেহ (তৈল, চর্কা প্রভৃতি) সমপরিমাণে, মাদার, মৎস্য প্রভৃতি। স্নাত সেবন করিয়াই বৃষ্টির জল পান করিতে নাই। কাঁসার পাত্রে ১০ দিনের অধিককাল স্নাত থাকিলে বিষাক্ত হয়। উচ্ছিষ্ট পাত্রে স্নাত ভোজন নিষিদ্ধ।

ঘোলের সহিত—ঋষিক কলা। কমলা গুঁড়ী ঘোলে সিদ্ধ করিয়া
খাইতে নাই।

দধির সহিত—হুঙ্ক, (বিনা জল মিশ্রণে) বেল, কলা, পিপুল, মরিচ।
দধি গরম করিয়া খাওয়া বা গরম দ্রব্যের সহিত খাওয়া নিষিদ্ধ।

মধুর সহিত—জল স্বত ও তৈল (সমভাগ) গুঁড়, লবণ, মূলা, মাছ,
মাংস, মদ্য, মাদার প্রভৃতি। কোন প্রকার উষ্ণ দ্রব্যের সহিত বা উষ্ণক্রিয়া-
দির (উষ্ণশ্বেদাদির) পর মধু সেবন কিম্বা মধু সেবনের পর কোন প্রকার
উষ্ণ ক্রিয়া নিষিদ্ধ।

মাছ ও মাংসের সহিত—মধু, তিল, গুড়, হুঙ্ক, মাষকলাই, অন্ন
কোন চর্ব্বী, হাঁকু গুড় প্রভৃতি। মাছের হাঁড়ীতে পিপুল বা কাকমাচী সিদ্ধ
করিয়া খাওয়া নিষিদ্ধ।

উষ্ণজল—মধু ও তৈলা সেবনের পর উষ্ণজল পান নিষিদ্ধ।

অন্ন—যে প্রকার অন্ন হউক না কেন তাহার সহিত হুঙ্ক সেবন নিষেধ।

গুড়ের সহিত—মাদার, মাছ মাংস, মধু, কাকমাচী।

ছাতুর সহিত—মাংস ও ঘন হুঙ্ক।

জামের সহিত—হুঙ্ক ও কলা।

গাবের সহিত—হুঙ্ক।

কলার সহিত—ঘোল, আম, জাম, শূকরমাংস, তালফল, গাছ হুঙ্ক ও
দধি।

কপোত মাংসের সহিত—সর্বপ তৈল।

গিমে শাকের সহিত—পিপুল ও মরিচ।

পুঁই শাকের সহিত—তিলের বাটনা।

মাদারের সহিত—মধু, গুড়, স্বত, হুঙ্ক কিম্বা মাংসকলায়ের যুগ্ম।

সজনার শাক বা ফলের সহিত—হুঙ্ক।

রসূনের সহিত—হুঙ্ক বা রসুন খাইয়া হুঙ্ক পান নিষিদ্ধ।

ভবপারের কড়ি।

• মানুষ সঞ্চয় করিবার জন্য স্বতঃই ব্যস্ত, শুধু মানুষ কেন এই সঞ্চয় বৃত্তি ক্ষুদ্র জীবাদিতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র প্রাণী পিপীলিকা ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ স্থল। সঞ্চয় ব্যতীত পরিণামে ক্রেশ ভোগ করিতে হয় তাহা জীব মাত্রেই অনুভব করিতে পারে।^{১০} সেই জন্যই জীব মাত্রেই অসময়ের জন্য যথাসাধ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে।

জীবের ধারণা এই মর-ভূমিই তাহাদিগের চির আবাস স্থান, চিরদিনই তাহারা ইহসংসারে আত্মীয় বান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া এমনই স্থখে অতিবাহিত করিবে। জীব জীবনে মৃত্যুরূপ একটি যে মহা-পরিবর্তন আছে তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, তাই আমরা ইহাতে এমন তন্ময়, তাই আমরা ইহ সংসার ফেলিয়া, মোক্ষপদও প্রার্থনা করি না, করিতে প্রবৃত্তি হয় না, মনে হয় না। যেন ইহার কি জানি কেমন এক মোহন বংশী ধ্বনিতে মত্ত-মুগ্ধ সর্পবৎ আমরা নীরব নীস্তম্ব। তাই আমরা সেই অসময়ের—সেই শেষের সে দিনের জন্য কিছু মাত্র কড়ি সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারি না। সেই জন্যই আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইতে হইবে তাহাও ভাবিবার অবসর পাইনা। আমরা সংসার সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়া আমাদের সেই চির-সন্তাপ-হারিনী স্বদেশ-ভূমিকে ভুলিয়া গিয়াছি। একি কথা! চির প্রিয় স্বদেশ খানিকে কেহ কি কখনও ভুলিতে পারে? আমরা জীবিকা নির্বাহের জন্য অথবা কোন কার্য্য বশতঃ জীবনাধিক প্রিয় স্বদেশ খণ্ডকে ছাড়িয়া যখন প্রবাস-বাসে অবস্থান করি, তখন কি আমাদের সমগ্র হৃদয়খানি মন্থন করিয়া স্বদেশের নিঃশ্বল স্মৃতি-টুকু অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত হয় না? সে দেশের তরুলতা পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদিতে আমাদের কি স্বদেশের স্মৃতি জাগিয়া উঠে না? বসন্তের কোকিল যখন “কুহকুহ” রবে পঞ্চমে সুর চড়াইয়া আমাদের প্রবাসী হৃদয় খণ্ডকে আলোড়িত করিয়া তুলে, তখন কি স্বপ্নলব্ধ সঙ্গীতবৎ আমাদের হৃদয়ে সেই স্বদেশের “কুহ”—ধ্বনি আসিয়া জাগরিত হয় না? প্রতি-বিষয়েই যখন স্বদেশের স্মৃতিবিজড়িত, তখন কেমন করিয়া বর্ধিব স্বদেশ ভুলিতে পারা যায়? যায়না সত্য, কিন্তু যে পাপী পাপের প্রলোভনে পড়িয়া

আনন্দ লাভ করে, সুদুরস্থিত ঋতা পিতা স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় স্বজনদের প্রতি তাহার অক্ষুণ্ণ মমতা থাকে না, তবে যে স্মৃতিটুকু থাকে তাহা ক্ষণস্থায়ি বিদ্যুৎ-গতিবৎ। যখন স্নেহে অন্তর্ভেদিনী স্মৃতি হৃদয়ে ওঠোঁপ্রোত হয়, হৃদয় বলসিয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু সে যে ক্ষণস্থায়ী, চকিতেই সমস্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাহাতে আর ফল কি! সে স্মৃতির আর কার্য্যকরী ক্ষমতা কোথায়? আমাদের সেই আদিম দেশের স্মৃতিও আজ আমাদের পক্ষে সেইরূপ।

কিরূপে দেশের নিকট বাহবা পাইব, কিরূপে প্রতিষ্ঠার উচ্চাসনে স্থান লাভ করিব, আমরা সেই চিন্তাতেই জর্জরীভূত, কিন্তু নিজের পরিণাম চিন্তা করিবার অবসর বিন্দুমাত্র নাই। ইহ সংসারের জন্ত বাহা আবশ্যক আমরা প্রাণপাত করিয়া জগতের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া তাহা সঞ্চয় করিতেছি—কিন্তু এতাবৎ ভব পারে যাইবার জন্ত একটি কপর্দকও সঞ্চয় করিতে পারিলাম না। আমরা সংসার স্নেহে নিমগ্ন, যেন এই নশ্বর সংসার আমাদের জন্ত অবিদ্যমান হইয়া থাকিবে, যেন তাহার সুখময় ক্রোড়ে আমাদের নখর জীবন অবিদ্যমান হইয়া কৃতার্থতা লাভ করিবে। ধরণীর সহিত জীবের যে গাঢ় সম্বন্ধ সংশ্লিষ্ট আছে তাহা নিশ্চয়, নচেৎ কস্মিন্চ জীব পুনঃপুনঃ সংসার ক্ষেত্রে যাতায়াত করিবে কেন? কিন্তু সকলেরই সীমা আছে, ইহ সংসারের সহিতও জীবের সম্বন্ধের সীমা আছে, যখন তাহার সেই সীমার অতীত হয় তখন তাহাদিগকে আর জড়ীয় যাতনা ভোগ করিতে হয়না, তখন তাহারা চিরঞ্জি রাজ্যে অবস্থান করিয়া চিরায়ানন্দ উপভোগ করিতে থাকে। সূক্ষ্ম জীবগণের দ্বারাই তখন মর্ত্যরাজ্য চলিতে থাকে। বিশ্বময়ের বিশ্ব রাজ্যে এই রূপ কত কোটি কোটি জীব সৃষ্ট ও মুক্ত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অতএব আমাদের আদিম নিবাস মর্ত্য ভূমি নহে, সেই চিরায় রাজ্যকেই আমাদের আদিম নিবাস বলিয়া অনুমিত হয়। আমরা সেইখান হইতে আসিয়াছি, সেইখানেই যাইব, সেই স্থানই আমাদের আদি, সেই স্থানই আমাদের অন্ত। অতএব এই নখর ধরণীকে আমরা প্রবাস বলিয়াই নির্দেশ করিতে পারি। যেমন ব্যবসায়ীগণ ব্যবসায়ার্থে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া লাভাশায় সুদূর প্রবাসে গমন করিয়া থাকেন, আমরাও সেইরূপ আসিয়াছি; এই সংসার আমাদের শিক্ষা ও পরীক্ষার স্থানমাত্র। আমরা সংসার ক্ষেত্রে আসিয়া-

হিলাম, ধর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, শ্রীতি প্রভৃতির বহুগুলি লাভ করিবার জন্য, কিন্তু লাভ করা দূরে থাকুক, আমরা নিজ অকর্মণ্যতার দোষে মূলধন শুদ্ধ অপব্যয় করিয়াছি, এখন ভব পারের কড়ি হীন হইয়া আকুলপ্রাণে হে ভবপারের কাণ্ডারী ! তোমার দয়ার মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছি। আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া যে রোদন আরম্ভ করিয়াছি সে রোদন আর হইজীবনে শেষ হইল না—সে হাহাকার আর যুচিল না।

বহুদিনের পর আজ সেই ঐমৃতময় রাজ্যের মধুর স্মৃতি আসিয়া হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু আমার সেই আদিম দেশে যাইবার উপায় দেখিতে পাইতেছি না, কেননা এযাত্র ভবপারের কড়ি কিছুমাত্র সঞ্চয় করিতে পারি নাই—ভব সমুদ্র তরিব কিরূপে ?

বল, প্রভো ! তবে উপায় কি হইবে ! তোমার মত দয়াল প্রভু থাকিতে দীন আমি ভব সাগরের তাঁরে গড়াগড়ি যাইব, তুমি কি ডাকিয়া লইবেনা, তুমি কি দয়া করিবেনা—আমি কি পারে যাইতে পারিব না সামান্ত নাবিকের জ্ঞান পারের কড়ি না পাইলে তুমি কি পার করবে না ? তুমি কেবল সাধু কেই তরাইবে, তুমি কি পাপীর কেহ নহ ? সাধুগণ আপন ধর্মবলে বলীয়ান্ অতএব তাহাদের তরাইয়া তোমার আর পৌরুষ কি ? আমার মত পাপীকে যদি পার না করিয়া, গর্ষিত মনুষ্যের জ্ঞান, ভ্রুকুটি নেত্র চাহিয়া, পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইবে, তবে আর তুমি দয়াল কিসের ! অথবা তুমি নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর ! তোমার যদি দয়া থাকিবে, তোমার যদি বিচার থাকিবে, তবে প্রাণদানে প্যারী তোমাকে না পাইয়া চন্দনদানে কুজা তোমাকে পাইবে কেন ?

অথবা তুমি রহস্যময়, তোমার রহস্য বুঝিতে আমার ক্ষমতা নাই। না প্রভো, কে বলে তুমি নিষ্ঠুর ! তুমি দয়াল—পরমদয়াল ! তুমি না জীবের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া জীবের দ্বারে দ্বারে তাহাদের পাশভিক্ষা করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছ। না না, কে এমন হৃদয়-হীন আছে যে তোমাকে নিষ্ঠুর বলিবে ? তবে যে মানব যজ্ঞগা ভোগ করিয়া থাকে তাহাদের স্বোপার্জিত কর্মের ফল ভোগ মাত্র। তুমি জগতের রাজা, ত্রিলোকের রাজা, দোষগুণ বুঝিয়া সকলকে দণ্ড পুরস্কার করিতেছ, তোমার দোষ কি !

আমি ত প্রতি মুহূর্তেই তোমার করুণায় পরিচয় পাইতেছি, তুমি আমার

আপনার জন, বড় আপানীর জন, যেন কতকালের পুরাতনসম্বন্ধ অথচ তাহাতে কত মধুরত্ব, কত নূতনত্ব, কত গাঢ়ত্ব, কত গুরুত্ব তাহা কেমন করিয়া বলিব! তুমি দুরেরহিয়াও নিকটে, নিকটে রহিয়াও দূরে, তুমি কাছে এস এস না, ধরা দাও দাওনা, হে রহস্যময়! তোমার রহস্য আমি কি বুঝিব? বাই হোক এখন তুমি আমাকে ভবপারের কড়ি দাও, তুমিঁ যাহা দিয়া আমাকে পাঠাইয়াছিলে আমি সেগুলি খোয়াইয়াছি, তুমি চিরফালই দাতা, আমি চির কালই গ্রহীতা, এখন তুমি না দিলে আমি কোঁথায় বাইব! হে রসময়! আমি শুনিয়াছি আমি বুঝিয়াছি তোমার ওই নামই ভবপারের কড়ি। তাই দয়াল হুড়াই গৌর নিতাই জীবের দ্বারে দ্বারে তোমার ওই পবিত্রতাপূর্ণ রসময় নাম বিতরণ করিয়াছিলেন। তাই যখন জীব ইহলোক পরিত্যাগ করে আত্মীয় বান্ধবগণ তাঁহাকে তারক ব্রহ্ম নাম দেন। আমি বুঝিয়াছি এরূপ নাম দেওয়ার কারণ আর কিছুই নহে কেবল ভবপারের কড়ি সজ্জ দেওয়ার মাত্র। সেদিনও শ্রীপুরীধামস্থিত কোন সাধুভক্ত নাম প্রসঙ্গ বর্ণন করিতে করিতে একস্থলে বলিয়াছেন,—

“এ ভব সাগর, হবে বালুচর,
হাঁটিয়া হইবি পার।”

কি মধুর প্রাণস্পর্শিনী কাহিনী! বাই হোক তোমার নামই ভবপারের কড়ি, তোমার রসময় নাম সম্বল না করিলে কেপনই ভবপারে লয়না বা ভব সাগর বালুচর হয় না। অতএব তোমার মধুর নামই ভবপারের একমাত্র কড়ি। দাও প্রভো! একবার প্রাণ ভরিয়া তোমার ওই নাম লইতে দাও, একবর্ষ ঐ মধুর নামে ঐকান্তিক রুচি দাও, আমি হাসিতে হাসিতে ভবপারে চলিয়া বাই, ভবসাগরের তীরে পড়িয়া আর কাঁদিতে পারি না প্রভো!

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী) ।

সরস্বতী-বন্দনা ।

যে ভক্ত-বৎসলা দেবীর আরাধনার বৈমুখ্য-নিবন্ধন শৈশবে পাঠশালার শুরু মহাশয়ের নিদারুণ বেত্র-বিভীষিকা, তৎপশ্চাৎ উচ্চশিক্ষা কালে বাঁহার কপালেশ প্রাপ্তির প্রয়াসে, নিশীথের 'স্বথ-সৃষ্টি-বিসর্জন, জ্ঞাননেত্রের সমাগু উন্মীলনে, যাঁহার প্রসাদ-কুণিকা লাভালাভের ফলে উত্তর কালস্থলভ ধনঃ সৌখ্যসম্ভোগ বা সামুত্থাপ কপাল-করাঘাত, সেই সরস্বতী দেবীর বন্দনার, এস ভাই, এই মাঘের উৎসব দিনে আমরা সকলে সমকণ্ঠে মিলিত হই ।

চতুর্মুখ-মুখাস্তোত্রশৃঙ্গটকবিহারিণীম্ ।

নিত্যং প্রগল্ভবাচালামুপতিষ্ঠে সরস্বতীম্ ॥

চতুর্মুখ-মুখপদ্মে চতুস্পথ রয়, তাহাতে বিহার যাঁর হইয়া তন্নয়,
নিরন্তর বাক্য-ছটা বদনে যাঁহার, সেই সরস্বতী-পর্দে প্রণাম আমার !
করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ ।

পশুস্তি স্মশ্ৰুতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী ॥

যাঁহার করুণাবলু করিয়া আশ্রয়, কুশাগ্র-সমান-স্মশ্ৰু-বুদ্ধি কবিচয়
বদরীর মত এই অন্ত ভুবন, মুষ্টির ভিতর সদা করেন দর্শন,
জয় জয় জয় সেই দেবী সরস্বতী, দরিদ্র কবির যিনি একমাত্র গতি !

*পাত্ত্ব বো নিকৃষগ্রাবা মতিহেয়ঃ সরস্বতী ।

প্রাজ্ঞেত্তরপরিচ্ছেদং বচসৈব করোতি ষা ॥

মৃতি-স্বর্ণ-পরীক্ষার স্থলে নিরন্তর একমাত্র যিনি তার নিকৃষ-প্রস্তর,
কেবা সুপণ্ডিত, আর কেবা মূর্খ জন এ ছুটির ক'রে দেন যিনি নির্বাচন,
সেই দেবী সরস্বতী যেন সর্বক্ষণ তোমাদের স্মরণ করেন বর্জন !

শরণং করবাণি শর্মদং তে চরণং বংশি চরাচরোপজীব্যম্ ।

করুণামসৃণেঃ কটাক্ষপাতেঃ কুরু নামঘ কৃতার্থসার্থবাহম্ ॥

ওমা সরস্বতি ! বলি হইয়া তন্নয় স্বাবর জন্ম'ষত এ সংসারে রয়,
সকলেরি একমাত্র জীবিকা-কারণ পরম মঙ্গলময়্যুতোমার চরণ।^৩
প্রাণধন বিদ্যাধন ব্যাপারের তরে বণিক হইয়া মাগো! ঘুরি এ সংসারে !

মোর প্রতি কুপাদৃষ্টি করি অবিরল

কর এই দরিদ্রের বাসনা সফল !

তরুণশকলমিন্দো বিব্রতী শুভ্রকান্তিঃ কুচভরনমিতাদী সন্নয়না সিতাজ্জো ।

নিজকরকমলোদ্যল্লেক্ষনীপুস্তকশ্রীঃ সকলবিভবসিদ্ধো পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ ॥

কলামাত্র চন্দ্র য়ার ললাট উপর,

শুভ্র-কান্তিময় য়ার দেহ নিরন্তর,

স্বনভরে অবনত শরীর য়াহার,

শ্বেত পদ্মোপরি য়ার স্থিতি অনিবার,

করপদ্মে থাকি য়ার পুস্তক-লেখনী

ধরিয়া রয়েছে শোভা ভুবন-মোহিনী,

বাক্যের দেবতা যিনি, সেই সরস্বতী

সবে সর্ব-সিদ্ধি-দানে সদা দিন মতিণ!

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃত্তা

যা বীণাবরদগুণমণ্ডিতকরা যা শ্বেতপদ্মাসনা ।

যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিতি দেবৈঃ সদা বন্দিতা

স্যা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা ॥

কুন্দুপুষ্প, চন্দ্র আর তুষার, মতন

য়্যার শ্বেতবর্ণ-রাশি ভুবন-মোহন,

শ্বেত বস্ত্র পরিধান য়ার নিরন্তর,

য়্যার নিত্য স্থিতি শ্বেত পদ্মের উপর,

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর আদি দেবগণ

সর্বদাই করিছেন য়াহার চিস্তন,

বীণাদণ্ডে কর য়ার পরম শোভন, .

জড়তা নাশের যিনি পরম কারণ,

ঐশ্বর্য-শালিনী যিনি, দেবী সরস্বতী

তিনি যেন হন মোর একমাত্র গতি !

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি. এ

জব্যগুণ বিচার ।

কর্মরঙ্গ ।

• বাঙ্গালা নাম—কামরাঙা ; ইংরাজী—*Averrhoa carambola* ; সংস্কৃত পর্যায় :—কর্মরঙ্গঃ শিরালশ্চ বৃহদম্নো রুজাকরঃ । ভা: প্র: । সংস্কৃত নাম—কর্মরঙ্গ, শিরাল, বৃহদম্ন, রুজাকর । অগ্র নাম—কর্মরক, কর্ম্মারক, পীতফল, কর্ম্মর, কর্ম্মার, ধরাফল, মুদগর । কামরাঙা এক প্রকার অন্ন ফল ; একটু লম্বা ; গায়ে ৫৬টা শিরায়ুক্ত । ফলের মধ্যে সরু নরম মজ্জা থাকে । ইহার গাছ মানুষের প্রায় ৫৬ গুণ উচ্চ হয় ; মানুষের চক্ষের আকৃতি যেরূপ ইহার আকার ঠিক সেইরূপ তবে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় ; ডাঁটার দুই পাশে ফল-গুলি সারি সারি লাগান থাকে । বকুলফলের মত ছোট ছোট সাদা সাদা ফুল হয় । ফুলের পাপড়ীগুলি ঝরিয়া গেলে মধ্যে কামরাঙা থাকে উহা ক্রমে ক্রমে পুই হয় । অপক অবস্থায় সবুজ রং থাকে তখন একটু দূর হইতে পাতা ও ফলে চেনাই দুস্কর হয় । পাকিলে লালের আভাযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ হয় ।

কর্ম্মরঙ্গং হিমং গ্রাহি স্বাদন্নং কফবাত্ত্বং । ভা: প্র: ।

(পকের) রস—অন্ন মধুর ; বিপাক—বীর্য—শীত ; গুণ—বাতশ্লেষ্মনাশক, পারক, বলপুষ্টি ও রুচি প্রদ । প্রভাব—ধারক । কাঁচাফল অত্যন্ত অন্ন, পিত্তশ্লেষ্মকর ও বায়ুনাশক ।

প্রয়োগ—ইহার অন্ন রন্ধন করিলে বেশ সুস্বাদু হয় । ইহাতে নানা-রূপ চাটুনিও প্রস্তুত হইয়া থাকে । কাঁচা ফলের রস মন্দাগ্নির কোন কোন ঔষধের ভাবনাস্বরূপ প্রযুক্ত হয় । ইহার কচি পাতার রস অন্ন চিনি সহ প্রয়োগ করিলে আমাশয় রোগে উপকার হয় । পাকা ফল মহিষ দুগ্ধে পিশিয়া লাগাইলে ফোড়া পাকাইবার উত্তম পল্টিস্ হয় ।

কলম্বী ।

বাঙ্গালা নাম—কলম্বীশাক । হিন্দী—করেবু বা কলম্বী ; ইংরাজী—*Couvolvulus repens* । সংস্কৃত নাম—কলম্বী, কড়ম্বী, শতপর্কী, কলম্ব, কলম্বিকা, শব্দর । কলম্বীশাক অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন, ইহা এক প্রকার

জলজ লতা বিশেষ ; জলের উপরে ভাসে, শিকড় জলেই নামে—মাত্রকার আশ্রয় আবশ্যক হয় না, বেঁ গুলি তীরের নিকটে থাকে সে গুলির শিকড় মাটির ভিতরেই প্রবেশ করে। পাতা লম্বা লম্বা। ফুল ঈষৎ বেগুনে রঙের, আকৃতি অনেকটা কল্কের ফুলের মত। ডাঁটা গুলি ফাঁপা ও পর্কযুক্ত, কোমল বলিয়া শিশুর দুধ খাওয়াইতে অল্প নলের পরিবর্তে পল্লীগ্রামে ইহাই ব্যবহৃত হয়। পাড়ার্নায়ের অধিকাংশ পুরাতন পুর্কদিগীতে কলমী দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বড় হুদে যে কলমী শাক জন্মে তাহার ডাঁটা লম্বা ও শক্ত, তদ্বারা লেখনী প্রস্তুত হয় ; এই জন্তই “কলম” এই কথা প্রচলিত হইয়াছে।

কলমী স্তম্ভদা প্রোক্তা মধুরা, শুক্র কারিণী ।

রস—মধুর কষায় ; বিপাক—মধুর ; বীর্য—শীত ; গুণ—বায়ুপিত্ত নাশক, কিঞ্চিং স্নেহবৃদ্ধিকর, শুক্র, শুক্রকর (তাই বলিয়া অবশ্য শিমুলাদির স্থায় অতটা নয়)। প্রভাব—স্তম্ভ বৃদ্ধিকর।

শাককে অনেকে অতি তুচ্ছ দরিদ্রোপযোগী খাদ্য বলিয়া মনে করেন এবং পথ্যাপথ্য বিচারেও অনেক স্থলে রোগীর পক্ষে শাক নিষিদ্ধ বটে কিন্তু কলমী-শাক এই অপবাদ হইতে অনেকাংশে অব্যাহত। প্রথমতঃ ধরিতে গেলে কোন শাকই তুচ্ছ জিনিষ নহে ; ইহা সংযমি-বিধবা-ঋষি প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তিদিগের আহার্য্য। দ্বিতীয়তঃ ইহাই জীবের স্নেহভুলক শাপস্পর্শশূন্য আদিম খাদ্য! তাই উক্ত আছে—

“স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে ।

অশ্রুদগ্ধোদরস্থার্থে কঃকুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ ॥”

তার মধ্যে কলমীর অনেকগুলি বিশিষ্ট গুণ আছে। ইহা রন্ধনপূর্বক উপাদেয় আহার্য্যরূপে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাতপিত্তঘটিত রোগে চিকিৎসকগণ কলমীশাক-ভাতে স্নাত সৈন্ধবযোগে পথ্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহার মস্তিস্কস্নিগ্ধকারক ও চক্ষুর জ্যোতিঃবর্দ্ধক শক্তি আছে বলিয়া কথিত হয় এজন্য চিকিৎসকগণ দৃষ্টিদৌরল্যো ও মস্তিস্ক অধিক গরম হইলে ইহার রস চিনিসহ বা উপরিউক্ত প্রকারে পথ্য ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এই প্রকারে ব্যবহার করিলে জ্বীলোকের স্তম্ভ ও পুরুষের শুক্র বর্দ্ধিত হয়। উপদংশ রোগের পরিণামে কলমীর রস পানে উপকার দর্শে।

টাটকা কলমীর রস অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উহার দ্বারা বমন হইয়া থাকে, এজন্য আফি; সৈকো প্রভৃতি বিষ সৈদ্ধিত হইলে ইহা দ্বারা বমন করাইতে অনেকে পরামর্শ দিয়া থাকেন ।

কলায় ।

বান্দালা নাম—মটর বা মটর কলায়; হিন্দী—কেরাও; ইংরাজী—
Pisum Satwum. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কলাধৌ বর্তুলঃ প্রোকঃ সতীনশচ
ইরেণুকঃ ॥ সংস্কৃত নাম—কলায়, বর্তুল, সতীন, হরেণুক । মটরগাছ ময়দানে
হয় । রবিশস্ত্র সমূহের মধ্যে মটরও একটা । ইহার পাতা প্রায় ১ ইঞ্চি
চওড়া ও প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা, পাতাগুলি সুন্দর সবুজ ও কোমল, মধ্যে মধ্যে
শাদা দাগযুক্ত, গাছগুলি ভূমির উপরে লতাইয়া গিয়া নিবিড়ভাবে অবস্থিত
হয় । ফুলগুলি বেগুনের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ । এই গাছে লম্বা ছোট শিমের
মত ফল উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে গোল গোল বীজ থাকে, তাহাই পাকিলে
“মটর” নামে অভিহিত হয় । এই বীজ স্থানভেদে বা দেশভেদে ছোট, মাঝারি
ও খুব বড় হইয়া থাকে ।

কলায়ো মধুরঃ স্নাত্তঃ পাকে রুক্ষশ্চ শীতলঃ ।

পিত্তদাহকফ ধ্বংসী কষায় আমদোষকৃৎ ॥

রস—মধুর ও ঈষৎ কষায়; বিপাক—মধুর, বীর্য্য—শীতল;
গুণ—রুক্ষ, পিত্ত দাহ ও কফনাশক এবং (অধিক ভোজনে) আমদোষ-
জনক । প্রয়োগ—মটরের ডাইল উত্তমরূপে রন্ধন করিলে অতীব সুস্বাদু
হয়, মুগ, মসুর, বঁট প্রভৃতি কয়েকটা ডাইলের যেরূপ সমাদর, ইহার সেরূপ
আদর দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু আমরা অনেকবার দেখিয়াছি—পল্লীগ্রামে ব্রাহ্ম-
ণের বাড়ীতে ভোজের নিমন্ত্রণে ডাল তরকারী প্রভৃতি যত কিছু আয়োজন
হয়, তন্মধ্যে মটর-ডাল বিশেষ সুস্বাদু ও সুগন্ধি হয়, এবং বহুদিন পর্য্যন্ত
স্মরণযোগ্য হইয়া থাকে, ইহা বোধ হয় পূজনীয় সদ্ব্যাক্ষণীগেগের হাতের
গুণ । মটর বীজ পরিপক হইবার পূর্বেও কোমল অবস্থায় কাঁচকালা, কপী,
গোলালু প্রভৃতির সহযোগে রন্ধন হইয়া থাকে, তখন উহার মর্যাদা বড় কম

নয়। উক্ত কচি অবস্থায় ইহার নাম “মটরগুঁটা” বা “কলাগুঁটা”। ইহা ক্রিষ্ণ গুরুপাক, কিন্তু দীপ্তাঘ্নি ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যই হিতকর। মটরগুঁটি খোলায় অল্প সর্বপট্টেল ও কাঁচা লঙ্কার টুকরা সহ ভাজিয়া লইলে খাইতে বড় মুখরোচক হয়। শুনা যায় সহরে মদ্যপায়ীদিগের নিকটে ইহা বড়ই সোহাগের ধন। পক মটর-ভাজিয়া তেল নুন মাখিলে বড় সুস্বাদু হয়, ইহা অগ্নি ও দস্তুর সাহায্যবান্ যুবকদিগেরই যথার্থ সেবা। যাহারা পাখী পুষিতে ভাল বাসেন, মটরের ছাতুকে তাঁহারা বিলক্ষণ চেনেন। মটর-শাক শাক-সমূহের মধ্যে সুস্বাদুতায় উচ্চশ্রেণীস্থ বলিতে হইবে। পাড়ারগারে কৃষিজীবদিগের শরীরে যে শক্তি, তাহার অধিকাংশেরই মূলভূত ঐ মটর-শাক, মটর-ডাল ও সেই অধমতারণ লবণ। অপিচ, পূর্ববঙ্গে গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি উপনীত হইলে যে প্রায় কদাপি ফেরে না, তাহার কারণ প্রায় প্রত্যেকের বাড়ীতেই ক্ষেত্রজাত তণ্ডুল ও অন্ততঃ মটর-ডাল সঞ্চিত থাকে। আলানি কাঠ ত কেবল-সংগ্রহ সাপেক্ষ। ক্ষুধারোগের প্রতিকারিত্ব ছাড়া মটর গাছের অশ্রু ঔষধীয় প্রয়োগ বড় দৃষ্ট হয় না। তবে রস—বিপাক বুঝিয়া প্রয়োগ করিলে রোগবিশেষে ফল দর্শাইতে পারে সে কথা অবশ্য বিভিন্ন। গ্ৰীহা, বক্রৎ, আমাশয়, বহুমূত্র, কাস প্রভৃতি রোগে মটর নির্বিদ্ধ।

কসেরুক ।

বান্দালা নাম—কেশুর ; পশ্চিমদেশে বলে—কসেরুকা ; ইংরাজী নাম—Kysoor Cipuss. সংস্কৃত পর্যায় :—শুককন্দঃ কশেরুকঃ ত্রাৎ ক্ষুদ্রমুস্তা কসেরুকা। শূকরেষ্ঠঃ স্নগন্ধিষ্ঠ স্নগন্ধো গন্ধকন্দকঃ ॥ সংস্কৃত নাম—শুককন্দ, কশেরুক, শূকরেষ্ঠ, স্নগন্ধি, স্নগন্ধ, গন্ধকন্দক. ক্ষুদ্রমুস্তা কসেরুকা।

ইহা মুখা-জাতীয় ছোট গাছ, মুখা গাছ অপেক্ষা একটু বড় হয়, বালুকাময় ময়দানে, বিশেষতঃ নদীতীরে ঘাসের সহিত জন্মে। ইহার মূল গোলাকৃতি ও কৃষ্ণবর্ণ, এক একটা সোয়া ইঞ্চ চওড়া হয়। ইহার অভ্যন্তরে দিব্য শ্বেতবর্ণ, স্নগন্ধ ও খাইতে মিষ্ট। একপ্রকার ছোট কেশুর আছে তাহা প্রায় মুখার মত। নদীর স্রোতে অনেক সময়ে ভাসিয়া আসে এবং বালকেরা কুড়াইয়া খায়।

কসেবক দ্বয়ং শীতং মধুরং তুষ্ণং শুষ্ক ।

পিত্তশোণিত দাহয়ং নয়নাময়নালনম্ ।

গ্রাহি শুক্রানিলপ্লেয়কচি স্তম্ভকরং স্তম্ভক ॥

(ছই প্রকার কেশরের) রস—মধুর ক্লায়; বিপাক—মধুর; বীর্য—শীত; গুণ—শুষ্ক, রক্তপিত্ত নাশক, দাহপ্রশমক; নেত্ররোগহর, ধারক, শুক্রবর্ধক, বায়ুও শ্লেষকর, অকচি নাশক ও স্তম্ভবর্ধক।

প্রয়োগ—কেশরের ত্বক্ ফেলিয়া ধুইয়া একটু মিছরি সহকারে উৎকৃষ্ট ‘জলখাবার’ হয়, কলিকাতা অঞ্চলে ইহা এইরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে ইহা সর্বদাই বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। রক্তপিত্ত-রোগী, পিপাসার্ত, জ্বর রোগী, স্পন্দদোষগ্রস্ত ব্যক্তি ও স্তনদুগ্ধহীন প্রসূতির পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহা কিঞ্চিৎ শৈত্যকর, স্নাতরাং অতিরিক্ত শ্লেয়া থাকিলে নিষিদ্ধ। চোক গিলিতে বেদনা হইলে লোকে গোলমরিচের সঙ্গে কেশর চিবাইয়া খাইয়া থাকে। রোগীর পক্ষে সমস্ত শাঁসটি না খাইয়া চিবাইয়া শুধু উহার রস খাওয়াই ভাল।

কস্তুরী ।

বান্দালানাম—মৃগনাভি বা কস্তুরী; হিন্দী—কস্তুরী; ইংরাজী—Musk.
সংস্কৃত পর্যায়ঃ—মৃগনাভি, মৃগমদঃ কথিতস্ত সহস্রভিৎ। কস্তুরিকা চ কস্তুরী বেধমুখ্যা চ সা স্ত্বতা। সংস্কৃত নাম—মৃগনাভি, মৃগমদ, সহস্রভিৎ, কস্তুরিকা কস্তুরী, বেধমুখ্যা। অন্তনাম—গন্ধধূলি, মৃগনাভিজা, অণ্ডজা, নাভী, মিশ্রা, যোজন-গন্ধিকা, মদলতা, যোজনগন্ধা, গন্ধবোধিকা, কালাঙ্গী, ধূমসঞ্চারী, গন্ধপিপাটিকা, বাত্লামোদ, মদনৌ, গন্ধকোকিলা, স্তম্ভগা, শ্রামা, কামাঙ্গা, ললিতা, মোদিনী।

মৃগনাভি অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। ইহা একজাতীয় হরিণের নাভি মধ্যে উৎপন্ন হয়, ঐ হরিণকে বধ করিয়া লোকের উহার নাভি কাটিয়া লয়। ঐ নাভিকে চলিত কথায় ‘নাভা বা নাকা’ বলে। উহার আকার গোল, উপরে ছোট ছোট লোম, বর্ণ ফিক্-ধূসর, এক একটা ওজনে তিন চারি

তোলা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । নোফা দৈখিলেই বুঝা যায় যে জীব দেহ হইতে কাটিয়া লওয়া হইয়াছে, যেহেতু কর্তন-স্থান শুষ্ক কুঞ্চিত বিবর্ণ রক্তমাংসাবৃত দৃষ্ট হয় । এই নোফা চিরিয়া কস্তুরী বাহির করা হয় । কোনটীর মধ্য হইতে কৃষ্ণবর্ণ শঙ্কুর স্তায়, কোনটী হইতে তিলের স্তায়, কোনটার ভিতর হইতে বড় এলাচের দানা বা কুলথ কলায়ের স্দৃশ, কোনটা হইতে ছোলা বা তদ-পেক্ষাও বড় দানা বহির্গত হয় । শুনা যায় একটী নোফা হইতে কদাচিৎ একটী জমাট দানা ও নির্গত হয় । উহা শতাধিক রোপ্যমুদ্রায় বিক্রীত হইয়া থাকে । নেপাল দেশের রাজার নাকি ঐ রূপ বড় দানার একটী সুদীর্ঘ মালা আছে । উহা তিনি বিশিষ্ট পর্কদিনে পরিধান করেন । মুগনাভি প্রধানতঃ তিন প্রকার আছে, বচন যথা—

কামরূপোদ্ভবা কৃষ্ণা নৈপালী নীলবর্ণ যুক্ত ।

কাশ্মিরী কপিলচ্ছায়া কস্তুরী ত্রিবিধা স্মৃতা ॥

অর্থাৎ আসামের অন্তর্গত কামরূপে যে মুগনাভি ক্রমে তাহার বর্ণ কৃষ্ণ ; নেপাল হইতে প্রাপ্ত মুগনাভি নীলের আভাযুক্ত এবং কাশ্মিরী মুগনাভির বর্ণ কপিল অর্থাৎ স্বেৎ ফিঁকে ধূস্রবর্ণ ।

প্রকর্ষ নিকর্ষ বিষয়ে উক্ত আছে—

কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ ।

কাশ্মীর দেশ সন্তুতা কস্তুরী হৃদমা মতা ॥

কামরূপজ মুগনাভি শ্রেষ্ঠ, নেপাল দেশোৎপন্ন মধ্যম ও কাশ্মীরজ মুগনাভি এই দু'য়ের অপেক্ষা হীন গুণ ।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই উৎকর্ষাপকর্ষবিচারে অধিক ফল নাই, যেহেতু মুগনাভির বৈকল্পিক নকল চলে ও চলিতেছে, এরূপ অল্প কোনও মূল্যবান বস্তুরই সম্ভবে না । ধূর্ত-বিক্রেতার নানারূপ সুগন্ধি মশলা পিশিয়া যথাযথ বর্ণ উৎপাদন করিয়া তাহার সহিত অত্যন্ন মুগনাভি মিশ্রণ পূর্বক আসল জিনিষ বলিয়া বিক্রয় করে । এক তোলা বাজে জিনিষের মধ্যে ৯০ আনা মুগনাভি থাকিলেও বিলক্ষণ গন্ধ থাকে । সোণা রূপা পরিচয়ের জন্ত কথুতি পাথর আছে, হীরার মুক্তার কৃত্রিমতাও নিপুণ চক্ষুর সমক্ষে ধরা পড়ে, কিন্তু মুগনাভি শুধু দৃষ্টি ও ঘ্রাণ মাত্রেই চিনিবে এরূপ সাধ্য কার ? ক্রেতার সন্দেহ

পরিহারের জন্ত শঠ ব্যবসায়ীরা (মৃগনাভি শূত্র) খালী “নাফা” সংগ্রহ করিয়া, উহা জলে ভিজাইয়া কোমল করে, পরে উহার মধ্যে মৃগনাভির রূপ-গন্ধধারী কৃত্রিম বস্তু পূরিয়া বোটার স্থানে দড়ী বাঁধিয়া রোজে রাখে, উহা শুকাইয়া গেলে ঐ দড়ী খুলিয়া ফেলে ; তখন উহা দেখিতে ঠিক মৃগনাভি পূর্ণ সত্য নাফা বলিয়া প্রতীয়মান হয় । ব্যবসায়ীরা স্পষ্টাপূর্বক অস্ত্র ক্রেতার সম্মুখে উহা কাটীয়া বাহ্যিক করিয়া অধিক মূল্য লয় ।

যাহা হউক মৃগনাভি দুইবার জন্ত শাস্ত্রে এই লক্ষণ উল্লিখিত আছে—

যা গন্ধং কেতকীনাং হরতি পরিমলৈর্বর্ণতঃ পিঞ্জরাভা ।

স্বাদে তিক্তা কটুর্বা লঘু রথ তুলিতা মর্দিতা চিকণা স্মাৎ ॥

দাহং যা নৈতি বহ্নৌ চির্মিচির্মি কুরুতে চর্মগন্ধা হতাশো ।

সাঁ কস্তুরী প্রশস্তা বরমৃগ তহুজা রাজতে রাজ-ভোগ্যা ॥

অর্থাৎ যাহা কেতকী ফুলের গ্রায় গন্ধযুক্ত, বাহার বর্ণ হস্তার চর্মের বর্ণ সদৃশ, আস্থাদে কটু ও তিক্ত, ওজনে লঘু, মর্দনে চিকণ হয়, যাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে না জলিয়া চির্ম্ চির্ম্ শব্দ করিতে থাকে এবং দক্ষ চর্মের গন্ধ নিঃসারণ করে, সেই কস্তুরীই প্রশস্ত, উৎকৃষ্ট মৃগোৎপন্ন ও রাজগণের ব্যবহার যোগ্য ।

পরীক্ষান্তর—

করত্বল জলমধ্যে স্থাপনীয়া মহাস্তঃ ।

পুনরপি তদবস্থং চিস্তনীয়ং মুহূর্ত্তম্ ॥

‘ যদি ভবতি চ রক্তং তজ্জলং পীতবর্ণং ।

ন ভবতি মৃগনাভিঃ কৃত্রিমোয়ং বিকারঃ ॥ কাঃ

• অর্থাৎ করতলমধ্যে জল রাখিয়া তদভ্যন্তরে একটু মৃগনাভি স্থাপন করিবে, তদন্তর নিপুণ দৃষ্টি পূর্বক মুহূর্ত্তেক উহা প্রণিধান করিবে ; ঐ জল যদি লাল বা পীত বর্ণ হয় তবে নিশ্চয়ই উহা মৃগনাভি নহে ; কোনও কল্পিত বিকার মাত্র ।

গন্ধ বৈলক্ষণ্যের স্বাভাবিক কারণ ।

বালে জরতি চ হরিণে ক্ষীণে রোগিণিচ মন্দগন্ধ যুতা ।

কামাতুরে চ তরুণে কস্তুরী বহল-পরিমলা ভবতি ॥ রীঃ নিঃ

অত্যঙ্গ বয়স্ক, বয়োজীর্ণ, ক্ষীণ বা রোগগ্রস্ত হরিণের কস্তুরী মন্দগন্ধ যুক্ত

হয়। কামাতুর ও তরুণবয়স্ক ঋগের কস্তুরী উজ্জল ও বহু সৌরভাসিত হইয়া থাকে ।

কস্তুরীকা কটু তিক্তা ক্ষারোক্ষা শুক্রলা গুরুঃ ।

কফবাতবিষচ্ছর্দি শীত দৌর্গন্ধ্য শোষহং ॥ ভাঃ প্রঃ

রস—কটু ও তিক্ত ; বিপাক—কটু ; বীৰ্য্য—উষ্ণ ; গুণ—
ঈষৎ ক্ষারযুক্ত, গুরু, কফ ও বায়ুনাশক, বিষহর, শ্লিমি ও দৌর্গন্ধ নাশক
(অর্থাৎ ইহার সাহায্যে বস্তুস্বরে সৌগন্ধ্য হয়)° প্রভাব—(১) শুক্রল (কটু-
তিক্ত রস অবস্থা, তথাপি প্রভাবী বশতঃ ইহা শুক্রল) 'শুক্রল' বলিতে এখানে
শুক্রজনক, উত্তেজক ও শুক্রস্তুকর বৃত্তিতে হইবে, যেহেতু প্রত্যক্ষে মৃগনাভিঙে
এই গুণত্রয় দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) শীতহর, অর্থাৎ দেহের উষ্ণতা জনক । (৩) শোষহর অর্থাৎ
ক্ষয় নিবারক, ষন্মাক্রান্ত ব্যক্তির সপ্তধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকিলে ইহার
তন্নিবারণ শক্তি প্রসিদ্ধ । অধিকন্তু বহুমাত্র রোগীর প্রস্রাবের সহিত কোনও
দৈহিক ধাতু নির্গত হইতে থাকিলে ইহাধারা তাহার নিবারণ হয় ।

গুণে ইহা বায়ুনাশক উক্ত হইয়াছে । ইহা কিরূপ বায়ুনাশক ? ইহা
কি রাত্রি জাগরণান্তে বা অতিশ্রমান্তে ডাবের জল বা মিশ্রী-সরবতের ত্রায়
কথার কথার ব্যবহার্য্য ? তাহা নহে । ইহা হিকা ঋস অপস্মার ধনুস্তম্ভ
প্রভৃতি আর্কোপাত্মক বায়ুর ও স্নায়বিক শিথিলতার (nerve-prostration)
প্রতিধারী । পুনশ্চ ইহা বমি নাশক, অর্থাৎ ক্ষয় ও রক্তপিত্ত, রোগীর কফ-
মিশ্র বমিতে অবস্থা বৃদ্ধি প্রয়োজ্য, অজীর্ণ বমিতে নহে ।

কস্তুরী বিষয়ে নূতন শ্লোক ।

আক্ষেপহরণঃ শ্বেদজননঃ কামদীপনঃ ।

হিকায়ো মূত্রলো ব্ল্যঃ কিঞ্চিদ্রকরঃ স্মৃতঃ ॥

অর্থাৎ ইহা আক্ষেপ নাশক, শ্বেদজনক, কামদীপক, হিকাহর, মূত্রকর,
বলবর্দ্ধক ও কিঞ্চিদ্র মস্ততাজনক । ভাবপ্রকাশধৃত পূর্বোক্ত শ্লোকটি হইতে
এই গুণগুলি পাওয়া যায়না মনে করিয়া জনৈক আধুনিক কবিরাজ ইংরাজি
হইতে এই শ্লোক রচনা করিয়া উৎকৃত জর্যাগুণ গ্রন্থে সমাবেশিত করিয়া-

ছেন। আমাদের ধারণা এই শ্লোক দ্বারা স্মৃত্তন কিছু বলা হয় নাই; তবে অর্থাভিব্যক্তির জন্য অধিকষ্ঠ ন দোষায়। অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে শরীর উষ্ণ ও মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হইয়া ক্রিষ্ণিৎ মাদকতা প্রকাশিত হইয়া থাকে, নতুবা নহে।

কস্তুরীকে শুধু “মূত্রল” বলিয়া জানিয়া রাখিলে চলিবে না, যেহেতু ইহার মূত্রাধিক্যনাশ শক্তিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই শক্তি থাকায় ইহা আয়ুর্বেদ মতে বহুমূত্রের ঔষধে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। ইহা শ্বেদ ও মূত্রজনক কিরূপে হয়? না,—ইহা অনেক সময়ে, উদরস্থ হইবার পর শোষিত হইয়া দেহোত্তাপ উৎপাদন পূর্বক মূত্রগ্রন্থি (kidney) ও লোমকূপদ্বারা আংশিক নির্গত হইয়া যায়, তৎকালে শ্বেদ ও ঘর্ম্ম আভিভূত হয়। ইহা সোরা, শ্বেত পুনর্নবা প্রভৃতির স্তায় মূত্রল নহে।

নির্ঘণ্ট রত্নাকর শ্লোকঃ ।

কস্তুরিকাতু চক্ষুষ্যা কটী তিক্তা স্নিগ্ধিকা ।
উষ্ণা শুক্রপ্রদা শুক্লী বুঘ্যা ক্ষারা রসায়নী ॥
কিলাস কুষ্ঠ মুথরুক্ কফ দৌর্গন্ধ্য নাশিনী ॥
অলক্ষ্মীমল বাত তূট ছর্দি শোষ বিধাপহঃ ।
শীতঞ্চ কাস রোমঞ্চ নাশয়েদিত্তি কীর্তিতঃ ॥

কস্তুরী চক্ষুর উপকারী, কটু ও তিক্তা, স্নিগ্ধি, উষ্ণ, শুক্রপ্রদ, শুক্ল, বুঘা (কামোদ্দীপক) ক্ষারযুক্ত, রসায়ন, কিলাস ও কুষ্ঠহর, মুথরোগয়, কফ ও দৌর্গন্ধ্য নাশক। অলক্ষ্মীহর, মলশোষক, বায়ুপ্রশমক, তৃষ্ণা-বমি-ক্ষয়-বিষ নাশক, দেহশৈত্য ও কাসরোগের প্রশমকারী বলিয়া প্রখ্যাত।

প্রয়োগ—স্নিগ্ধাভির প্রধানপ্রয়োগ বাতশ্লেষ্মজ্বরের বিকারাবস্থায় ক্ষয়কাসে, পুরাতন বহুমূত্র রোগে এবং যে কোনও রোগ জন্য দেহোত্তায় হ্রাস ও নাড়ী ক্ষীণতায়।

জ্বরবিকারে যখন রোগীর জীবনীশক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে, মুছ মুছ প্রলাপ ও তন্দ্রাভাব, শব্দাশ্রেষণ আদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, চক্ষু আবিল ও শূন্যভ, আকস্মিক চমক বা মুছ আক্ষেপ, নাড়ী ক্ষীণ ক্রম হ্রাস হয়, হৃৎস্পন্দন

জনিত শব্দ ধয়ের প্রথমটী গুনাধারনা, রোগী নিজের জড় বস্তুর জায় ল্পণ ও উত্তান হইয়া থাকে, এমন অবস্থায় মুগনাভি মহোপকারক।

বহুমূত্র রোগে অবশেষে রোগীর দেহ যখন অতীব শিথিল, অবলম্বন, ধসুথসে ও কফাধিক্য সূচক এবং পৃষ্ঠত্রণ বা অস্ত্র ফোটকাদি কর্তৃক আক্রান্ত হইতে থাকে তখনই মুগনাভির ঋষার্থ উপকার দৃষ্ট হয়। সাধারণ বহুমূত্রে ইহার প্রয়োগ ততটা ফলপ্রসূ নহে বরং উত্তাপ ও পিপাসা বর্দ্ধিত করে।

বাতশ্লেষ্ম ঘটিত ধনুষ্ঠকার ও হিষ্টিরিয়া রোগে মুগনাভির প্রয়োগ সদ্য-ফলপ্রসূ, তদবস্থায় স্নায়বিক উত্তেজনা হ্রাস করিয়া অনিদ্রা নিবারণ করে। ক্ষয়রোগেও অস্ত্রবিধ দূষিত কাসরোগের ফুঁ ফুঁ প্রদাহ হঠলে এবং তৎপক্ষে মুহ মুহ জ্বর ও অধিক অবসন্নতা থাকিলে ইহার প্রয়োগ দৃষ্টফল। স্তম্ভপিত্তের ক্রিয়াবিকারে সাতিশয় "বুদ্ধ ধড় ফড়ানি"র সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী মুচ্ছা লক্ষিত হইলে মুগনাভি দ্বারা বিশেষ ফল হয়। মুগনাভির বাহু প্রয়োগে দূষিত ক্ষত ও কুষ্ঠাদি আরোগ্য হয়, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে এই মূল্যবান বস্তুর প্রয়োগাপেক্ষা করবৌরাদি বহুবিধ স্থূলত উদ্ভিজ্জ বিশ্বসংসারে রহিয়াছে।

ডাঃ কলেন বলেন রসবাত রোগ (gout) আরোগ্যোগ্রুধ হইলে তখন মুগনাভি ব্যবহার করা উচিত, তদ্বারা সম্পূর্ণ প্রতিকার লাভ হয়, ও দেহ সবল হইয়া রোগবীজ এককালীন দূরীভূত হয়। ডাঃ উড বলেন—ইহা হিষ্কা নিবারণেরও মহৌষধ এবং এই উপক্রমে অস্ত্রান্ত ঔষধ বিফল হইলে ইহার শক্তি অমোঘ। যাবতীয় রোগের শেষাবস্থায় যখন দেখা যায়, নাড়ী ক্ষীণ, হস্তপদ শীতল হইয়া প্রাণবায়ু উড্ডীন হইবার সূচনা, তখন ইহার প্রয়োগ চিরপ্রসিদ্ধ। দেখা গিয়াছে মুগনাভি খাটা হইলে সেই অস্তিমাবস্থায় লুপ্ত নাড়ীও পুনঃপ্রকাশ পায়, শরীরের উত্তাপ ফিরিয়া আসে, তবে বাঁচা না বাঁচা জ্ঞেয়রাধীন। মকরধ্বজের সহিত প্রযুক্ত হইলে এই শক্তি সমধিক প্রকটিত হয়। বৃদ্ধাবস্থায় যখন সর্বদা রোগপ্রবণতা বা কফ কাশী হইতে থাকে, তখন একটু একটু মুগনাভি সেবন অভ্যাস করা ভাল, ইহাতে দেহ সবল ও দৃঢ় এবং জরার দ্রুত নিপাতন হইতে কথঞ্চিৎ বিমুক্ত হয়। বার্দিকাজনিত জীর্ণাবস্থায় বাঁহারা আফিং অভ্যাস করেন, তাঁহাদের আফিংয়ের সঙ্গে সামান্য

পরিমাণে মৃগনাভি সংযুক্ত হইলে দেহের স্তৈৰ্যঃ অপেক্ষাকৃত অধিক অম্লভূত হইতে পারে ।

• প্রসবাস্তে অবসরাদি নিবারণজন্য আত্রকাল স্ত্রীলোকদিগকে ভাল ব্র্যাণ্ডী পোর্ট (মদ্যবিশেষ) খাওয়ান হইয়া থাকে ; ইহার পরিবর্তে একটু একটু মৃগনাভি সেবন করাইলে, এই অভাষ্ট অধিকতর সিদ্ধ হইতে পারে ।

মৃগনাভির মাত্রা—স্নিকিরতি হইতে পাঁচ রতি পর্য্যন্ত । সাধারণ মাত্রা ১ রতি । ধাতু বিশেষে ও অবস্থাবিশেষে কমবেশী করা আবশ্যিক হয় । মৃগনাভি ষটিত শাস্ত্রোক্ত ঔষধ যথা,—জ্বর বিকারের “কস্তুরীভৈরব,” মেহাদির “বসন্তকুম্ভাকর,” যক্ষ্মার “বসন্ততিলকরস” ও কাঞ্চনাত্র” বহুমূত্রগণ ও রসায়ন “মহামীলকণ্ঠ” রস, মেহ ধাতুদৌৰ্জলোর “কস্তুরী মোদক” রসায়ণও বাজীকরণের বৃহচ্ছন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, অমৃতপ্রাশবৃত, বাতব্যাদির মহারাজ প্রসারণী তৈল ইত্যাদি ।

কাঁটানটে ।

বাজালা নাম—উপরি উক্ত ; হিন্দী নাম—চোলাই বা চোড়াই ; ইংরাজী—*Priky Amaranth*, সংস্কৃত পর্য্যায়ঃ—তণ্ডুলীয়ো মেঘনাদঃ কাণ্ডের স্তম্ভুলেরক । তণ্ডুর স্তম্ভুলীবজ্জো বিষন্ন স্বল্পমারিষঃ । সংস্কৃত নাম—তণ্ডুলীর, মেঘনাম, কাণ্ডের তণ্ডুলেরক, তণ্ডুর, তণ্ডুলীবীজ, বিষন্ন, অল্পমারিষ ।

কাঁটানটের গাছ ঝোপযুক্ত, এক বা দেড় হাত উচ্চ পাতা জ্বলম্বা—এক বা দেড় ইঞ্চি চওড়া, ডালে কাঁটা থাকে জঙ্গলে বা পতিত জমিতে অল্পে ও বহুল পরিমাণে জন্মে । এই গাছ নানা জাতীয় আছে ক্ষুদ্রেনটের উল্লেখকালে দ্রষ্টব্য ।

তণ্ডুলীয়ো লঘুঃ শীতো রুক্ষঃ পিত্ত কফাস্রজিৎ ।

স্বষ্ট মূত্রমলো রুচ্যো দীপনো বিষ হারকঃ ॥

রস—মধুর, বিপাক—মধুর ; বীৰ্য্য—শীত ; গুণ—রুক্ষ, কফপিত্তর, রক্ত বোধক, রুচিকর, অগ্নিদীপক, প্রভাব—মলমূত্র শোধক, বিষহর (বাটীয়া প্রলেপ দিলে কীটজ বিষনাশক ।)

কাঁটানটেঁর পাতার গুণ ।

তণ্ডুলীয়কদলং হিমমর্শঃ পিত্তরক্তবিষকাসুবিনাশি ।

গ্রাহকং সমধুরং চ বিপাকে দাহশেষশমনং কুচি-দায়ি ॥

রাজনির্ঘণ্ট ।

কাঁটা নটেঁর পাতা শীতল এবং অর্শ, রক্তপিত্ত, বিষ দোষ (প্রলেপে) ও কাসনাশ । মলরোধক, পাকে মধুর, দাহী ও ক্ষয় (রক্ত ও শুক্রের) প্রশমক, এবং কুচিপ্রদ ।

মূলের গুণ ।

তণ্ডুলীয়ক মূলং শ্বাদ্ উষ্ণং শ্লেষ্মবিনাশনম্ ।

রজোরোধকরং রক্তপিত্ত প্রদর সংহরম্ ॥ (সংগ্রহোক্ত)

কাঁটা নটেঁর মূল উষ্ণবীৰ্য্য, শ্লেষ্মনাশক, রজোরোধক, রক্তপিত্ত ও শ্বেত-প্রদর নিবারক ।

প্রয়োগ—সচরাচর ইহহার মূলের রস বা পিষ্ট মূল ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহা ঈষৎ খারকগুণ যুক্ত বলিয়া মেহ ক্রামাশয় রক্ত পিত্ত ও প্রদর প্রভৃতি রোগের শ্রাব নিবারণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । উর্দ্ধগ অপেক্ষা অধোগ-শ্রাব নিবারণেই ইহার অধিকতর শক্তি । কাঁটানটেঁর মূল অল্প গোলমরিচসহ বাটিয়া লাগাইলে মাথাধরা ও শির-দব-দবার্নি আরোগ্য হয় । কাঁটানটেঁর মূল, রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, শ্যামালতা ও শিরিষ বহুল একত্র জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটকের জ্বালা নিবারণ হয় । ভাঃ প্রঃ । কাঁটানটেঁর মূল ও রসাজন, তণ্ডুলজল ও মধুসহ সেবনে রক্তপ্রদর আরোগ্য হয় । ভাঃ প্রঃ । শুষ্ঠ, কাঁটানটেঁর মূল ও বামনহাটী ঈষৎক্ষ জলসহ সেবন করিলে খাস দূরীভূত হয় । ভাঃ প্রঃ । শাল্লোক্ত অশোকঘৃতে কাঁটানটেঁর মূল আবশ্রুক হয় ।

কাঁঠাল ।

বাঙ্গালা নাম—ঐ, হিন্দী কট্‌হর ; ডাক্তারী নাম—Jack or Arto carpus. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—পনসঃ কণ্টকিফলঃ পনশোতি বৃহৎফলঃ । সংস্কৃত নাম—পনস, পনশ, কণ্টকি ফল, অতি বৃহৎ । অন্যান্য নাম—অপ্প, কলদ,

ফুলকণ্টকল, আশয় মূরঞ্জকল, পলস, চম্পাভকাথ, মূরঞ্জফল, মহাসর্জ, কলিন, কণ্টাকল, পূতফল।

• কাঁঠালের গাছ বোধ হয় কাহারও অজানা নাই। ফলের ক্ষুদ্রত্ব ও বৃহৎ এবং মিষ্টতার অগ্নাধিক্য হেতু ইহা তিন্ন তিন্ন প্রকায়ের আছে। এক জাতীয় কাঁঠাল আছে, তাহার অধিকাংশ ফলই মূলদেশের নিকটে জন্মে, ফল বড় হইলে ক্রমে মৃত্তিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, ও তথায় পরিপক হইলে বাহির করিয়া লইতে হয়। অপর এক প্রকার কাঁঠালের কোষের অভ্যন্তর হইতে গোলাপজলের মত রস বাহির হয়।

পনসং শীতলং পকং স্নিগ্ধং পিত্তানিলাপহম্ ।

তর্পণং বৃহণং স্বাহু মাংসলং শ্লেষ্মলং ভৃশম্ ॥

বল্যং শুক্রপ্রদং হস্তি রক্তপিত্ত ক্ষতব্রণান্ ।

মজ্জপনসঙ্কো বৃষ্যো বাতপিত্তকফাপৃহঃ ।

বিশেষাৎ পনসো বর্জ্যো গুন্নিভির্মন্দবহ্নিভিঃ ॥

কাঁঠালের মজ্জা শুক্রবর্দ্ধক, বাতপিত্তকফরূ ; গুল্ম ও অগ্নিমান্দ্য রোগীর ইহা বিশেষরূপে পরিভোজ্য।

(পঙ্কের) রস—মধুর ; বিপাক—মধুর ; বীর্য—শীতল ; গুণ—স্নিগ্ধ, বাতপিত্তহর, তর্পণ (আপ্যায়নকারী বা পোষণ) বৃহণ (ফুলতাকর) মাংসবর্দ্ধক, অত্যন্ত শ্লেষ্মপ্রদ, বলকর শুক্রজনক ও ক্রীণ রক্তপিত্তরোগী ও ক্ষত এবং ব্রণ রোগীর উপকারী।

অপরূ কাঁঠালের গুণ ।

আমং তদেব বিষ্টস্তি বাতলং ভুবরং শুক্র ।

দাহক্ৰন্ মধুরং বল্যং কফ সেদোবিবর্দ্ধনম্ ।

কচি কাঁঠাল (ইচড়) শুক্রপাক উদরের শুভজনক, বায়ুবর্দ্ধক, (অতি ভোজনে) দাহজনক, মধুর কষায়রস, বলকর ও কফমেদো বৃদ্ধিকর।

কাঁঠালবীজের গুণ ।

পনসোভূত বীজানি বৃষ্যানি মধুরানি চ ।

শুক্রনি বহুবিট্কালি সৃষ্ট মূত্রানি সংবদেৎ ॥

কাঁঠালের বীজ শুক্কর ও কাঁঠালদীপক, সুমধুর, গুরুপাক, কোষ্ঠবদ্ধতা-
কর, মূত্রনিঃসারক ।

প্রয়োগ—খক কাঁঠালের কোষ খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যে
গুলি স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ কটিন তাহা উত্তম “জলখাবার” হয়, আর যেগুলি
অতি কোমল তাহার রস জ্বের সহিত মিশ্রিত হইলে অতীব রসনামুখকর
হইয়া থাকে । কাঁঠাল অতি উৎকৃষ্ট ফল, তবে যে উহা আধুনিক ভঙ্গসমাজে
ততটা আদৃত হয় না, তাহার কারণ যে উহা পরিপাক করা বড় লজ্জ নয় ।
এতদ্ ব্যতীত ইহার কোনও অপরায়ণ নাই ; সমধিক ভোজন-শক্তি শিক্ষিত
সমাজের অভ্যন্তরে ক্রমে গল্পকথা হইয়া দাঁড়াইতেছে, সুতরাং কাঁঠাল অপার্থী
বই আর কি ? জীর্ণ হইলে ইহা অত্যন্ত বলকর পুষ্টিকর ও শুক্রের গাঢ়তা
বৃদ্ধিকারক । বিশেষতঃ কাঁঠালের বীজ অতীব উপাদেয় জিনিস । ইহা
যেমন সুস্বাদু, তেমনি বলপুষ্টিকর, বহল-প্রচলিত গোলানু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ
বলিলে অত্যাক্তি হয় না । কাঁঠালের সময়ে যত্ন করিয়া বালুকার অভ্যন্তরে
রাখিলে তদ্বারা সারাটা বৎসর রন্ধনের এক সুন্দর উপকরণ সর্বদাই গৃহে
প্রস্তুত থাকে । অভাবে শুধু ভাতে দিয়া তৈল-লবণ মাখিয়া খাইলেও
বেশ রুচির সঙ্গে অন্ন উদরসাৎ করা করা যায় । কি নিরামিষ তরকারীতে
কি মৎস্যের ঝোলে উভয়ত্রই ইহা বেশ মজে । সিদ্ধ হইলে ইহার ভিতরে যে
আঠাবৎ অংশ লক্ষিত হয় তাহা শরীরের ও মস্তিষ্কের পুষ্টি সাধক এবং শুক্রের
গাঢ়তা সম্পাদক । ইহা কাট খোলায় বা বালুকাসহ ভাজিয়া লইয়া খাইতে
অতীব সুস্বাদু হয় ; এমন কি, ভাজার চূর্ণসহ যদি কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি
যথাপ্রয়োজন সুজি চিনি সুতাদি মিশাইয়া এক নূতন খাদ্য প্রস্তুত করিতে
পারেন তবে উহার নিশ্চয়ই সর্বত্র সমাদর হয়, বিশেষতঃ উহা বিলাতে
পাঠাইতে পারিলে নীরস-বিস্কুট-সেবী ইংরাজদিগের নিকটে সম্ভবতঃ আদ-
রের পরাকাষ্ঠা পাইতে পারে । ফলতঃ কাঁঠাল ফল সুপক কোষের জন্ত না
হউক নিজ-প্রস্তুত বীজগুলির জন্ত যে বিশেষ সমাদর যোগ্য তদ্বিষয়ে অনুমাত্র
সন্দেহ নাই । রীতিমত বীজের ব্যবসায় প্রচলিত থাকিলে গোলানুর অতটা
শুভম থাকিত না । ঔষধীয় ভাবে দেখিতে গেলেও ইহার কতকগুলি বিশিষ্ট
শক্তি আছে । কোমরে দজ হইলে ইহার কচি পাতা কোমরে লাগাইয়া

কাপড় পরিয়া থাকিতে হয় ; তাহাতে অমনেক্তর আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি, কাঁঠালের ভোঁতা (অস্তর্ধূমে) উত্তমরূপে পোড়াইয়া ক্ষার করিয়া লইয়া তাহার সহিত সিজের আঠা ও হরিদ্রাচূর্ণ মিশাইয়া অর্শের বলিতে প্রলেপ দিলে উহা বিলীন হয় । এই ক্ষারে শোধিত হিং চূর্ণ মিশাইয়া গোমূত্রসহ পান করিলে প্লীহার নির্যাতন হয় । পল্লীগ্রামে একুপ বিশ্বাস আছে যে প্লীহারোগী একটা সমগ্র কাঁঠাল একুলা একঘোষুগ খাইতে পারিলে প্লীহা আরোগ্য হয়, এ প্রক্রিয়া অবিশ্বাস-যোগ্য নহে, তবে সহরে লোকের পক্ষে ইহা কদাপি খাটেনা । বহুমূত্র ও অজীর্ণ রোগীর পক্ষে কাঁঠালবীজ অনিষ্টকর । কাঁঠালের সাদা ক্ষীর জমাইয়া পাখী ধরিবার আঠা প্রস্তুত হয় ।

সমালোচনা ।

ভৌতিকতত্ত্ব—শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ বসু প্রণীত । মূল্য ১। ইহাতে প্রকৃতিদেবীর বাহ্যগুণ গঠনসৌষ্ঠব ও নিগূঢ় প্রক্রিয়া কলাপের বিচারণা আছে । এই নৃত্যল-নাটক-বিভ্রাটের দিনে এমন স্মৃষ্টি-সম্পন্ন জ্ঞানপ্রদ পুস্তক যিনি রচনা করেন তিনিও ধন্ত, আর যাহার পড়িবার স্পৃহা হইবে তিনিও ধন্ত । অমৃত বাবু যদিও কালের দুর্দম পরিবর্তনে জীবিকার জন্ত পর-বৃত্তি ভোগী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ধমনীতে স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞানসিঁপিপাতার অপ্রতিহত প্রবণতা সঞ্চারিত হইতেছে ; যেহেতু তাঁহার পিতা (৬ নবানকৃষ্ণ বসু) ইতঃপূর্বে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের এক প্রধান আদর্শস্থানীয় অধ্যাপক ছিলেন । তাই অমৃত বাবুর লেখা ও মুখের কথা—এতদুভয়ের কোনটাই বাজে দৃষ্টিতে পাইনা—সকলই শিক্ষাপ্রদ ও গাভীর্ঘ্য-পূর্ণ । এ পুস্তক স্কুলের পাঠ্যরূপে প্রচলিত হওয়া উচিত ।

কবিতা কুঙ্কম—মূল্য ১/০ আনা মাত্র । বেশ সুন্দর । উপরে গ্রন্থ-কারের নাম শ্রীশ্যামলাল বসাক ;—বিদ্যারত্ন, কবিরত্ন বা এম্ এ বিএ, প্রভৃতির কিছুই নয় । কিন্তু ভিতরে প্রবেশমাত্রই চমৎকৃত হইলাম, বুলিলাম উপাধি ব্যাধিরেবচ* বহন করিয়া কি হয় ? ঈশ্বর-দত্ত ও অধ্যাবসায়-বর্ধিত

শক্তিই বর্ধার সারবস্তী। স্বর্গব্রাহ্মণ, এবং পদ্মটিকা ছন্দোবিরচিত কয়েকটি কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছে। বাহাদুরী এই, ইহাতে একটাও চাঁদমা মুখানি প্রভৃতি হালি-চালানের ভূঁইকোড় কবিদিগের সদা-সেবিত কথা নাই। লেখায় বেশ খাঁটা বাঙ্গালা, গাম্ভীর্য ও ভাবুকতা আছে। স্থানে স্থানে কেবল একটু শ্রুতিকটু হইয়াছে। তা' অত গুণের ভিতরে ক্ষমনীয় বটে।

সঙ্গীত-সমিতি—বারাণসী ঘোষের দ্বীটে অবস্থিত। উদ্দেশ্য, সারা-দিনের নিজ নিজ পরিশ্রমাস্তে দশ তত্বলোকে মিলিত হইয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। উদ্দেশ্য খড় মহৎ। কলিকাতা শ্রামবাজারের সনামধ্যাত উদারচেতাঃ শ্রীযুক্ত বাবু অমূল্যচরণ বহু মহর্ষর ইহার স্থান-স্থিত। তিনি এই সমিতির গুণ কার্যিক আর্থিক নানাভাবে বহু ত্যাগ-স্বীকার পূর্বক উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এক্ষণে স্বযোগ্য অধ্যক্ষ দ্বয়ের হস্তে ভারার্পণাস্তে স্বয়ং অবসর লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত গোপালবাবু, সতীশবাবু ও প্রসাদ-দাস ইহার প্রধান স্তম্ভত্রয় স্বরূপ, তজ্জগু প্রথম হইতেই সমিতির বেশ উন্নতি হইতেছে। কয়েকদিন পূর্বে মাননীয় ছোট লাট মহোদয় সমিতির কার্য কলাপ ও আয়োজন দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন—সেদিন সমিতিভবনে “ন স্থানং তিলধারণং” হইয়াছিল। সঙ্গীত সমাজ নামে এই জাতীয় আর একটা সভা আছে, সেইটা প্রথমে গঠিত হইয়াছিল, আমরা উত্তর সভারই হিতধামনা করি। বারাস্তরে উভয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করিখ।

জুয়েলার—শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ একজন সিদ্ধ-হস্ত প্রসিদ্ধ জুয়েলার। ইহার দোকানে অতি উৎকৃষ্ট সুরগালকার স্বল্প সময় মধ্যে প্রস্তুত হয়। অবিনাশ বাবু কলিকাতার এক সুবিখ্যাত বুনিসাদী বংশোদ্ভূত। আমরা তাঁহার দ্বারা কএকটা কার্য্য করাইয়া দেখিয়াছি তাঁহার কাছে প্রবন্ধনা বা প্রণীড়নের আশঙ্কা নাই। দোকানের ঠিকানা ৭১১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। ১৯০০, ফেব্রুয়ারী। ১৩০৬, ফাল্গুন।

মূল্য বার্ষিক সর্ডাক ১।

কবি

আয়ুর্বেদ ও ধর্মনীতি বিষয়ক
মাসিক পত্র।

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট-স্থিত

আয়ুর্বেদ বিদ্যা মন্দির
হইতে প্রকাশিত।

পবর্গমেন্ট উপাধি ও সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,
কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাভিনোদ-কবিভূষণ
সম্পাদিত।

বিষয়—গোপাল-স্তোত্রম্, অঙ্কারের দোষ ও গুণ, সফল অমৃত্যুতাপ,
বিধবারা হিন্দু সমাজের ভূষণ, চিনির-বলদ, হিন্দু-ললনা, চরকায় নীতি,
ঋষ্যগুণ বিচার।

১০ ড্যান্স পাঠাইয়া বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসাধন নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক লউন।

“ঋষি”-পত্রিকার নিয়ম ।

- ১। “ঋষি” বাঙ্গালা মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (হুলজ্বা বিঘ্ন না হইলে)
অবিচলিত-নিয়মে বাহির হইবে। কোন গ্রাহক কোন মাসের “ঋষি” না
পাইলে তাহার পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জানাইতে হইবে। নচেৎ
ইহার জন্ত আমরা দায়ী নহি। আকার (অনুন) ডিমাই ৮ পেজী ৩ ফর্মা ।
- ২। মূল্য, অগ্রিম বার্ষিক ১ টাকা। প্রতি-সংখ্যার নগদ মূল্য ১/০৭
- ৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ অল্পগ্রহপূর্বক গ্রাহক-নম্বর-সহ নাম-
ধাম-আদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। নূতন গ্রাহকগণ “নূতন” এই কথাটির
উল্লেখ করিবেন।

প্রকৃতির শিক্ষা ।

উৎকৃষ্ট ভাবময়ী পদ্য-পুস্তিকা। ইহাতে সৃষ্টির ক্ষুদ্রমহৎ সমস্ত বস্তুকে, এক
নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে পাইবেন। পৃড়িলে ভাবকের মন প্রকৃতির মনোহর
ছবি দেখিয়া উন্নত হয় ও ভক্তের হৃদয়, দ্রবীভূত হইয়া, ভগুবানের দিকে
শ্রোতোরূপে বহিয়া যায়। মূল্য ১০ আনা। মুফসলবাসী ১০ আনা ডাঃ ট্যান্স
কবিরাজ মহাশয়ের ২০২ নং কর্ণওয়ালিসের ঠিকানায় পাঠাইয়া লউন।

হিত-কথা—বালক বালিকাদিগের নীতি ও স্বাস্থ্যানুভূতিমূলক আমোদ-
জনক স্থললিত কবিতাপুস্তক। মুখস্ত রাখিলে ভবিষ্যতে অনেক উপকার পাইবে।
বুদ্ধদিগেরও শিখিবার অনেক বিষয় আছে। ঋষি কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১/০

তবলা তরঙ্গিনী—ঢাকার প্রসিদ্ধ তবলার ওস্তাদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার
বনিক্য প্রণীত। ইহাতে কাহারও সাহায্য ব্যতীত নিজে নিজেই তবলা
শিখিতে পারা যায়। মূল্য ১১/০। শ্রীশুকুন্দাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়।

প্রেমগাথা—সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তফী
প্রণীত। মূল্য ১ টাকা, ভাল বাধাই ১১/০, এমন সুন্দর সুরসাল প্রাণমুগ্ধকর
কবিতা পুস্তক প্রায় দেখা যায় না। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। প্রাপ্তির
ঠিকানা শ্রীযুক্ত শুকুন্দাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান।

ফেব্রুয়ারি দে এণ্ড কোং

৪৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

সম্প্রতি বিলাত হইতে নীতোপযোগী নানাপ্রকার বনাত, সার্জ, ফ্ল্যাশাল,
মেরিনো প্লাভ্‌ডি উৎকৃষ্ট বস্তাদি আমদানি করা হইয়াছে। অর্ডার পাইলে
অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পোষাক তৈয়ারি করিয়া দেওয়া যায়।

Civil and Military Tailors, Army Contractors &c. &c.

English Cutter.

45, Radhabazar, — Calcutta.

ঋষি ।

২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ।

১০৩৬, ফাল্গুন ।

গোপাল-স্তোত্রম্ ।

(৮ ঈশ্বরচন্দ্র-বিদ্যাসাগর-বিরচিতম্)

পরম পূজ্য, প্রাতঃস্মরণীয় ৮ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্তবটির রচয়িতা। যখন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন তিনি এই শ্লোকগুলি এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে রচনা করিয়া ছিলেন। ভাবের মাধুর্য, ভক্তির প্রাচুর্য, ভাষার সৌন্দর্য ও রচনার চাতুর্য দেখিলেই তাঁহার কবিত্ব ও হৃদয়বস্তুর আশ্চর্য্য প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। বাল্যকালেই বড়লোকের যে প্রতিভার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, এই শ্লোক গুলিই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। কিংসূত্রে ৮বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্তবটি রচনা করিয়া ছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের কথায় বলিয়া দিলাম :—

“সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক, পূজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে, মধ্যে মধ্যে, পদ্য রচনা করিতে বলিতেন। তদনুসারে, অনেকেই, তাঁহার সমক্ষে বসিয়া, পদ্য রচনা করিতেন। আমি, অক্ষম বলিয়া, পদ্য রচনায় কদাচ প্রবৃত্ত হইতাম না। বার্ষিক পরীক্ষার রচনায় পারিতোষিক পাঁচুবার পর, তিনি বলিলেন, আর আমি তোমার ওজর শুনিব না; অদ্য তোমায় পদ্য রচনা করিতে হইবেক। এই বলিয়া, তিনি পীড়াপীড়ি করাতেন, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, আমার পদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। “গোপালায় নমোহস্ত মে,” এই চতুর্থ চরণ নির্দিষ্ট করিয়া, এক ঘণ্টা সময় দিয়া, সকলকে শ্লোকরচনায় নিযুক্ত করিলেন। আমি, পরিহাস করিয়া, ঈর্ষাসা করিলাম, মহাশয়, আমরা কোন্ গোপালের বর্ণনা করিব।

এক গোপাল আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন ; আর এক গোপাল বহু-কাল পূর্বে বৃন্দাবনে লীলা করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। এ উভয়ের মধ্যে, কোন গোপালের বর্ণনা আপনকার অভিপ্রেত, স্পষ্ট করিয়া বলুন। পূজন-গাদ ভূর্কালঙ্কার মহাশয়, আমার এই কৌতুককর জিজ্ঞাসা-বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, হান্তপূর্ণ বদনে বলিলেন, বৃন্দাবনের গোপালের বর্ণনা কর। তিনি এক বর্ণটা সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন ; ঐ একটু বর্ণটার, আমি পাঁচটির অধিক শ্লোক লিখিতে পারিলাম না। তিনি শ্লোক পাঁচটি দৃষ্টিগোচর করিয়া সান্তিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তদর্শনে, আমার, যার পর নাই, আনন্দ ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। সেই পাঁচটি শ্লোক এই :—

(১)

যশোদানন্দকন্ডার নীলোৎপলদলশ্রিয়ে ।
নন্দগোপালবালায় গোপালায় নমোহস্ত মে ॥
যশোদা মাতাধ যিনি আনন্দ-কারণ,
নীলোৎপল সম যার শ্রামল বরণ,
গোপাল বালক যিনি শ্রীনন্দ রাজার,
সেই গোপালের পদে প্রণাম আমার !

(২)

ধেমুরক্ষণদক্ষার কালিন্দীকূলচারিণী ।
বেণুবাদনশীলায় গোপালায় নমোহস্ত মে ॥
গোপালন-কার্যে যিনি দক্ষ বিলক্ষণ,
কালিন্দীর কূলে যিনি করেন ভ্রমণ,
বেণুবাদ্য করিবার স্বভাব সাঁহার,
সেই গোপালের পদে প্রণাম আমার !

(৩)

ধৃতপীতহকূলার বনমালাবিলাসিনী ।
গোপজীপ্রেমলোলায় গোপালায় নমোহস্ত মে ॥

পীত ক্রোমবস্ত্র যিনি করেন ধারণ,
 বনমালা পাইলেই মজে যার মন,
 গোপীদের প্রেম-রসে পিপাসা যাহার,
 সেই গোপালের পদে প্রণাম আমার!

(৪)

রুক্মিবংশাবতংসায় কংসধ্বংসবিধায়িনে ।
 দৈভেয়কুলকুলায় গোপালায় নমোহস্ত মে ॥
 বাদব-কুলের যিনি সুন্দর ভূষণ,
 দ্রুত কংসের যিনি ধ্বংসের কারণ,
 দৈত্যগণে করিলেন যিনিহ সংহার,
 সেই গোপালের পদে প্রণাম আমার !

(৫)

নবনীতৈকচৌরায় চতুর্বর্গেকদায়িনে ।
 জগন্তাণ্ডকুলায় গোপালায় নমোহস্ত মে ॥
 ননীচৌর নাম যার এই ত্রিভুবনে,
 একমাত্র কর্তা যিনি চতুর্বর্গ-দানে,
 বিশ্বতাণ্ড রচিবার যিনি কুস্তকার,
 সেই গোপালের পদে প্রণাম আমার !

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ ।

অহঙ্কারের দোষ ও গুণ ।

প্রায় সকলেই বলেন—“অহঙ্কার একটা মহাদোষ ।” শাস্ত্রেও আছে—
 “নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ ।” অর্থাৎ অহঙ্কারের অপেক্ষা বড় শত্রু আর
 নাই । কিন্তু শুধু দোষময় কি জগতে কিছু আছে? সদ্যঃ প্রাণহর বিষও
 সুপ্রয়োগের গুণে অমৃতাদিক গুণকর হইয়া থাকে । শিরোভেদী বস্ত্রও
 বিজ্ঞান-কোবিদের হস্তে পরিচালিত হইয়া মনুষ্যের উপকার সাধন করে ।

এইরূপ, মানব চিন্তের কোনও বৃত্তিই বিশ্বনিয়ন্ত-কর্তৃক বৃথা আরোপিত হয় নাই। যে বৃত্তি নিতান্ত অহিতকরী বলিয়া আমাদের আপাত-প্রতীতি হয়, তাহার মূলেও জগৎ বিধাতার একটি নির্গূঢ় শুভ উদ্দেশ্য আছে। খাটাইতে পারিলে তাহা হইতেও কাজ পাওয়া যায়।

একপে দেখা যাউক—‘অহঙ্কার’ শব্দের অর্থ কি? অহং অর্থ আমি। কারের অর্থ ক্রিয়া, ভাব বা অনুভব। অহঙ্কার বলিলে আমিভের বুদ্ধিকে বৃত্তিতে হইবে। অর্থাৎ সোজাকথায়, “আমি নিজ-কোশলে করিয়াছি, আমি ঐশ্বর্য্য প্রভাবে কিনিয়াছি, আমি শক্তিবরা পরাজিত করিলাম, আমি পরিশ্রম বা বুদ্ধির গুণে এম এ পাশ করিয়াছি” ইত্যাদি আত্মগত উৎকুল্ল অনুভূতিকেই অহঙ্কার বলা যায়। এই আত্মগত গৌরব-বুদ্ধিই মানবের উন্নতির মূল। আমি পরিশ্রম গুণে আরক্ক কার্য্যে উত্তীর্ণ হইলাম এ ধারণা আমার না থাকিলে আমি কার্য্যান্তরে হস্তক্ষেপ করিব কেন? যদি সকল প্রকার সিদ্ধ-লাভ কাকতালীর বা অক্ল দৈবাবধীন—এরূপ বিশ্বাসে নির্ভর করিতে হয় তাহা হইলে সাধনীয় কার্য্যে উদ্যম ও অধ্যবসায় আসিবে কোথা হইতে? তা হলে ত সম্মুখস্থিত প্রত্যেক কার্য্যে হস্তপ্রসারণ না করিয়া হাত দুটা গুটাইয়া সাক্ষ-লোচনে উর্দ্ধমুখ ও উর্দ্ধবাহু হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

আমার যে বিষয়টা লইয়া অহঙ্কার, আমি তাহা ভাল বাসি, আমি বাহা ভালবাসি, আমার তাহা থাকিলে সংরক্ষণের চেষ্টা স্বাভাবিকী। যদি তাহা না থাকে, তাহা উপার্জননের প্রয়াসও স্বতঃপ্রসূত। যদি আমার কোলীন্তের অহঙ্কার থাকে, আমি নীচের সহিত কখনই মিশ্রিত হইব না। আমি যদি বিদ্যাকে অহঙ্কার-যোগ্য বস্তু মনে করি, বিদ্যালাত ব্যতীত আমার আত্ম-প্রসাদ ছুঁট। যদি ধনকেই গৌরবাহঁ মনে করি, দারিদ্র্য্য নিশ্চয়ই আমার শিরঃপীড়ার স্থায়ী হুঃসহ।

মনে অহঙ্কারের আবির্ভাব হইলে আমরা যে আফালন-গর্ভ, কর্ণ-কঠোর ভাষা অবলম্বন করিয়া থাকি, সেটা অহং-বুদ্ধির দোষ নহে, দোষ আমাদের মানসিক দৌর্ভল্যের, আমাদের অসংযমিতার। যেমন ক্রোধেবু বাহুবিকশ ব্যক্তিভেদে নানারূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ অহঙ্কারের একট মূর্ত্তি

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যে বিভিন্ন রূপ হয় । এক বস্তুক্রোধাবিষ্ট হইয়া জীবদ্ হস্ত পূর্বক কেবল প্রতিকার চেষ্টাই অন্তরে আন্দোলন করিতে থাকেন, অপর বীক্তি সেই ক্রোধকে হুঃশ্রব কর্কণ ভাষায় প্রকাশ করে । এতদন্তর অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি হয় ত আবার হস্তপদাদির আক্ষেপ বা প্রহারাদির দ্বারা সেই ক্রোধোদ্ভাকে বহির্গত করে । তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে ক্রোধের সৃষ্টি করিয়া জগৎপিতা ভুল করিয়াছেন ? করনই নহে, ক্রোধের উদ্দেশ্য আত্ম-রক্ষা, ছুষ্টের দমন ও বিপত্তির প্রতিবিধান । শিশুর হস্তে পড়িলে অগ্নির মহিমা হস্ত-বস্ত্রাদি-দাহ পর্য্যন্ত, কিন্তু প্রিজরহস্তে সেই অগ্নিরই অনির্বচনীয় উপকারিতা পদে পদে লক্ষিত হয় । অগ্নির কোনও দোষ নাই, অগ্নি জগতে একটা উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে । এইরূপ, অহঙ্কার সজ্জনের চিন্তে সং-কার্যের প্রবর্তক, অসংবন্দীর কাছে তাহা অনর্থের মূল । ক্রোধের নিকৃষ্ট-তম পল্লিচয় যেমন প্রহারাদি প্রচণ্ড ব্যাপার, অহঙ্কারের জঘন্ততম বিকাশ তেমনি পরনিন্দা । যদি শুধু বলি আমি সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত, তাহাতে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি বলি আমি বিদ্যামাগরকে দশবৎসর শিখাইতে পারি-তাম, তিনি আমার তুলনার কিছুই জানিতেন না,—একথা শ্রোতৃ-মাজেরই হুঃসহ । নিকৃষ্ট-চিত্ত অসংযতব্যক্তির স্বকীয় গুণলেশকে পৰ্ব্বতোপম করিয়া পরগত গুণকে নিন্দা রালব্ব করালকবলে নিষ্কণ্ড করে বলিয়াই অহঙ্কার-বৃত্তি প্রচলিত হুর্নামটা প্রাপ্ত হইয়াছে ।

এক্ষণে বুঝা যাইতেছে, অহঙ্কারের প্রথম মূর্ত্তি মানসিক গৌরব বুদ্ধি, দ্বিতীয় মূর্ত্তি তাহার ভাষায় প্রকটন, তৃতীয় ও নিকৃষ্টতম মূর্ত্তি পরগুণে হেদাধারোপ । দ্বিতীয় মূর্ত্তি কিয়দংশে ক্ষমণীয়, ইহা অস্থানস্থ হইলেই দূষ্য হয় নতুবা নহে । কুবের যদি বলেন ত্রৈলোক্যের মধ্যে আমার মত ধনাঢ্য কেহই নাই, তবে কি তাহাও তত অপরাধ হয় ? অশ্রদেবের ঈদৃশোক্তি দোষ বটে ।

অহঙ্কারের ঐ নিকৃষ্টতম মূর্ত্তি ষথার্থ অহঙ্কারের সহিত কোনও রূপে সম্পৃক্ত নয় । সোণার যেমন খাদ, ধাত্তের যেমন মুৎকণা, বস্ত্রের যেমন ময়লা, অহঙ্কারের পার্শ্বে তেমনি পরকুৎসা । খাদ দেখিয়া সোণার নিন্দা অহুচিত ।

বাহার পরনিন্দা করা চিরস্বভাব, তাহারই মনে অহঙ্কারের ভাব উদ্ভিত হইলে ঐ স্বভাবটা জাগরিত হইয়া পড়ে । বাহার পুরাতন স্বাসরোগ আছে, শৈত্যসেবায় তাহারই স্বাস বহির্গত হইয়া পড়ে, অস্তের নহে ।

অহঙ্কারের দ্বিতীয় মূর্ত্তি অর্থাৎ নিজমুখে স্বগুণ-কীর্ত্তন তত দোষনীয় নয় বলিয়াছি ; কিন্তু তথাপি তাহা শ্রুত-মাত্র শ্রোতার কর্ণশীড়া উপাদান করে কেন ? তাহার কারণ এই, তুল্য গুণাবিত্যসকলেই নিজেকে বড় মনে করেন । সুতরাং তন্মধ্যে একব্যক্তি অপরের কাছে বড়াই করিলে, তাহার কাছে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছোট হইয়া পড়ে, সুতরাং উহার কথা তাহার অসহ হয় । অথবা যেগুণ সম্বন্ধে সেই ব্যক্তি অহঙ্কার করে, সে গুণ শ্রোতার না থাকিলে, তদগুণযুক্ত তাহার বন্ধুবর্গের কিঞ্চিৎ গৌরব হ্রাস হয়, তাহাঁও সে ভাল বাসেনা । দ্বিতীয়তঃ প্রশংসাটা বড় দুর্লভ বস্তু, তাহা কেহ দিলে, তবে পাওয়া যায় ; এমন দুর্লভ ধনটা কেহ নিজে নিজে আত্মসাৎ করিতে থাকিলে একটা অত্যাচার বলিয়া শ্রোতামাত্রেরই মনে প্রতীতি হয় । পুরোহিতের স্বহস্ত-কৃত বর্টন অপেক্ষা না করিয়া নৈবেদ্য নিজেই কাড়িয়া লইলে কাহার দেখিতে ভাল লাগে ? সুতরাং ঐ প্রকার অত্যাচার কেহই ভালবাসেনা । অজ্ঞাত ব্যক্তির উদ্যানেও যদি কেহ বলাৎকার পূর্বক পুষ্পগুলি অমথা ছিন্ন ভিন্ন করিতে থাকে তবে কি সম্পর্ক-বিহীন দর্শকেরও অপ্ৰীতিকর হয় না ?

আর এক জাতীয় গর্ভপরায়ণ লোক আছে, তাহারা নিজের কোনও গুণ নষ্ট থাকিলেও তদগুণ সম্বন্ধে তারস্বরে আত্মকীর্ত্তন করিতে থাকে । এই স্বভাবকে অহঙ্কার বলা উচিত নহে, ইহা বিশুদ্ধ মিথ্যা ভাষণ ও অতিরঞ্জন ; এই প্রক্রিয়া পরের উপরে পরিচালিত না করিয়া দুর্বুদ্ধি লোকে, সময় সময় আপনাদের উপরে খাটাইয়া দেখে ।

একদম অহঙ্কারের দোষের কথা বলিব । স্পষ্টজুরদেহু-মনোধারী মনুষ্য যতই চেষ্টা করুক, কিছুতেই সর্ব সময়ে সমভাবে সতর্ক ও অবহিত থাকিতে এবং নিজ গুণাবলিকে স্বেচ্ছায় রাখিতে পারে না । গায়কায়নী প্রতিদিন সন্ধান গায়না, বস্তা সর্বদা শ্রোতার সমান প্রীতি জন্মায় না । এরূপ স্থলে বিনয়ীকে বড় চতুর বলিতে হইবে । “কিছু জানি না” বলিয়া আরম্ভান্তে যদি কৃতকার্য হওয়া যায়, তবে কল শ্রোতার আশার অতিরিক্ত হওয়ার সম্ভেই

সস্তোষ সাধন হইয়া থাকে। আর “খুব জ্ঞানি” বলিয়া আরম্ভ করিবার পর যদি ছুঁইবাধীন আশাহুরূপ ফল না মিলে, তবে শ্রোতা বা দর্শকের ক্ষোভের, এমন কি উপহাস-প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। সুতরাং অহঙ্কার বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

দ্বিতীয় অহঙ্কার অনেকস্থানে আত্মবিশ্বাসিতিকে আনয়ন করে। নিজের গুণ সম্বন্ধে অতিমাত্র বিশ্বস্ত থাকিলে, তাহার ক্রমিক অপচয় ও দোষের সমাগম সংঘটিত হইতে পারে। শূশক নিজের দ্রুতগতিস্বে অহঙ্কৃত হওয়ার ভয়ক্রমে যুমিয়া পড়িল; নতুবা সে মন্দগতি কৃচ্ছপের দ্বারা পরাজিত হইবে কেন? অতএব অহঙ্কার অধিকাংশ সময়েই অহিতকর। বিধি-মত সেবিত মদ্য-শঙ্খের গুণাবহ বটে, কিন্তু অতীত হইলে বিধিটা রাখা দায়, তজ্জন্তই “মদ্য অপূত্র”। অহঙ্কারের কথাও সেইরূপ।

শেষ কথা—অহঙ্কারবৃত্তি মূলে অতীব কল্যাণদায়িনী। পাত্র-দোষে দোষ বলিয়া গণিত হয়। এই বৃত্তির সম্বন্ধে নিশ্চিতই বলা উচিত সেই রামপ্রসাদের কথা—“আবাদ ক’লে ফলতো সোণা।”

সফল অনুতাপ ।

মানুষ ভগবানের সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ। জীবনামে অভিহিত চেতন পদার্থ-গুলির মধ্যে, মানবের সমকক্ষ আর কেহই নাই। তিনি মৎস্যের বিশাল দেহ এবং ক্রমি কীটের ক্ষুদ্র শরীর, উভয়েরই উপর মানবের সমান আধিপত্য। অত্রংলিহ হিমাদ্রি এবং সৈকতলীনা ক্ষুদ্র বালুকা, এই উভয়েরই উপর মানব সমান দুর্পে পাদবিক্ষেপ করে। কোথায় কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে অবস্থান করিয়া, দৃষ্টি প্রভাবে ভূমিষ্ঠ শিশুর ত্রিশৎবর্ষ বয়ঃক্রম সময়, জীবন-প্রবাহের গতি রুদ্ধ করিয়া দিবে এই উৎকট জলন্ত ভবিষ্যদ্বাণী মানুষ ব্যতীত আর কেহই শোনাইতে পারে নাই। ভগবানের বিপুলরাজ্যে মানব বৃত্তি-ভোগিনী প্রজা হইলেও তাহার বিকাশ কোনরূপ সীমাবদ্ধ নহে।

কিন্তু এই বিকাশ সকল মানবের সমান দেখা যায় না। কেন দেখিতে

পাই না, ইহার উত্তরে মত ভেদ আছে। কেহ বলেন মাটির দোষে, কেহ বলেন বীজের দোষে, এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটে। বাঁহারা প্রথমমতের পক্ষাবলম্বী, তাঁহাদের মতে দারিদ্র্য, সমাজ, লোকসঙ্গ প্রভৃতি দোষে মাহুষের অভিলষিত উন্নতি হয় না। অপর পক্ষের লোকেরা বলেন, বীজপরিপুষ্ট হইলে দারিদ্র্যাদি অন্তরায় বিঘ্নরূপেই পরিগণিত হয় না। আমরা বলি উভয় পক্ষের মতই অবস্থা বিশেষে উপযোগী এবং যুক্তিসহ। দারিদ্র্য ও সমাজের নিপীড়নে নিষ্পেষিত হইলেও “কৃষ্ণদাস পাল” যে কারণে প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার উপযোগী হইয়াছেন, এবং এই মহানগরীর শত শত লক্ষ্যীর বরপুত্রের পঞ্চভূতাত্মক পীবর দেহ যে কারণে ধরিত্রীর ঋণ পরিশোধ মান্দেই পর্য্যবসিত হইতেছে তাহার প্রধান কারণ, সমুদ্রতাপের সফলতা ও নিষ্ফলতা।

দরিদ্র কৃষ্ণদাস কেরাণীর কার্য্য করিতে করিতে অপদস্থ হন। অপমানের প্রধান কারণ, তাহার অল্প-বিদ্যতা। তিনি অমুতপ্ত হইলেন। সে অমুতাপ, কালবিহঙ্গের পক্ষ তাড়নে নিৰূপিত না হইয়া বরং বাড়িতেই লাগিল। হৃদয় তাপিত হইল বটে, কিন্তু ভস্ম হইয়া অকর্ষণ্য হইল না! তিনি দারিদ্র্যের অর্দ্ধকারে সৌভাগ্য লক্ষ্যীর হুপূর-শিঞ্জন শুনিয়া দৌড়িতে লাগিলেন। ক্রমে এমন স্থানে আসিলেন, যেখানে আসিলে মাহুষ অমর হয়। যে পাবাণ প্রতিমূর্ত্তি মহানগরীর হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া সেই সুদূর-গত অমুতাপের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তাহা কাল্, কালের বজ্রকঠোর দণ্ডে নিষ্পেষিত হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণদাস সৌভাগ্যের প্রসাদে চিরকাল অমর শ্রেণীতে নিবিষ্ট থাকিবেন।

এরূপ অমুতাপ কয়জননের হয়? তোমার আমার অপমান বোধ বৈর-নির্যাতনেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। আমরা মনের মধ্যে রিপু পুষ্টিয়া শত্রু ধরিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থানা তুল্লাস করি। কিন্তু বুঝি না যে একটীবারমাত্র অমুতাপের দিয়াশলাই ঘসিয়া মনকে দক্ষ করিতে পারিলেই রিপু সকল পুড়িয়া ছাই হইবে। অনেকের অমুতাণ অপমানের স্তব্ধবর্ণে দগ্ধ করিয়া জলিয়া উঠে, কিন্তু পরক্ষণেই আলস্যের শীতল নিশ্বাসে নিবিয়া যায়।

আজ্ঞা সম্মান অপমান-বোধের মানদণ্ড। বাহার আত্ম-সম্মান বোধ যে পরিমাণে অধিক, তাহার অপমান বোধ সেই পরিমাণে তীব্র। এ সংসার

ঐশ্বর্য ও বিদ্যা প্রভৃতির সজ্জ্বৰ্ষ পদে পদে সজ্জ্বৰ্ষিত হয়। যাঁহার মহত্ব আছে, যাঁহার হৃদয়ের উত্তাপ আছে, সে তাহা সহিতে পারে না। কিন্তু অশক্তি হইয়া আদর্শের অনিষ্ট চেষ্টা করিলে তাহাকে হিংসা বঁলিব। এই হিংসা মানুষকে নরকের পথে লইয়া যায়। কিন্তু অমৃত্যুতাপ স্বৰ্গ-পথের অগ্রণী। অমৃত্যুতাপ ও উদ্যোগ যুগ্মপং কার্য করিলে বিধাতার সিংহাসনও কাঁপিয়া উঠে এবং সৰ্ব্বসংসারও ধৈর্য্য অপনীত হই।

এমন অনেক ক্ষণজন্মা পুরুষ থাকিতে পারেন, যাঁহার জীবনের প্রশস্ত পছন্দ পাদবিক্ষেপ করিবারাত্র সিদ্ধি সূক্ষ্মধীন হইয়া সৌভাগ্যের পুষ্পমাঝে অভিনন্দন করে। আমরা এ প্রবন্ধে তাঁহাদের উল্লেখ করিতেছি না। অর্থবা যে সকল ধনকুবের মাতৃকৃষ্ণি পরিত্যাগ করিয়াই আলস্যের অরিষ্ট-শয্যার জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাঁহারাও এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহেন। তবে যাঁহারা হস্ত, পদ ও হৃদয় মাত্র সঞ্চল লইয়া উল্লসবেশে বিপুল পৃথীর সমরাজ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহারা সৌভাগ্য লক্ষীর অনন্য রূপ-লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, আকাজ্জক স্বয়ংসর সত্য সমাহৃত হইয়াছেন, তাঁহারা হই অমৃত্যুতাপের পাত্র। সুতরাং তাঁহারা হই এ প্রবন্ধের সমালোচনীয়।

এতদূর যে অমৃত্যুতাপের কথা লিখিত হইল, তাহা ব্যক্তিগত হইলেও পরমুখাপেক্ষী। যখন সজ্জ্বৰ্ষে হৃদয়ের তাড়িত স্মৃতি হয় তখনই অমৃত্যুতাপ হইয়া থাকে। এই অমৃত্যুতাপ আমার ক্ষুদ্রতা ও অপরের মহত্বে প্রতীত হয়। কিন্তু আর এক প্রকার অমৃত্যুতাপ আছে, তাহা ধর্মগত। “আমি এতদিন সংসারে মগ্ন হইয়া তোমাকে ভুলিয়া ছিলাম, হে প্রভো! ক্ষমাকর শোক হৃৎখে হৃদয় ভস্মীভূত হইল।” ভগবানের প্রতি যে এবশ্প্রকার কাতরতা প্রকাশ, তাহাও এক প্রকার অমৃত্যুতাপ। ইহারও মূলে পক্ষাপক্ষের ভাব নিহিত আছে। একপক্ষে গংসার, অপর পক্ষে আমি, সংসার আমাকে প্রত্যাচন-বাক্যে বিপথে লইয়া গিয়াছে, অতএব সে আমার বিপক্ষ। হৃদয়ের বিচ্ছেদ জাগরিত হইয়া আমাকে বলিয়া দিল “রে মূঢ়! তুই কোথা বাই-তেছিস্? ঐ যে আপাত-মধুর সংসার, লোভের আমিষ নিক্ষেপ করিয়া মোহের গহন তামসে টানিয়া লইয়া বাইতেছে, ইহাতে তোর শ্রেয়ঃ হইবে না। এই আলোক জালিলাম, দেখ সম্মুখে কি ভীষণ, হর্গন্ধ, পুণ্ডিমর নরক

কুণ্ড ! সংসার ছুটিয়া পলাইল।^৬ আমি মাথার হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম।
হৃদয় হইতে মোহ সরিয়া যাইতে লাগিল। বিবেকে হৃদয়ের মলিনতা কাটিয়া
গেল। অকল্পিত কৰ্ত্তর কৰ্ম ভগবানের কর্ণে পৌছিল। আমি শান্তি পাই-
লাম। ইহাই সকল অমুতাপ এবং ইহাই সিদ্ধি লাভের মূলমন্ত্র ।

কিন্তু হার ! এইরূপ অমুতাপ করজন করিতে শিখিয়াছে ? তামসীর
নিন্দকতা ভেদ করিয়া, বিবেকের কিন্নরকৰ্ম সেই শক্তিধামের ঐশ্বর্য্য কিরূপ
বর্ণন করে তাহা শুনিবার জন্য কোন বিষয়ী বনিতার বাহুবলীর উৎকন দূরে
নিক্ষেপ করিয়া অতন্ত্রিত-নেত্রে বৌগনিশা অতিবাহিত করিতে পারিয়াছে।
কামনা বিষয়ীর উপাস্যদেবতা। বিষয়ীর অমুতাপ মুখের কথা মাত্র। তাহা-
দের মুখের সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধ নাই, অথবা হৃদয়ের রক্ত কেবল জঠরানল
নির্কাপিত করিতেই প্রবাহিত হয়।

যে রূপ অমুতাপই হউক না কেন, তাহা যে সুফল-প্রসূ, তদ্বিবয়ে অণুমাত্র
সন্দেহ নাই। যে ঠেকিয়া শেখে, সেই অমুতাপের দাহ বৃদ্ধিতে পারে।
যে অমুতাপের অণুকরণ গ্রহণ, সে আজন্ম নেত্র মুদ্রিত করিয়া থাকিলেও
অন্ধকার বিষয়রাশির পৈশাচিক ছবি ব্যতীত সেই অতীন্দ্রিয় বাক্য-মনের
অগোচর সত্যরাজ্যের কিরণ রেখা বিন্দুমাত্রও দেখিতে পাইবে না। অতএব
এস আমরা, অমুতাপ করিতে শিখি। অমুতাপের পবিত্র-বহি শিখায় হৃদয়
জ্বলিত হইয়া সংসার মালিন্য বিবর্জিত হউক।

শ্রীভার্যাপদ কাব্যতীর্থ।

“বিধবারা হিন্দু সমাজের ভূষণ।

“বিধবারা হিন্দু সমাজের ভূষণ।” এপ্রবন্ধের মীমাংসা করিতে হইলে,
অগ্রে বৈধব্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কথা বলা প্রয়োজন। এখানে অগ্রে তাহাই
বিস্তৃত করিতেছি।

বৈধব্য এক অতি মহৎ ব্রত। স্বার্থত্যাগ এত্রতের মূলমন্ত্র। যে মুহূর্তে
যে বিধবারা এত্রতে ব্রতী হইবেন, সৰ্বাগ্রে তাঁহাকে স্বার্থকে বলি দিতে
হইবে, বলিদান ইহার উদ্ঘোষন নহে, বলিদানই ইহার উদ্ঘোষন। এ বড়ই

কঠোর-ব্রত ; ইহার আচার-নিয়ম প্রতিপালন করা বড়ই কঠোর-কার্য। সকল দেশে সকল বিশ্ববাসিনী এভাবে দীক্ষিত হইতে পারেন না। কেবল হিন্দুর দেশে হিন্দু-বিধবা-সম্মতই আমরা এতত ধারিণী, অবরোধ-বাসিনী, ব্রহ্মচারিণী-মূর্ত্তি দেখিতে পাই। এততের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলই পদে পদে কঠোরতার ছায়া,—কঠোরতার বিভীষিকাময়ী-ছবি দেখিতে পাই। হিন্দু-বিধবা ধৈর্য্য আর সহিষ্ণুতাবলে সেই সকল মূর্ত্তি-গুলিকে পদদলিত করিয়া, আপনার ব্রত উদযাপনে অগ্রসর হন। অশনে-বসনে-শয়নে উপবেশনে কেবলই কঠোরতা। পীতে গ্রীষ্ম, বসন্তে বর্ষায়, দিবার নিশায়, সকলকালে এবং সকল সময়েই শুধু কঠোরতা। আমরণ তাঁহাকে এই কঠোরতার সংক্ষেপ করিয়াই অভ্যন্ত-সাধনে বিনিযুক্ত থাকিতে হয়। ফলতঃ একমুহূর্ত্ত পূর্বে যিনি জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার সিন্ধুর মুছিয়া যাইবে, হাতের লোহী হস্তচ্যুত হইবে, এবং তাঁহাকে সমস্ত ঐহিক সুখ-ভোগে-বিলাস-বাসনার জলাঞ্জলি দিতে হইবে,—জন্মের মত বিদায় দিতে হইবে, তিনি যে হঠাৎ পতি-বিয়োগের পরমুহূর্ত্ত হইতেই এতত ধারিণী, ব্রহ্মচারিণী মাজিয়া জীবিতকাল অতিবাহিত করিতেছেন, এ কি সামান্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় ? অকস্মাৎ এবিধম-পরিবর্ত্তন বাস্তবিকই প্রীলোকের গক্ষে কতই অসহনীয় ব্যাপার!!! আবার তাঁহাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে যে সকল কুৎসিত-বৃত্তি-নিচর রাজত্ব করিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ তাহাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া স্মদুরে বিতাড়িত করা কি সহজ কথা ? শুধু তাহাই নহে,—তিনি ধৈর্য্যের শাপিত-রূপাণে তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করিয়া আপনায় অবরোধ-বিগিনে নিকটকে ব্রহ্মচারিণী বেশে ব্রতোদযাপনে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। ইহা কি অল্প ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার পরিচয় ? অথবা কবির ভাষায়-বলিতে গেলে—

“They change their savage mind,

Their wildness lose, and quitting nature's part,

Obeys the rules and discipline of art.”

কিন্তু হিন্দু বিধবার গক্ষে এ ত্যাগ-স্বীকার বা আত্ম-সুখ-বিসর্জন তত আশ্রয়-সাধ্য নহে। কারণ এ সাধনা-সিদ্ধি তাঁহাদের অত্যন্তবিদ্যা। শৈশব-

কাল হইতেই তাঁহারা ব্রতনিষ্ঠ পালন করিয়া আসিতেছেন। এবং তৎকালে তাঁহাদিগকে উপবাস বা কন্যা আহারের কঠোরতা,—কর্কশ-শরনে শরন জ্ঞানিত কেশ-পরম্পরা সহ করিয়াই আসিতে হইতেছে। সুতরাং তাঁহাদের এততোদ্‌ঘাপন কষ্টসাধ্য বা আতঙ্ক উদ্দীপক হইতে পারে না। পরন্তু হিন্দুর সতীত্বধর্মের পরিষ্কার আদর্শবলে, হিন্দুর সমাজ সংগঠনের আধ্যাত্মিক প্রণালী প্রবৃত্ত, হিন্দুর ব্রত-বেদী গৃহের নিয়মানুসারে হিন্দু-বিধবা আমরণ ব্রহ্মচারিণী। পতি-ভক্তি, পতি-শ্রীতি, পরকালের স্থিরতীর বিশ্বাস, সামাজিক ব্যবহার আন্তরিক শ্রদ্ধা, পারিবারিক নিকামধর্ম, এই সকল পবিত্রভাব সংমিশ্রিত হইয়া হিন্দু-বিধবাকে আমরণ ব্রহ্মচারিণী করিয়া রাখিয়াছে। সাধারণতঃ হিন্দুসমাজ মধ্যে যিনি হিন্দুবিধবার উপর বল-ব্যবস্থিত ব্রহ্মচর্যের (enforced widow-hood) অভ্যাচারের কথা বলেন, তাঁহার সফলতার প্রশংসা করিলে চলে, কিন্তু তিনি হিন্দু-রমণীর চিত্ত-ক্ষেত্রের নিখিল পবিত্র নিষ্ঠাশক্তি যে সম্যক বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

আধ্যাত্মিক আর্ধ্যধর্মের মহিমাভবে সর্বজন পূজ্য মহাদি মহর্ষিগণের ধর্মমূলত সুব্যবহার শুণে, বাল্যকী প্রভৃতি কবিশুক্রগণের প্রতিভাময়ী সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আকর্ষণে, মহা মহা ঋষি শ্রীণীত পৌরাণিক উপাখ্যান সকলের অপূর্ণ উপদেশে, বহুকালের পুরুষানুক্রমিক শিক্ষার সমাজের জলন্ত দৃষ্টান্তে হিন্দুবিধবার ব্রহ্মচর্য তাঁহার পক্ষে সহজ ধর্ম, স্বভাব ধর্ম, প্রকৃতি ধর্ম হইয়াছে। কাজেই কোন কষ্ট হয় না। বালাভ্যন্ত বিদ্যাভঙ্গে তিনি অল্প অতি সরল অতি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। বোধ হয় বাল্যকাল হইতে একরূপ অভ্যাস করিয়া না আসিলে তিনি কদাচ একরূপ ব্রহ্মচর্যে আস্থান সঙ্গর্গ করিতে পারিতেন না।

মহাত্মা এডিসন (Addison) একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন—

"It is of the last importance to season the passions of a child with devotion, which seldom dies in a mind that has received an early tincture of it." অর্থাৎ Devotion opens the mind to great conceptions and fills it with more sublime ideas." তিনি ঠিকই বলিয়াছেন। উল্লিখিত বাল্যরতোদ্‌ঘাপনের কর্মেরতাই তাঁহা-

দিনকে উর্দ্ধে এবং উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর ও উর্দ্ধতম প্রদেশে লইয়া যায় । ইহাতে চিন্তের প্রশস্ততা আসে, জ্ঞানের উন্মেষনীশক্তি বৃদ্ধি করে, আত্ম-গম-বিভেদ-বোধ রেখাগুলি হৃদয় ক্ষেত্র হইতে মুছিয়া কেলো, দেহ মন পবিত্রিত হয়, এবং অবশেষে তাঁহাকে পারত্রিক-সুখ-সন্তোগের অধিকারিণী করিয়া থাকে । অতএব হিন্দু-বিধবা হিন্দু-সমাজের ভূষণ নয় স্ত কি ? সমাজের শিরোভাগে এমহামূল্য আভরণ না থাকিলে এতদিনে হিন্দু-সমাজ উচ্ছ্রাল ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইত । বন্ধন শিথিল হইয়া যাইত এবং বৃদ্ধ-গমনে আপনার দেহ প্রাণ কসুভিত করিতে কুঞ্জিত হইত না ।

• এজগতে আমাদের আশা-ভরসা, স্থিতি সংস্থাপন, বিলাস বাণিজ্য হুদিনের জন্ত । হুদিনের পরই সব ফুরাইয়া যায় । ধনৈশ্বৰ্য্য বল, শক্তি সামর্থ্য বল, মানগৌরব বল, শ্রীতি ভালবাসা বল, সৌন্দর্য্য লাভণ্য বল, সব যায় । এবং হুদিন পর কাল-শ্রোতে জলবুদ্বুদবৎ এজীবন-বিষ অনন্তকালে মিলাইয়া যায়, চিহ্নমাত্র থাকে না । স্তবরাং হুদিনের জন্ত আমাদের এত ভোগ অভিলাষ, এত আত্মনিষ্ঠা, এত স্বার্থ-সাধনা কেন ? এত বিবাদ বিসম্বাদ, এত রক্তপাতেরই বা প্রয়োজন কি ? আমরা হুদিনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্তই ব্যস্ত, লাগান্নিত । অনন্তকালের জন্ত ভাবি কি ? অনন্তকাল বেখানে কাটাইতে হইবে, সেখানকার জন্ত আমরা কি সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছি ? হুদিনের তরে যদি সব খোরাইলাম, তবে অনন্তের উপায় কি ? করনাক অঁকি কি ? কলতঃ যিনি তাহা ভাবেন; যিনি তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তিনিই অনন্তকালের জন্ত পারত্রিক সুখ সন্তোগের অধিকারিণী হইয়া থাকেন । সে সুলখন, সে সঞ্চিত-নিধি,—আর কিছুই নহে, ত্যাগস্বীকার আর আত্মবলি-দান । এজগতে সৰ্ব্ববিধ স্বার্থধলিদান দিলে, সৰ্ব্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার করিলে পরে, পর-জগতে আবার ঋণ মিলিবে । হুদিনের জন্ত নহে, অনন্তকালের জন্ত মিলিবে । ইতালীয় কবি (Cruch) ও বলিয়াছেন,—

“They that do much themselves deny,

Receive more blessings from the Sky”

হিন্দুর দেশে হিন্দুবিধবা-রমণীই এ ত্যাগ স্বীকারের অলস্ত নির্ধন । তিনি অন্নানবধনে তাঁহার ঐহিক-সুখ-বিলাসে অলাঞ্জলি দিয়া পরজগতের জন্ত

প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছেন । বাস্তবিক হিন্দু-বিধবাই একগুণে
প্রকৃত আত্ম-ত্যাগ-পরায়ণ, দেবী-রূপিনী—মানবী ! হিন্দুসমাজের একমাত্র
মহামূল্য ভূষণ-স্বরূপ তাহার আর সন্দেহ নাই ।

শ্রীভারিণীচরণ সেন ।

চিনির-বলদ ।

১
চিরদিন বহি ছালা চিনির বলদ
শ্রমে তার কণ্ঠাগত প্রাণ ;
কিন্তু সে জানেনা বস্তু কি আছে ছালায়
রূপ, গুণ, আশ্বাদ বিজ্ঞান ।

২
অবোধ মানব তথা আমরণ কালে
ব্যস্ত দেহ-সুখের কারণ
দেহে-আত্ম-অভিমান-দেহ নিত্য-ধন
নাহি জ্ঞান-আত্মা যে একমন ।

৩
চ'লে ব'সে খেয়ে শুয়ে, সুখে বার দিন
কর্তা কেবা—নাহি জ্ঞান তা'র ।
“আমি” বারে বল তুমি দিনে শতবার
মরিলে সে হবে ভদ্মাকারু ।

৪
‘আমি’ বা’রে বল তুমি, তবু কিবা তার ?
‘বিনি’ সব কার্যের কারণ,
তাদি, মোহ আকরণ-মুক্ত কর বার
তবে হ’বে-আত্ম-দর্শন ।

হিন্দু-ললনা ।

হ'লে মোহ-ভ্রমো নাশ আত্মার বিকাশ
প্রেম-সুখা হইবে ক্ষরণ ;
সেই সুখা-পানে মত্ত হইবে যখন
পূর্ণানন্দ পাইবে তখন ।

যতলন মথিলে দুগ্ধ নবনীত হয়
জলে তাহা মিশে না কখন ;
তেমতি মূনেরে মথি, হইলে মাখন
লিপ্ত থাকি নিলিপ্ত সেজন ।

শ্রীযুক্ত শ্রামলাল মল্লিক । (জমিদার)

হিন্দু-ললনা ।

তুমি কে ?—প্রভাতে নমি'পতির চরণ-তলে
কে তুমিগো, উজলিছ পূত নিরমালা-জলে ?
তুমি কে ?—প্রভাতী কর্ণে নিযুক্ত আপনি ধীরে,
কে তুমি যশের বাজী সংসার কর্ণের তীরে ?
তুমি কে ?—শুশ্রূষে সেবি কি দিবস কি রজনী
কে তুমি আনন্দে ভোর হিন্দুর উজ্জল মণি ?
কে তুমি রক্ষন শালে নিগুণা অন্নদে মাতঃ !—
শত বুড়ুকুর সুখা নিবারিছ অবিরত ?
কে তুমি আহীর দাজী আপনার অন্ন দিয়ে
অতিথিরে কর সেবা প্রাণের আনন্দ নিয়ে ?
কে তুমি মা'! গৃহলক্ষ্মী রুগ্ন-শয্যা পার্শ্বে বসি
অনশনে অনিদ্রায় অকাতরে বাপ নিশি ?
তুমি কে ?—স্বামীর পদ যতনে সাদরে সেবি
কে তুমি কর্ণের ক্রান্তি পলকে নিবার দেবি ?

তুমি কে ?—ভক্তি দিয়ে তোব গুরুজন গণ ?

কে তুমি গো, সবতনে সেবিতোছ পরিভ্রম ?

তুমি কে ?—পতির পরে, শরনে শরন-কালে

বন্দ পাপ হ'খানি তাঁর আনন্দ-ভক্তি-মাগে ?

কে তুমি ধরম মরি ! সন্তানগণেরে তব

ধরম সুখার-খারা পিয়াইছ অস্তিনব ?

শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী ।

চরকীয় নীতি ।

না পৃষ্ঠা, রত্নাক্য পূজ্য মঙ্গল স্মনসোভিনিক্রামেৎ—রত্ন, ঘৃত, বিরূপাক্ষারি পূজ্য সামগ্ৰী, মঙ্গলদ্রব্য, অস্ততঃ একটা স্মনর পুষ্প স্পর্শ না করিয়া গৃহ হইতে নিষ্কাশ্য হইবে না। ইহার উদ্দেশ্য, মনকে প্রসন্ন করিয়া কোনও কার্যার্থ বহির্গত হইবে। মনের অবস্থার উপরে ফলাফল অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

নিত্য মনুপহতবাসাঃ সুগন্ধিঃ স্মননাঃ স্মাৎ—প্রতিদিন সভ্য বস্ত্র পরিধান ও সুগন্ধি বস্ত্র ব্যবহার পূর্বক প্রফুল্ল চিত্ত থাকিবে। এই উক্তি দ্বারা বিলাসিতার প্রসন্ন দেওয়া হইয়াছে ইহা মনে না করেন। উদ্দেশ্য, এতদ্বারা যে মনের প্রসন্ন-তাব প্রকৃতিত হয়, তাহা স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে বড়ই অমূল্য।

ছত্রী-দণ্ডী-মৌলী সোপানংকো যুগমাত্রদৃগ্ বিচরেৎ—মস্তকে ছত্র ও হস্তে বষ্টি ধারণ করিয়া এবং পাছকা পরিধান পূর্বক সমুখে চারি হস্ত পরিমাণ ভূমি দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করিবে। যে হেতু একপ বিধি দ্বারা মস্তকে রৌদ্র জল বা বিহঙ্গাদির মল পতন, আকস্মিক হিংস্র শাপদের আক্রমণ, চরণে কণ্টকাদি বেধ ও অদৃষ্ট কাষ্ঠ-সোপ্তাদির প্রতিঘাতে পদাঙ্কলন ঘটান সম্ভাবনা পরিহৃত হইতে পারে।

প্রসাধিত-কেশো মুক্ত জ্যোত্স্নাণ পাদ তৈল নিত্যশ্চ—চুল আঁচড়াইয়া ঝাঁসিয়া দিতে করিবে এবং নিত্য মস্তক কণ নাসিকা ও পদে তৈল লক্ষণ করিবে।

জব্যগুণ বিচার :

কাঁকড় ।

বাঙ্গালা নাম—কাঁকড় বা ফুটা ; হিন্দী—ভুকুর ; সংস্কৃত পর্যায়ঃ—চিৰ্ভিটং
ধেমু হৃথক তথা গেদ্রক ককটা । . সংস্কৃত নাম—চিৰ্ভিট, ধেমুহৃথ, গোরক
ককটা ।

কাঁকড় কল অবশ্য সকলেই দেখিয়াছেন, ইহার গাছ লতানো, ভূমির
উপর বিস্তৃত হইয়া থাকে, পাতা গুলি প্রায় হাতের পাজার মত চওড়া ও
চক্রবক্র চিত্রযুক্ত ।

• চিৰ্ভিটং মধুরং ককং গুরু পিত্ত কফাপহং ।

অমৃফং গ্রাহি বিষ্টেস্তি পকং তুফক পিত্তলম্ ॥

অর্থাৎ কাঁচা কাঁকড়, মধুর, কক্ষ, গুরু, কফপিত্তাপহঃ, অমৃফ, ধারক, ও
বিষ্টেস্তকরক, কিন্তু পাকিলে ইহা উষ্ণবীৰ্য ও কফপিত্তাস্তক হয় ।

কাঁকড়া শূঙ্গী ।

বাঙ্গালা নাম—ঐ ; হিন্দী—ককর সিং ; ইংরাজী নাম—*Rhus*
succedanea. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—শূঙ্গী ককটশূঙ্গী চ ত্র্যং কুলৌরবিষাণিকা ।
অজশূঙ্গী তু চক্রা চ ককটাখ্যা চ কীর্তিতা ॥ সংস্কৃত নাম—শূঙ্গী, ককটশূঙ্গী,
কুলৌর বিষাণিকা, অজশূঙ্গী, চক্রা, ককটাখ্যা (কাঁকড়া-পর্যায়ের সমস্ত শব্দ)
হিমালয় প্রভৃতি পর্বতে এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহার শাখার অগ্রভাগে
কাঁট-দণ্ড হইলে ঐ দণ্ড স্থান হইতে শূঙ্গবৎ লম্বা, মধ্যে কাঁপা, অন্ন কক্ষবর্ণ,
উত্তর পার্শ্বে সরু, অঙ্গুলির মত স্থূল, বহুরাকৃতি ত্রকপ্রকার উদগম আবির্ভূত
হয়, তাহাই কাঁকড়াশূঙ্গী

শূঙ্গী কষারা তিক্তোষ্ণা কফবাতকরজরান্ ।

খাসোর্ধ্ববাত ভট্কাশ হিক্কা কচি বমৌ হরেৎ ।

রস—কষার-তিক্ত ; বিপাক—কষ্ট ; বীৰ্য্য—উষ্ণ ; গুণ—কফ-
বাতনাশক, ক্ষয়জরহ, তৃষ্ণা, কাস ও অরুচি নাশক । প্রভাব—খাস,
উর্ধ্ব বা উর্ধ্বমাত অর্থাৎ বায়ুকর্ষক উর্ধ্বদিকে আকর্ষণ, হিকা ও বমী নিবারক ।

প্রয়োগ—খাস কাস, কাসযুক্ত জ্বর ও বাতাজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ইহার উপকারিতা। খাসরোগে ইহার কৃষ্ণনিঃসারক শক্তি ও আক্ষেপ নিবারণ ক্ষমতা বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। ইহা দীর্ঘং ধাতুক গুণযুক্ত স্তত্রাং আয়ুশ্চক হইলে ইহার সহিত স্দুরক উপকরণ যোগ করিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। ধারকতা হেতু বাতাজীর্ণের তরলভেদে উপকারী। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কীটের সম্পর্ক থাকায় ইহা উষ্ণবীৰ্য্য স্তত্রাং সাধারণ গুঠ-পিপুলের মত ক্রমে ইহার যথেষ্ট মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া প্রয়োগ করা উচিত নয়, ইহার চূর্ণের নির্দিষ্ট মাত্রা—৫ হইতে ১২ রতি পর্য্যন্ত। কাথ করিতে হইলে ১ ভরি অধিক গ্রহণীয় নহে। কঠ রোধক কফযুক্ত বাতশ্লেষ্ম জ্বর ও কাসযুক্ত জ্বরের প্রসিদ্ধ অষ্টাদ্বাবলেহিকার মধ্যে কঁাকড়াশূঙ্গী একটা প্রধান উপকরণ;—তাহা এই—

কট্ফলং পৌষ্করং শূঙ্গী ব্যোমং বাসশ্চ কারবী ।

শঙ্ক চূর্ণীকৃতং চৈতন্মধুনা সহ লেহয়েৎ ॥

অর্থাৎ কট্ফল, কুড়, কঁাকড়াশূঙ্গী, গুঠ, পিপুল, মরিচ, হরালভা ও কৃষ্ণ জীরা; প্রত্যেক সমভাগ, মধুসহ লেহ ।

চক্রদত্ত দ্বিত শূঙ্গ্যাঙ্গি চূর্ণ—কঁাকড়া শূঙ্গী, বামনহাটা মূল, কিসমিস, গুঠ, পিপুল, ও শঠীচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ১৫ রতি মাত্রায় মধুসহ অবলেহ করিলে গুরু কাসি নিবারিত হয় ।

শাঙ্গধর্মদ্বিত শূঙ্গ্যাঙ্গিচূর্ণ—কঁাকড়াশূঙ্গী, আতিস ও পিপুলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ২৩ রতি মাত্রায় মধুসহ লেহন করিলে শিশুর কাস জ্বর ছদ্দি প্রশমিত হয় ।

এই তিন দ্রব্যে মুখা সংযুক্ত হইলে প্রসিদ্ধ “শিশু চতুর্ভঙ্গিকা” নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা শিশুর অরাতিসার, খাস, কাস ও বমি রোগে বিশেষ উপকারী ।

ভৈরবজরদ্ব দ্বিত শূঙ্গ্যাঙ্গি চূর্ণ—

শূঙ্গী কটুজ্বর ফলজ্বর কণ্টকারী ভাঁগী সপক্ষর জটালবগানি পঞ্চ ।

চূর্ণং পিবেদ শিশিরেণ জলেন হিষ্কাখাসোদ্ধিবাতকসনারুচি পীনসেষু ॥

কঁাকড়াশূঙ্গী, জিলটু, ত্রিফলা, কণ্টকারী, বামনহাটা, কুড়, জটামাংসী ও পঞ্চলবণ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র মাড়িয়া ২ মাষা পরিমাণে উষ্ণ-

জলসহ সেবন করিলে হিকা, উর্দ্ধ্বাস এবং কাস নষ্ট হয় । শাল্লোক্ত খাসের শৃঙ্গী শুড় ঘূতে, অঞ্জীর্ণের লবঙ্গাদি চূর্ণ প্রভৃতি, ও বাতব্যাধির মহারাজ প্রসারণী প্রভৃতি তৈলে কাঁকড়া শৃঙ্গী আছে ।

কাঞ্চন ।

বাঙ্গালা নাম—কাঞ্চন ; হিন্দী—কচনার ; ইংরাজী—Bauhinia Variegata. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কাঞ্চনারঃ, কাঞ্চনকো গণ্ডারিঃ শোণপুষ্পকঃ কোবিদারশ্চ মরিকঃ কুন্দালো যুগপত্রকঃ । কুণ্ডলী তাম্রপুষ্পশ্চ অন্তকঃ স্বল্পকেশরী ॥ সংস্কৃত নাম—(খেতের) কাঞ্চনার, কাঞ্চনক, গণ্ডারি, শোণপুষ্পক । (লোহিতের) কোবিদার, মরিক, কুন্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্রপুষ্প, অন্তক, স্বল্প কেশরী । মানুষের ৫৬ গুণ উচ্চ গাছ ; পাতা হাতের পাক্সা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট ও লম্বায় একটু কম । ফুল অল্পদল যুক্ত ও প্রায় চারি পাঁচ ইঞ্চি চওড়া ; ফুল লাল ও শাদা হয় । এই পার্থক্য হেতু এই গাছ দুই জাতীয় ।

কাঞ্চনারো হিমো গ্রাহী তুবরঃ শ্লেষ্মপিত্তহৃৎ ।

কৃষি কুষ্ঠ শুদ্রভ্রংশ গণ্ডমালা ব্রণাপহঃ ॥

(খেতের) রস—কষায় ; বিপাক—কটু ; বীর্য—হিম ; গুণ—কফপিত্তনাশক, কুষ্ঠহর (নানাবিধ চর্ম্মরোগে ছালের কাথ উপকারী) শুদ্রভ্রংশ নিবারক (ইহার কাথ পানে ও তদ্বারা মলদ্বার প্রক্ষালনে হারিস বাহির হওয়ার উপদ্রব দূরীভূত হয়) এবং ব্রণহর । প্রভাব—কৃমিনাশক ও গণ্ডমালা প্রতীকারক ।

কোবিদারোপি তদ্বৎ স্রাৎ তয়োঃ পুষ্পং লঘু স্মৃতম্ ।

কক্ষং স্নংগ্রাহি পিত্তাশ্র প্রদর ক্ষয় কাসহৃৎ ॥

—লোহিত কাঞ্চনের গুণাদিও খেতের তুল্য, কেবল ইহা অপেক্ষাকৃত কক্ষ । উভয়ের পুষ্পই লঘু । কিন্তু বিশেষতঃ লোহিতের পুষ্প ধারক, রক্তপিত্ত-নাশক, প্রদরও ক্ষয়কাসহর ।

প্রয়োগ—ইহার বঁকল সঙ্কোচক গুণযুক্ত, তজ্জন্ত উর্দ্ধগ ও অধোগ রক্তপিত্তে উপকারী । অধোগ রক্ত নিবারণ বিষয়ে ইহার গুণ অনেকাংশে

অশোকের তুল্য। খেত অশ্লেক্ষালোহিত কাকনের এই শক্তি অধিকতর। ইহার ছালের কাথ নানাবিধ ক্ষত ধৌত করিবার পক্ষে ব্যবহার্য। ছালের বাহ্যিক প্রলেপ গণ্ডমালা প্রভৃতি কঠুগত ব্রণ বা ক্ষতাদির পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার কাথ আন্তরিক প্রয়োগেও রক্ত পরিষ্কারক হইয়া থাকে। তাবমিশ্র লিথিয়াছেন রক্ত কাকনের স্বকের কাথ শুষ্ঠ ও মধু সহ সেবন করিলে গণ্ডমালা নষ্ট হয়। গোবিন্দদাস বলেন—

পিষ্টা জ্যোষ্ঠাশূনা পীতাঃ কাকনার দ্বচঃ শুভাঃ।

বিশ্বভৈষজ সংযুক্তা গলগণ্ডাপহাঃ পরাঃ ॥

অর্থাৎ কাকনবৃক্ষের ছাল আতপতগুলের জলে বাঁটিয়া তাহার সহিত শুষ্ঠ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গলগণ্ডরোগের উপশম হয়।

কাকন গাছের মূলের ছাল ২ তোলা সিদ্ধ করিয়া পান করিলে ক্রিমি-বিনষ্ট হয়, এতদ্বিষয়ে ইহার শক্তি দাড়িষ মূলের ছালের তুল্য।

শাস্ত্রোক্ত গণ্ডব্রণের কাকন শুড়িকা, কাকনার গুগগুলু ও রক্তপিষ্টের উদীরাসব প্রভৃতি ঔষধে কাকন ছাল আবশ্যিক হয়।

কাঁজি ।

বাঙ্গালা নাম—কাঁজি ; হিন্দী—কাজী ; ইংরাজী Fermented acid. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কাজিকং কজিকং কাজী কুণ্ডলং কুণ্ডগোলকং। ধাত্তমূলং ধাত্তবোনিঃ কুন্ধ্যাং কুন্ধ্যাভিষুতম্ ॥ সংস্কৃত নাম—কাজিক, কজিক, কাজী, কুণ্ডল, কুণ্ডগোলক, ধাত্তমূল, ধাত্তবোনি, কুন্ধ্যা, কুন্ধ্যাভিষুত।

কাঁজির লক্ষণ যথা—“সন্ধিতং ধাত্তমণ্ডাদি কাজিকং কথ্যতে জনৈঃ।”

অর্থাৎ যথারীতি প্রস্তুত ধাত্তের মণ্ড প্রভৃতি নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কুস্ত্র মধ্যে স্থাপিত ও তাহার মুখরোধ পূর্বক রক্ষিত হইলে তাহাকে কাঁজি বলে।

কাঁজি, ধাত্তব্যতিরিক্ত অল্প কয়েক বস্ত্র দ্বারাও প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহাদিগের নাম যথা—তুষোদক, সৌবীর, আরনাল, ধাত্তাম, শিঙাকী ও শুক্ত। যথাক্রমে বিবৃত হইতেছে।

সর্বপ্রকার কাঞ্জিকের সাধারণ গুণ ।

কাঞ্জিক শ্রাদ্ধী তীক্ষ্ণকঃ রোচনঃ পাচনঃ লঘু ।

দাহজ্বরহরঃ স্পর্শাৎ পানাদ্ বাতকফপহম্ ॥

শূলান্ধীর্ণ বিবক্ষয়ঃ কোষ্ঠে শুদ্ধিকরঃ পরম্ ॥

অর্থাৎ কাঞ্জিক তীক্ষ্ণক, রোচক, পাচক, লঘু, প্রলেপে দাহ জ্বরহর, পানে বাতশ্লেষ্মনাশক, শূলান্ধীর্ণ ও উদর শুভনাশক, এবং বিলক্ষণ কোষ্ঠ শুদ্ধিকর ।

তুসোদকের লক্ষণ ও গুণ ।

তুসোদকং শ্বৈব রাটমৈঃ সতুটৈঃ শকলীকটৈঃ ।

তুযাষু দীপনং ক্ষুদ্যাৎ পাণ্ডু কুমি গদাপহম্ ॥

তীক্ষ্ণকঃ পাচনঃ পিত্তরক্ত কৃষ্ণতি শূলহুং ॥

তুস সহিত অগুরু বব কুটিরাদি খণ্ড খণ্ড করিয়া বধাবিধি আবদ্ধস্থ-কুস্তে রাখিয়া দিলে তুসোদক বা তুযাষু প্রস্তুত হয়। তুযাষু দীপন, ক্ষুদ্যা, পাণ্ডু কুমি নাশক; তীক্ষ্ণক, পাচন, রক্তপিত্তের উত্তেজক এবং বতিশূলহর ।

সৌবীরের লক্ষণ ও গুণ ।

সৌবীরস্ত শ্বৈব রাটমৈঃ পটৈর্বা নিস্তবৈঃ কৃতম্ ।

গোধূমৈরপি সৌবীরম্ আচার্ঘ্যাঃ কেচিদ্ভূচরে ॥

সৌবীরস্ত গ্রহণ্যর্শঃ কফয়ঃ ভেদি দীপনম্ ।

উদাবর্তীক্ষমর্দাস্থি শূলানাহেযু শস্ততে ॥

পল্ল বা অগুরু ববের তুস ফেলিয়া তদ্বারা যে কাঁজি প্রস্তুত হয় তাহাকে সৌবীর বলে। গোধূমদ্বারা উক্তরূপে যে কাঁজি প্রস্তুত হয় তাহাকেও পূর্বাচার্ঘ্যাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সৌবীর বলিয়াছেন। সৌবীর গ্রহণী অর্শ কফ নাশক, ভেদক, দীপন এবং উদাবর্ত অক্ষমর্দ অস্থিশূল আনাহে প্রশস্ত ।

আরনালের লক্ষণ ও গুণ ।

আরনালস্ত গোধূটৈ রাটমৈঃ স্যাম্নিস্তবীকটৈঃ

পটৈর্বা সন্ধিতৈ স্তস্ত সৌবীরসদৃশঃ শুটৈঃ ॥

পক বা অপক ভূষবিহীন গোষ্ঠ্য দ্বারা যথাবিধি কুস্তে স্থাপনপূর্বক যে বস্তু প্রস্তুত হয়, তাহাকে অর্ধরসাল বলে । ইহা গুণে সৌরীরের তুল্য ।

“ ধান্যাম্লের লক্ষণ ও গুণ ।

ধান্যাম্লং শালিচূর্ণঞ্চ কোদ্রবাদি-কৃতং ভবেৎ ।

ধান্যাম্লং ধান্য-যোনিত্যাং প্রীণনং লঘু দীপনম্ ॥

অরুচৌবাতরোগেষু সন্নেষাষ্ট্যাপনে হিতম্ ॥

শালিচূর্ণ ও কোদ্রব প্রভৃতি যথাবিধি স্থাপন পূর্বক যে অম্লরসযুক্ত তরল পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাকে ধান্যাম্ল বলে । ইহা ধাতু হইতে প্রস্তুত হয় বলিয়া প্রীতিজনক, লঘু, অগ্নি দীপ্তিকর এবং অরুচি রোগে, সকলপ্রকার বাতে ও আস্থাপনে (ভেদ বা বমি করাইবার পর উদর-প্রশান্তির জন্ত) হিতকর হইয়া থাকে ।

শিঙাকীর লক্ষণ ও গুণ ।

শিঙাকী রাজিকায়ুস্তৈঃ স্থান মূলকদলত্রয়ৈঃ ।

সর্ষপশ্বরসৈ বাপি শালিপিষ্টক সংযুতৈঃ ॥

শিঙাকী রোচনী গুর্বা পিত্তশ্লৈষ্যকরী স্বতা ॥

রাইসর্ষপ সংযুক্ত মূলক (মূলা) পত্রের রস অথবা শালিতণ্ডূলচূর্ণ সংযুক্ত সর্ষপের স্বরস (গাছ-পাতা-বীজের রস) দ্বারা (যথাবিধি কুস্তে স্থাপন পূর্বক) যে পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহাকে শিঙাকী বলে । শিঙাকী রুচিকারক, গুরু, এবং কফপিত্ত বর্জক ।

শুক্তের লক্ষণ ও গুণ ।

কন্দমূলকলাদীনি সন্নেহ লবণানি চ ।

যত্র দ্রবেতিশ্বরস্তু তচ্চুক্ত মতিধীমতে ॥

শুক্তং কফয়ং তীক্ষ্ণাকং রোচনং পাচনং লঘু ।

পাণ্ডুক্রিমিহরং কক্ষং ভেদনং রক্তপিত্তকৃতং ॥

তরল দ্রব্যে তৈল, মধু, ফল ও মূলাদি ডুবাইয়া রাখিয়া যে দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহাকে শুক্ত বলে । শুক্ত কফয়, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুচিকারক, পাচক, লঘু, পাণ্ডু ও ক্রিমিনাশক, কক্ষ, ভেদক ও রক্তপিত্তের উদ্বেজক ।

প্রয়োগ—প্রধানতঃ এইরূপ কাঁজি কবিরাজগণ কর্তৃক প্রস্তুত হইয়া থাকে, যথা—আউশ খাণ্ডি আধ-কোটা ১/২ সের, জল ১/৮ সের, একত্রে ১৫ দিন বা ১ বাস বন্ধ-মুখ পাত্রে ভিজাইয়া রাখিলে, বা ঐ পরিমাণ আতপ তণ্ডুল ১০দশ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৭৮ সের থাকিতে গরম গরম কলসীর মধ্যে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিলে অন্তরুৎসেক (fermentation) হইয়া তীক্ষ্ণ অন্নান্বাদযুক্ত হয়। এই তরল বস্তু ভিনিগারের সমগুণ এবং তৎপরিবর্তে ব্যবহার যোগ্য কাঁজি আয়ুর্বেদীয় নানারূপ-পাচক ঔষধের অল্পপানরূপে ও বাতব্যাধির তৈলাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভাবমিশ্র বলেন—কাঁজিতে বস্ত্র আর্দ্র করিয়া অবশুষ্ঠন করিলে দাহজ্বর নষ্ট হয়। উদর স্তম্ভিত ও বেদনা যুক্ত হইলে দৈবদারু, বচ, কুড়, গুল্ফা, হিং ও সৈন্ধব লবণ কাঁজিতে পিষিয়া পেটে প্রলেপ দিবে।

অল্পপিঠেঃ সূশীতৈ বা পলাশতরুজৈ দিহেৎ ।

বদরী, পল্লবোথেন ফেনেনারিষ্টকস্ত্র বা ॥

পলাশবৃক্ষের কচি পত্র কাঞ্জিকের সহিত বাঁটিয়া অথবা কুলের বা নিখের কচি পত্র তৎসহ মছন করিয়া, তদুৎপন্ন ফেন লইয়া রোগীর পাত্রে রাখিলে শীঘ্র দাহ নিবারিত হয়।

ত্বক্ পত্রঃ রাস্নাগুরু শিগ্রকৃষ্টৈ রস্মপ্রপিঠৈঃ সবচা শতাতৈবৈঃ ।

উষর্ভনং খাণ্ডিবিস্ফটিকায়ঃ তৈলং বিগকং চ তদর্থ কাঞ্জি ॥

কুড় ত্বক্, তৈজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড় বচ ও গুল্ফা কাঁজিতে পিষিয়া অথবা কাঁজির সহিত তিলতৈল পাক করিয়া তদ্বারা মর্দন করিলে বিষচিকা ও খাল্-ধরা উপশমিত হয়।

শাস্তোক বাতাজীর্ণের শাদ্দূলকাঞ্জিকে, দাহজ্বরের কাঞ্জিক তৈলে ও উদর রোগের কাঞ্জিক স্নাতাদিতে কাঁজি আবশ্যক হয়।

কাকজজ্বা ও কাকনাসা ।

বঙ্গালা নাম—কেউয়া ঠেঙ্গা, কেয়ো থে কা ; হিন্দী—কাকজজ্বা, মুসী, ইংরাজী—*Leea hirta*. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কাকজজ্বা নদীকান্তা কাকভক্তা

সুলোমশা । পারাবতপদী দাসী কাকা চাপি প্রকৌর্ভিতা । সংস্কৃত পর্যায়ঃ—
কাকজন্মা, নদীকান্তা, কাকতিক্তা, সুলোমশা, পারাবত পদী, দাসী
কাকা ।

কাকজন্মা হিমা তিক্তা কষায় কফপিত্তমুৎ ।

নিহতি অরপিত্তাশ্চ ব্রণকটুবিষ ক্রিমীন্ বা ভাঃ প্রঃ

কাকজন্মা হিম, তিক্ত, কষায়, কফপিত্ত, এবং জ্বর, রক্তপিত্ত ব্রণ কটু
বিষদোষ ও ক্রিমিনাশক ।

কাকজন্মা তুষ্ণ তিক্তো ক্রমি ব্রণ কফপহা ।

বাধিৰ্য্যাজীর্ণজিৎ কটৌ বিষম জ্বর হারিণী ॥ বাঃ নিঃ

কাকজন্মা তিক্ত, কটু, উষ্ণ, ক্রমি ব্রণ ও কফর । বাধিৰ্য্য ও অজীর্ণ
এবং বিষমজ্বর নাশক ।

কাকনাসা কষায়োক্ষো কটুকা রস পাকয়োঃ ।

কফরী বামণী তিক্তা শোফাৰ্শঃ শ্বিত্রকুষ্ঠ মুৎ ॥ ভাঃ প্রঃ ।

কাকনাসার বাঙ্গালা নাম—কেয়ৌঠুঁটা, হিন্দী—কৌরা ঠোড়ী, ইংরাজী—
Gymurdma Sylvestre. ইহা রসে কষায়-কটু-তিক্ত, পাকে কটু, কফর,
বমিকারক, শোণ, অর্শ, ধবল ও কুষ্ঠ-নাশক ।

এই দুইটীংগাছ পরস্পর বিভিন্ন, অনেকে মনে করেন দুইই এক গাছ ।
দেখিতে পাই অমুবাদকরণও এসবকে গোলমাল করিয়াছেন । শাস্ত্রোক্ত
চ্যবন প্রাণে 'কাক নাসিকা' আছে কিন্তু কয়েক পুস্তকে উহার অমুবাদ
'কাকজন্মা' দেখিতে পাই । ইরা দ্বারা অমুমিত হয় উক্ত অমুবাদক দুই
গাছকে এক মনে করেন । কিন্তু তাহা ঠিক নহে, যেহেতু ভাবমিশ্র ও রাজ
নির্ষক্টকার উভয়েই তিন্ন তিন্ন স্নোকে সুম্পষ্ট রুপে উভয়ের ভেদকরিয়াছেন ।
উভয়জাতক বিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও বিভিন্নতা দেখাইয়াছেন । কাকনাসার
ফলের বীজ ত্রিক কাকের চক্ষুর মত । কাকজন্মার ডালগুলি ফাঁপা ও কাকের
পায়ের মত ।

* আনুর্বেদে শুধু কাকজন্মা বা শুধু কাকনাসার প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না, নানা
ঔষধের উপকরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হয় ।

২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। ১৯০০, মার্চ ১, ১৩০৩, চৈত্র।

মূল্য বার্ষিক সডাক ১২।

ধর্মসি

আয়ুর্বেদ ও ধর্মনীতি বিষয়ক

মাসিক পত্র।

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রিট-স্থিত

আয়ুর্বেদ বিদ্যামন্দির

হইতে প্রকাশিত।

স্বর্ণমেন্ট উপাধি ও সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,

কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিভূষণ

সম্পাদিত।

বিষয়—ভোজন-বন্ধ, অহুতাপে উদ্ধার, শিবাপরাধ-কমাগল পোষক,
চরকীর নীতি, শ্রব্যাপণ বিচার।

১০ ট্যান্ড পাইকা বিক্রয়মূল্যে স্বাস্থ্যসাধন নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক লউন।

“ঋষি”-পত্রিকার নিয়ম ।

১। “ঋষি” বাঙ্গালা মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (চলন্ত বিয় না হইলে) সুপৌৰ্ণমাস-নিয়মে বাহির হইবে। কোন গ্রাহক কোন মাসের “ঋষি” না পাইলে তাহার পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে জানাইতে হইবে। ১৮৫৭ ইহার জন্য আমরা দায়ী নহি। আকার্হ (অনুন) ডিমাংই ৮ পেজী ৩ ফন্না।

২ মূল্য, অগ্রিম বার্ষিক ১ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৮/০।

৩। পত্র লিখিবার সময় গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্বক গ্রাহক-নম্বর-সহ নাম-ধাম-আদি স্পষ্টরূপে লিখিবেন। নূতন গ্রাহকগণ “নূতন” এই কথাটির উল্লেখ করিবেন।

প্রকৃতির শিক্ষা ।

উৎকৃষ্ট ভাবময়ী পদ্য-পুস্তিকা। ইহাতে সৃষ্টির ক্ষুদ্রমহৎ সমস্ত বস্তুকে, এক নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে পাইবেন। পড়িলে জীবকের মন প্রকৃতির মনোহর ছবি দেখিয়া উদ্ভত হয় ও ভক্তের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া; তগবানের দিকে শ্রোতারূপে বহিয়া যায়। মূল্য ১০ আনা। মফস্বলবাসী ১০ আনা ডাঃ ষ্ট্যাম্প কবিরাজ মহাশয়ের ২০২ নং কর্ণওয়ালিসের ঠিকানায় পাঠাইয়া লউন।

হিত-কথা—বালক বালিকাদিগের নীতি ও স্বাস্থ্যপ্রতিমূলক আমোদ-জনক সুললিত কবিতাপুস্তক। মুখস্ত রাখিলে ভবিষ্যতে অনেক উপকার পাইবে। বুদ্ধদিগেরও শিখিবার অনেক বিষয় আছে। ঋষি কাৰ্যালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৮/০

তবলা তরঙ্গিনী—ঢাকার প্রসিদ্ধ তবলার ওস্তাদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বণিক্য প্রণীত। ইহাতে কাহারও সাহায্য ব্যতীত নিজে নিজেই তবলা শিখিতে পারা যায়। মূল্য ১০/০। শ্রীগুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়।

প্রেমগাথা—সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা শ্রীমতী, নগেন্দ্রবালা মুস্তফী প্রণীত। মূল্য ১ টাকা, ভাল বাধাই ১০, এমন সুন্দর সুরসাল প্রাগমুখকর কবিতা পুস্তক প্রায় দেখা যায় না। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। প্রাপ্তির ঠিকানা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান।

ক্ষেত্রমোহন দে এণ্ড কোং

৪৫ নং রাধাবাজার, কলিকাতা।

শ্রীমোঃপযোগী নানাবিধ বস্তাদি আমদানি করা হইয়াছে। কামিজের জন্য উৎকৃষ্ট ছিটের কাপড় প্রভৃতির নমুনা ও মূল্যাদি, পত্র পাইলে পাঠান হয়। আসাম লিক এখানে পাওয়া যায়। অর্ডার পাইলে অল্প সময়ের মধ্যে পোষাক তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হয়।

Civil and Military Tailors, Army Contractors &c. &c.

English Cutter.

45-Radhazar - Calcutta

ঋষি ।

২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা । } . { ১৩০৬, চৈত্র ।

ভোজন-যজ্ঞ ।

ভোজন একটা বড় কম ব্যাপার নয়। প্রণিধান করিয়া দেখিলে ইহা মহাযজ্ঞরূপ বলিয়া প্রতীত হয়। বা-পাই তাই তাড়াতাড়ি গিলিয়া ফেলিলেই হইলনা। কি খাইতেছি? কখন খাইতেছি? কিরূপে খাইতেছি? কি উদ্দেশ্যে খাইতেছি—এই বিতর্কগুলি আহার্যুরস্তে মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা-পূর্বক একবার মনে প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত। পুরোহিত ব্রাহ্মণ যেমন অসময়ে অনবস্থিত চিত্তে অবধাভাবে সত্বর “নমো নমঃ” করিয়া উঠিয়া পড়িলে কখনই উপাস্ত দেবতার আবাহন সংকল্প সাধিত হয় না, তেমনি ভোজন-যজ্ঞের স্নায়োজন-নিষ্পাদনে ক্রটি হইলে ঐ মহারজের অভিপ্রায় কদাপি সম্পূর্ণ হইবে না। এই যজ্ঞের যজ্ঞপতি অধিষ্ঠাতৃদেব ঋঠরায়িক্রুপী ব্রহ্মা, ইহার উপচার সামগ্ৰী চর্কচোষা লেহপের্যাদি বড় জাতীয় আহাৰ্য্য, ইহার দক্ষিণা চিত্তপ্রসাদ, কাম্যবস্ত আয়ু ও অনাময়, সুখা এই যজ্ঞের ভক্তি-স্থানীয়, এ যজ্ঞের যাজক স্বয়ং ভোক্তা, নিজের লভ্য পুরোহিতে এ কার্য চলেনা।

চরক লিখিয়াছেন—

আহ্নিতায়িঃ সীদা পথ্যাত্তরায়ৌ জুহোতি যঃ ।

দিবসে দিবসে ব্রহ্ম জপত্যা দহতি চ ॥

নয়ং নিশ্চেষ্সস যুক্তং সাত্মজং পানুভোজনৈ ।

ভজন্তে নাম যঃ কেচিং ভাবিনোহপ্যস্তরাদৃতে ॥

বড় ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি রাজীণাং হিতভোজনঃ ।

ঐবভ্যনাতুরো অস্ত জিতাত্মা সশ্রুতঃ সন্তাম্ ॥

আহিতাবি নৈতিক ব্রাহ্মণগণ যুগ্ম প্রাতঃ সন্ধ্যায় প্রার্থনা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক হোমায়িত্র মধ্যো যথাবৎ আত্মতি দান করিয়া তৎকালস্বরূপ ইহ-পরত্র স্বাস্থ্য ও স্বর্গস্থল সংক্লেগ করেন, তদ্রূপ যিনি উদ্যায়িকের সমস্ত সংরক্ষণ পূর্বক ব্রহ্মনাম জপ করিতে করিতে উঠাতে দিন দিন মূল্যরূপ অঞ্জলি উৎসর্গ করেন, সেই পান ভোজন চিত্তাহিতজ্ঞ মঙ্গল-নিরন্ত ব্যক্তি অপথা ও অধর্ম এতদ্বয়েরই অভাব নিবন্ধন ইহকালে ও পরকালে দৈহিক বা মানসিক কোনও কষ্টের দ্বারাই আক্রান্ত হয় না,—সেই জিতায়া হিত-ভোগী পুরুষ নীরোগদেহে শতবর্ষ জীবন ধারণ পূর্বক সজ্জনগণের সন্নিধানে সম্মানার্থ হইয়া থাকেন।

ধনবান্ ব্যক্তি স্বকীয় ঐশ্বর্যপ্রভাবে মণিরত্নাদি বহুমূল্য পূজা-সম্ভার সংগ্রহপূর্বক দেবার্চনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, হউন! ইহাতে আপত্তি কি? কিন্তু দেখা উচিত এই দাড়বর পূজার মূলে সেই আসল জিনিস কত্টি আছে কি না। যদি তাহা না থাকে সমস্ত আরোহণই অন্ধের নেত্র বিক্ষা-রণবৎ পণ্ড। সেইরূপ যদি ক্ষুধার অভাব হয়, তবে বিলাসবুদ্ধি প্রণোদিত সহস্র রাজ-তোকোই বা কি ফল? প্রাণে তক্তি থাকিলে, তুলসীমাত্র নিক্ষেপেও স্বর্গের সিংহাসন নড়িয়া উঠে, তেমনি ক্ষুধা থাকিলে শাকভাতেই আত্মার পরিভূক্তি ও দেহের দিব্যাক্সি হইয়া থাকে।

দেবপূজা যেমন একাগ্রচিত্তে করিতে হয়, আহার সম্বন্ধেও চরকের সেই-রূপ উপদেশ—“তন্মনা ভূত্বীত” অর্থাৎ তন্মগ্নচিত্তে ভোজন করিবে। কাম-ক্রোধাদি বিলোড়িত হৃদয়ে সেই একাগ্রতা অতীব দুর্লভ, এবং তদভাবে পূজাই বা কোন্ কার্যের?

পুনরায় ঋষি বলিতেছেন—

মাত্রাপ্যত্যসহস্রম্ পথ্যং চারং ন জীর্ষ্যতি ।

চিন্তাশোক ভয় ক্রোধ হৃৎ শয্যা প্রদাগঠৈঃ ॥

হুশ্চিত্তা, শোক, ভয়, ক্রোধ, কষ্ট-শয়ন বা যাত্রি জাগরণ দ্বারা দেহমন প্রদীড়িত হইলে যথামাত্রের তুচ্ছ হিতকর খাদ্যও পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

পূজার আরোহণ সমস্ত সম্পন্ন পবিত্র ও প্রদাকর হওয়া চাই আহাৰ্যা-ভনি ও গুটি বহঃপুত কটিকর হওয়া আবশ্যিক। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়

আজকাল আহার্যের তুচ্ছ বিষয়ে যুহানু, বিদ্ব লোকসমাজে সমুপহিত হইয়া রহিয়াছে। জীর্দিগের বিলাসপ্রিয়তা ও পুরুষগণের শূত্রগর্ভ অভিমান শুদ্ধির কুফলে সামান্ত উলাঙ্জনকর্ম গৃহস্থ ও স্বার্থাহুসারী পাচকের হস্তে এই যজ্ঞের আয়োজনভার বিস্তৃত রাখেন। একরূপ বৃহবার দেখা গিয়াছে—পাচকের ধর্ম্মাক্ত কলেবর হইতে প্রকৃত খেদ-বিন্দু বা মুখ-নিকিপ্ত খুৎকার প্রস্তুত খাদ্য মধ্যে পঙ্কিত হইলে, কোনও কীট পতঙ্গের ছিন্ন পালক দ্বারা বিড়াল কুকুরাদির জিহ্বা-লালা দ্বারা কোনও খাদ্য সংমিশ্রিত হইলে কয়জন পাচকের ধর্ম্মভীরুতা জাগ্রিত হইয়া উঠে—কয়জন তখন গৃহস্থামাকে জানাইয়া নূতন আহার্যয়োজন করিয়া দেয়? ইতঃপূর্ব্ব সময়ে গৃহস্থাগামধ্যে প্রাচীনা গৃহিণী সুযোগ্য পুত্রবধূ বা কন্যা প্রভৃতি স্বজনগণই পর্যায়ক্রমে দিন দিন রন্ধনের ভার লইতেন, এপ্রথা ক্রমে বিলুপ্ত হইতে চলিল! জারাজননী-প্রভৃতি প্রিয়জনের, স্বহস্ত সম্ভাবিত বখালক সংকীর্ণ অন্নের মধ্যেও বৃষি ঔহাদের প্রাণের অপূর্ব্ব স্নেহরস অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইয়া যার তাই তাহা এত মধুর! এত স্পৃহণীর!

বিষয়লিপ্সু উদ্যমশীল কর্ম্মবোগীর অনেক সময় অর্থাদি উপার্জ্জনে একাগ্র-চিত্ত ও অনন্তচেষ্ট হইয়া সম্মুখ-স্থিত সুখসেব্য ভোজ্যানিচয়ের লেশমাত্র শল-ব্যস্তভাবে আস্থাদান পূর্ব্বক সত্বর লক্ষ্যবস্তুর দিকে ধাবিত হইয়া থাকেন। একরূপ করা ঔহাদের পক্ষে একটা মহা অপরাধের কার্য। ঔহাদের বৃষিরা দেখা উচিত—আহারের প্রভাবেই মানুষের বলবৃদ্ধি উদ্যম। সোজকখার—কয়লার জোরেই গাড়া চলিয়া থাকে। কয়লার অসন্তাবে বা অসমাকুসংগ্রহে উহা কতকাল চলবে? দেহ পাত হইলে কোথায় অর্থ? কোথায় কাম? কোথায় কিছু? শরীরই নিখিল কাম্যবস্তুর ভিত্তিস্বরূপ, যে কোনও উপায়ে শরীর রক্ষা আবশ্যিক! ঔই বৃষিরাই বোধ দ্বন্দ্ব চার্ব্বাক বলিয়াছিলেন—
—ঋণং কৃৎস্বা যুতং পিবেৎ ।”

নাটিক চার্ব্বাক শরীর রক্ষারূপ পূর্ণ্যার্থ্যের জন্য ঋণরূপ পাতকে অস্বীকার করিতে উপদেশ দিলেন। ধর্ম্মভীরুস্ববক! অবশ্য অতটা অকার্য্য করিও না, কিন্তু সর্বদা মনে রাখিও—ভোজন-চরুগলনাত্মক একটা সামান্ত কারিক ব্যাপার নহে, ইহা এক সূমহৎ মিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মকর্ম্ম স্বরূপ।

সেই এঞ্জিনিয়ার প্রবর জগৎশ্রুতি এই ধর্মকর্মের দিকে প্রবর্তিত করিবার জন্য জীব-কঠরে কুখা দিয়াছেন। এই কুখার তুল্য চাবুক আর নাই। মানুষ এ চাবুকের অগ্রাহ্য করিতে কখনই পারিবেন। কিন্তু উক্ত অমুঠানৈম উপকরণসামগ্রী ও বিধি বৈলক্ষণ্য সমস্তই মানুষের হস্তে সমর্পিত রহিয়াছে। অতএব এবিষয়ে মানুষের সম্বন্ধি থাকিলেই মঙ্গল। "নতুবা কারমানসিক অধঃপতন অনিবার্য।

অনুতাপে উদ্ধার।

যেমন ধান ব্যতীত গড়ন হয়না, তেমনই পাপ ব্যতীত মানুষ হয়না। মানুষের সহিত পাপের সংশ্রব আছে বলিয়াই মানুষ-মানুষ; নচেৎ মানুষ দেবত্ব লাভ করিত। তবে পাপের মাত্রা অতিরিক্ত হইলেই তাহা প্রকৃত "পাপ" নামে পরিগণিত হইয়া ধর্মরাজ্যের দণ্ডযোগ্য হয়। যে কোন বিষয়ের অতিরিক্ততা মাত্রই যখন দৃশ্যীয়, তখন পাপের মাত্রা যে অধিক হইলে মানুষের ব্রহ্মণার সীমা থাকে না তাহা বলাই বাহুল্য। সামঞ্জস্যই মুখ রোদ্দ ও মেঘের সামঞ্জস্যই ধরণী উর্বরা স্বামীদ্রীর পবিত্র হৃদয়ের সামঞ্জস্যই সংসার সুখময়। মানুষ যখন এই সামঞ্জস্যের শাস্তিময় শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া কর্তব্য ত্যজি হয় তখনই তাহার পাপের বোঝা ভারি হয় এবং সেই পাপের বোঝা যখন পূর্ণ হয় পাপ যখন আধারে আর ধরেনা উছলিয়া উছলিয়া পড়ে তখনই মানুষ আপন পাপ কার্য্য স্মরণ করিয়া মরমে মরমে দগ্ধ হয় ব্রহ্মণার হৃদয় স্থলসিয়া যায় বুক কাটিয়া হৃদয় গলিয়া নরন ধারা রূপে প্রকাশ পায়। এই হৃদয় গলা নরন জলই পাপীর জীবনের শাস্তিজল এই নরন জলেই হৃদয়ের পঙ্কিলতা বিদ্যোত হইয়া চিত্ত-নির্মূল হয়। এবং যখন এই নরন জল মানবের তাগ্যে প্রকাশ হয় তখনই মানব ভগবচ্চরণ স্মরণ পূর্বক বলিতে পারে "প্রকৃত পাপ করিয়াছি আমার গতি কি হইবে আমাকে ক্ষমা কর যেন আর এমন দুর্ভাগি নাহয়।" এই অনুশোচনার নামই যথার্থ অনুতাপ। পাপ যখন আধারে ধরে না তখনই অনুতাপের প্রকাশ হয়। পাপী যতই পাপ করুকনা এক দিন না এক দিন স্বীয় কর্মাজিত ফলে অবশ্যই অনুতপ্ত

হইবে। কুরুরাজ দুর্যোধন নিরপরাধী পাণ্ডব গুণের সহিত প্রতিনিরত শত্রু-
তাচরণ করিতে লাগিলেন তাঁহাদিগকে রাজ্য ভ্রষ্ট করিয়া বনবাস দিয়াও চিত্ত
শান্ত হইল না শেষে দুর্যোধন বশবর্তী হইয়া কুরু পাণ্ডবে মহাসময়ের সৃষ্টি
করিলেন ভারতের সেই মহাসময়ে বহু ক্ষত্রিয় কুল নিশ্চল হইল তথাচ তাঁহার
আশা মিটিলনা পাণ্ডবের অহুশোচনা প্রকাশ পাইলনা ক্রমে উভয় পক্ষের
সমগ্র বাহিনী নিশ্চল হইলে নৃপতি দুর্যোধনের পক্ষে গুরুপুত্র অশ্বথামা ও
গুরু-সখা কৃপাচার্য্য জীবিত ছিলেন এই সময় পাণ্ডববীর ভীমের গদাঘাতে
দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ হইয়াছিল সুতরাং তিনি ভখন চলৎ শক্তি রহিত তথাচ
তিনি মনের অদম্য গতিকে নিবৃত্ত করিতে নাপারিয়া গুরুপুত্র অশ্বথামাকে
সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া পাণ্ডব বিনাশের আদেশ করিলেন। বীর অশ্ব-
থামা ধরণীকে অপাণ্ডবা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া রজনী যোগে পাণ্ডব
বিনাশার্থ গমন করিলেন। তিনি আপন প্রতিভাও স্তব্বলে পাণ্ডব রক্ষক
দারী পশুপতিকে (শিবকে) প্রবোধ করিয়া তঙ্করের স্তায় পাণ্ডব শিবিরে
প্রবেশ করিলেন। সেসময় পঞ্চ পাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণ ও পদ্মী এবং কৃষ্ণসখা সাত্যকী
সহ স্থানান্তরে অবস্থান করিতেছিলেন। শিবিরে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র নিদ্রিত
ছিলেন অন্ধকার রজনীতে অশ্বথামা সেই পঞ্চ ভ্রাতাকে হস্ত দ্বারা ক্রমাগত
স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে পঞ্চ প্ৰাণ্ডব বিবেচনা করিয়া স্বীয় কোষবদ্ধ খড়্গ
নিকাগ্নিত পূর্বক সেই পঞ্চ ভ্রাতার শিরশ্ছেদন করিয়া স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা
যক্ষন পূর্বক নৃপতির নিকট চলিলেন। আজ পঞ্চ পাণ্ডবের কর্তিত মুণ্ড দর্শনে
না জানি নৃপতি কতই আনন্দিত হইবেন। তৎকালে এইরূপ কত কথাই
তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তিনি যথা সময়ে সেই পঞ্চমুণ্ড লইয়া নৃপতিকে
উপহার দিলেন তিনিও বৈরী নির্যাতনে প্রথমে কতই আনন্দাশুভব করিলেন
পরে পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিলেন এপঞ্চমুণ্ড পঞ্চপাণ্ডবের নহে পাণ্ডব পুত্র
গুরুপুত্র। তখন তাঁহার বিধাদের সীমা রছিল না এই কার্য্যে কুরুবংশ নিশ্চল
হইল ভাবিয়া মরমে মরিতে লাগিলেন তখনই তিনি আপনার কর্ম স্রবণ
পূর্বক কাতর স্বরে বিলাপ করিয়া গুরুপুত্রকে সোধোদন করিয়া বলিলেন,

“কুরুকুলে অঙ্গপিণ্ড দিতে নার্যাধিলে”

অনুতাপে তাঁহার স্বপ্ন শতধা হইল ইহাই বার্থ অনুতাপ। এই বার্থ

অহুতাপের দ্বারাই মঙ্গল মন্ত্র শ্রীভগবান্ পাণীকে প্রসন্ন হন । এই অস্ত্রই
খৃষ্টানের বাইবেল, মহম্মদের কোরাণ, হিন্দুর শাস্ত্র পাণীকে পুনঃ পুনঃ অহু-
তাপ করিবার জঙ্ক উপদেশ দিয়াছেন ।

অহুতাপ দ্বারা যে শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইলেন আমরা তাহা ব্রহ্ম গোপীগণের
চরিত্রালোচনা করিয়া দেখিলেও বেশ বুঝিতে পারি । যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুন্দা-
বনে—কার্ত্তিকের পৌর্ণমাসীর দিবস দ্বাসলীলার দ্বাসনা করিয়া যে সকল
প্রথমময়ী গোপীকা দিগকে বংশীদ্বারা আর্বাহন্দ করিয়াছিলেন সেই সকল
সমাগতা গোপীকাগণ আপনা দিগকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমদী জ্ঞানে সর্ব-গোপী-
গণ অপেক্ষা আপনাপন শ্রেষ্ঠত্ব অহুভব করিতে লাগিলেন ইহাতে সেই দর্প
হারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের দর্প হরণ মানসে একটা খেলা খেলিলেন অর্থাৎ তিনি
সেই সমগ্র গোপীকা মণ্ডলী হইতে তাঁহার ফ্লাদিনী অংশ শ্রীরাধাকে লইয়া
লীলাস্থল হইতে অন্তর্হিত হইলেন তখন তাঁহার অভাবে গোপীকাগণ ভয়
মনোরথ হইয়া কতই বিলাপ করিতে লাগিলেন ও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা সহ
অন্তর্ধানে সকলেই শ্রীমতীকে শ্রীকৃষ্ণের পরমা প্রেমদী জ্ঞানে আপনাদিগের
নিকৃষ্টতাস্থত্ব করিয়া অহুতাপনলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এই অহুতাপের
ক্লপাতেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন । আবার শ্রীরাধিকা
যখন দেখিলেন সমগ্র গোপী মণ্ডলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকেই গ্রহণ করি-
লেন তখন তিনিও আপনার অসীম গৌরবে ক্ষীণতা হইয়া উঠিলেন শ্রীকৃষ্ণের
তাহা বুঝিতে বাকী রহিলনা তৎক্ষণাৎ তিনি স্মৃত্তর্ধান হইলেন । তখন
শ্রীরাধিকার ক্ষোভের সীমারহিলনা পরে বথার্থ অহুতাপ দ্বারাই তাঁহাকে
পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

আমরা দীর্ঘ প্রতি মুহূর্ত্তেই পাপের তরঙ্গ আমরা হাবুডুবু খাইতেছি
যখন প্রাণ সেই তরঙ্গের তার আঘাতে ওষ্ঠাগত হইয়াপড়ে তখন আর
কিছুতেই স্পৃহা থাকেনা অগতের ঠিকিছুতেই যেন প্রাণের তৃপ্তি সাধন হয় না।
তখন সেই শাস্তিময়ের শীতল চরণ দুটি ধরিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয় সে রোদনকত
মধুর কঙ্ক অমৃত ময় কেমন করিয়া বলিব! কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের যেন
কেমন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হয়। সে আঁর্জনাদ সে বস্ত্রগার পরিবর্ত্তে
হৃদয়ে যেন কেমন একটা দেবত্বের ছায়া পড়ে হৃদয় জুড়াইয়া যায় । এখন

ভাবান্তরের কারণকি ? সেই যেতুমি আপনার অবসাদ ময় জীবন খানি লইয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলে “আর পারি না প্রভো”—তাহা আর কিছু
নহে যথার্থ অনুতাপের বেদনা মাখান মূর মে নয়ন ধারা হৃদয় জুড়ান অনুতপ্ত
অশ্রুজল অনুতাপী পাপীর বেদনা মাখান মূর ভগবচ্চরণে পৌঁছায়, সে নয়ন
জল তাঁহার চরণ দুটি ধৌত করিয়াদেয়। তাই তিনি প্রসন্ন হইয়া মানব
হৃদয়ে তাঁহার স্নেহানীষ পুঁদান করেন তাই, অনুতপ্ত জীবন খানি জুড়াইয়া
বায় হৃদয়ের ভার লাঘব হয় জীবন অমৃত উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয়। হায় ! আমরা
কতদিনে সেই যথার্থ অনুতাপের কৃপাকণা লাভ করিয়া ভগবৎ প্রসন্নতা
লাভ করিব !!

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তোফী)

শিবাঁপরাধ-ক্ষমাঁপন-স্তোত্রম্

(শঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্)

(১)

আদৌ কস্মিঁশ্রমঙ্গাং কলয়তি কলুষং মাতৃকুলৌ স্থিতং মাং
বিগ্না ত্রামেধ্যামধ্যে কথয়তি নিতরাং জাঠরৌ জাতবেদাশ।
যদ্ যদ্ বা তত্র দুঃখং ব্যথয়তি সত্ততং শকাতে কেন বক্তুং
ক্ষমব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

পূর্নজন্মে করিয়াছি অন্তায় করম,

তাই মোর মাতৃগর্ভে হইল জনম ।

বিষ্ঠা-কূত্র-মধ্যে বাস করি অবিবর্ত

জঠর-অনল-জ্বালা সহিয়াছি কত !

যত কষ্ট পাইয়াছি তথা অনুক্ষণ

বর্ণন করিবে তাহা, হেন কোন্ জন ?

শিব শিব শিব শস্তু ওহে মহেশ্বর !

ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সখর !

(২)

বাল্যে হুঃখাতিয়েকো মললুলিত্বপুঃ স্তম্ভপানে পিপাসা
নো শক্যঃ চেন্দ্রিয়েভ্যো। ভবগুণজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি ।
নানারোগোথহুঃখাঃ প্রাহুদরপরিবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি
কস্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো

বাল্যে হুঃখ-ধৃত, মলে মর্দিত-শরীর,
স্তম্ভপান হেতু কঁত হয়েছি অধীর ।
ইন্দ্রিয় থাকিতে ছিছু জড়ের মতন,
পিপীলিকা মশকাদি ক্রান্ত সংশন ।
বিষম ব্যাধির জালা, ক্ষুধার কাতর,
তাই নাতি স্মরিয়াছি তোমার শঙ্কর !
শিব শিব শিব শব্দে ওহে মহেশ্বর !
কম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর !

(৩)

প্রৌঢ়োহহং যৌবনহো বিষয়বিষয়ৈঃ পঞ্চভির্মর্শসঙ্কৌ
দষ্টৌ নষ্টৌ বিবেকঃ স্ততখনযুবতিশ্বাদশৌখ্যে নিবধঃ ।
শৈবীচিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ভাধিক্রুতং
কস্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

আসিলে যৌবন, পঞ্চ বিষয়-ভুজঙ্গ
মর্শে মর্শে মংশে ছিল এই মোর অঙ্গ ।
লইয়া যুবতী নারী, ল'য়ে পুত্র পুত্র
যা ছিল বিবেক-বুদ্ধি, দিছু বিসর্জন ।
মানে গর্ভে তব চিন্তা না করিল মন,
শেষে আমি প্রৌঢ় হ'য়ে পড়িছু তখন ।
শিব শিব শিব শব্দে ওহে মহেশ্বর !
কম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর !

(৪ •)

বান্ধক্যে চেল্লিয়ানাং বিগতগতিমতিশ্চল্লিধৈবাদিতাপৈঃ
পাটৈপ রোগৈর্বেয়োটৈগ স্বমবাসিতবপুঃ প্রোচিহীনঞ্চ দৌনম্ ।
মিথ্যামোহাভিলাষৈব ভ্রমতি মম মনো ধূর্জটে ধ্যানশৃঙ্খ
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

প্রোচকাল চ'লে গেল, বান্ধক্য এখন,
তথাপি ইচ্ছিয়-স্থখে ব্যস্ত অনুরূপ !
ত্রিতাপ বিয়োগ রোগ পাপ সমুদয়
সহিয়াও এ দেহের নাহি হ'লো ক্ষয় !
মিথ্যা মোহ-অভিলাষে করিয়া ভ্রমণ
না করিল তীব চিন্তা কভু মোর মন !
শিব শিব শিব শঙ্কু ওহে মহেশ্বর !
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্ত্বর ।

(৫) •

নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনং প্রত্যাবাস্তাকুলাধ্যং
শ্রোতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে স্মরারে ।
নাস্থা ধর্ম্মে বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং নিদিধ্যাসিতব্যং
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

• স্মৃতিমত কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবাস্ত,
চেষ্টাও করিতে মোর শক্তি নাই তায় ।
ষিজোচিত ব্রহ্মমার্গ একমাত্র সার,
বেদোচিত কর্ম্ম পুনঃ অসাধ্য আমার ।
স্তনিতে চিন্তিতে ধর্ম্ম-কথ্য নাহি চাই,
কিবা ফল তবে ধ্যান করিয়া সদাই ?
শিব শিব শিব শঙ্কু ওহে মহেশ্বর !
ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্ত্বর ।

(৬)

স্বাস্থ্য প্রত্যাশকালে স্মরণবিধিবিধৌ নাহুতং গান্ধতোয়ং
পূজার্থং বা কদাচিৎ পৃথুতরগহনাং থণ্ডবিবীদলানি ।

নানীতা পদ্মমালা সরস্বিতী বিকসিতা গন্ধধূপৌ তদর্থং
 কস্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥
 প্রত্যাষে করিয়া স্নান স্পর্শন কারণ
 না আনিহু গঙ্গাজল ভুলেও কখন ।
 অতি সুহৃগম বন সন্ধাম করিয়া
 না আনিহু বিবৃপত্র পূজার লাগিয়া ।
 গন্ধধূপ কিছা পদ্মমালা সরোবরে
 না আনিতে চাহিলাম কভু তব তরে ।
 শিব শিব শিব শঙ্কু মহে মহেশ্বর !
 কম মোর অপরাধ হইয়া পড়র ।

(৭)

হৃদৈশ্চ মধ্বাজ্যযুক্তৈর্দধিস্নিতসহিতৈঃ স্নাপিত্ব নৈব লিঙ্গং
 নো লিঙ্গং চন্দনাদৈঃ কনকচিত্রচিতং পূজিতং ন প্রসূতৈঃ ।
 ধূতৈঃ কর্পূরদীপৈর্বিবিধসসযুতৈর্নাপি ভক্ষ্যোপহাটৈঃ
 কস্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

হৃদ মধু স্নাত দধি শর্করা লইয়া
 নাহি দিহু লিঙ্গ তব স্নান করাইয়া ।
 কনক-চিত্রিত লিঙ্গে লেপিয়া চন্দন,
 কিছা পুষ্প দিয়া নাহি করিহু পূজনা ।
 না দিহু সুরস ভক্ষ্যাদ্রব্য উপহার,
 না দিহু কর্পূর-দীপ কিছা ধূপ আর ।
 শিব শিব শিব শঙ্কু ওহে মহেশ্বর !
 কম মোর অপরাধ হইয়া সড়র ।

(৮)

গঙ্গাতীরেহুপাষিতা দলকুম্ভমফলৈঃ কালিতৈর্গাঙ্গতোমৈঃ
 গাঙ্গং নিশ্চায় লিঙ্গং শতশতশতকং নার্কিতং ভূতলে মে ।
 নো লিঙ্গং গেহমধ্যে ধরণিতলগতৈ স্তম্ভিকাগোময়ে বী
 কস্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

গঙ্গাতীরে করি বাদ, গঙ্গামাটা দিয়া
 শত শত শিবুলিঙ্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়া,
 দিয়া পত্র-ফল-পুষ্প ধুয়ে গঙ্গাজলে
 না করিহু পূজা তব আসিলা ভূতলে ।
 মৃত্তিকা গোময়ে কিছা করিয়া রচন
 তব লিঙ্গ ন্না পূজিহু ভুলেও কখন ।
 শিব শিব শিব শঙ্কু ওহে মহেশ্বর !
 ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর ।

(৯)

খ্যাখ্যা চিত্তে শিবাধঃ প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং বিজেভ্যো
 হব্যং তে লক্ষসংখ্যাং হতবহবদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ ।
 নৌ তপ্তং গাঙ্গতীরে ব্রতজপনিয়মৈ রুদ্রজাপৈ স্বদর্শং
 ক্ষত্বব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

বারেক তোমার নাম করিয়া স্মরণ
 না করিহু ধনদান ব্রাহ্মণে কখন ।
 জপিতে জপিতে বীজমন্ত্র অনিবার
 অনলে আহুতি নাহি দিহু লক্ষবার ।
 যথাবিধি রুদ্র-জপ করিয়া স্মরণ
 গঙ্গাতীরে তপ নাহি করিহু কখন ।
 শিব শিব শিব শঙ্কু ওহে মহেশ্বর !
 ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্বর ।

(১০)

স্থিত্বা স্থানে সরোজ প্রণবময়মকুণ্ডলে সুস্মমার্গে
 শাস্ত্রে স্বাস্ত্রে প্রলীনে প্রকটিতবিভবে দ্যোতরূপে পরাধ্যে ।
 লিঙ্গং স্বব্রহ্মবাচ্যং সকলমতিমতং নৈব দৃষ্টং কদাচিত্
 ক্ষত্বব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

নিয়োগি প্রণব-বায়ু বসি পদ্মাসনে
 বাহু-জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে স্বরূপ-চিহ্ননে

দিব্য জেযুতির্কয়ে হৃদি করিয়া ধারণ
 পরমায়ে আত্মহারা না হই কখন ।
 কেভু না হেরিহু মোর মানস ভিতরে
 তব পূর্ণ ব্রহ্মরূপ মন প্রাণ ভ'য়ে ।
 শিব শিব শিব শক্তু ওহে মহেশ্বর !
 • ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্তর ।

(১১)

নগ্নো নিঃসঙ্গশুদ্ধ ত্রিগুণবিরহিতো ধ্বস্তমোহাঁককারো
 নাসাগ্রে ব্রহ্মদৃষ্টি বিগতভবগুণো নৈব হৃষ্টঃ কদাচিৎ ।
 উন্নতাবস্থয়া ত্বাং বিগতকলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি
 ক্ষস্তব্যো মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

উলঙ্গ নিঃসঙ্গ শুদ্ধ ত্রিগুণ-রহিত,
 মোহ-পরিশূন্য ভব-গুণ-বিবর্জিত,
 ধ্যানকালে ব্রহ্মদৃষ্টি নাসারঙ্গ-দেশে,
 এক্ষেপে না রহিলাম মনের হরষে ।
 হে শঙ্কর কলি-কাল-পাপ-বিনাশন !
 মত্ত হ'য়ে না করিহু তোমার স্মরণ ।
 শিব শিব শিব শক্তু ওহে মহেশ্বর !
 ক্ষম মোর অপরাধ হইয়া সত্তর ।

(১২)

চক্রোস্তাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে
 সর্পৈর্ভূষিতকণ্ঠকর্ণবিববে নেত্রোথবৈশ্বানরে ।
 দস্তিত্বক্কৃতস্বন্দর্যাস্মরণৈর্নৈত্রলোকাসারৈ হরে
 মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমচলামত্রেস্ত কিং কস্মভিঃ ॥

স্মরহর গঙ্গাধর শশাঙ্ক-শেখর,
 ভূঙ্গঙ্গ-ভূষিত-কণ্ঠ-শ্রবণবিবর
 নেত্র-বৈশ্বানর দেব ক্ষেমঙ্কর হর,
 ত্রিভুবন-সার হস্তি-চর্ম্মাশ্রয়-ধর ।

মোক্‌সেহেতু কর তব স্তনির্শল্য মন,

অন্য কোন কর্শে আর কিবা প্রয়োজন !

(১৩)

কিং বানেন ধনেন বাজিকরিতিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং

কিং বা পুত্রকুলত্রমিত্রপশুভির্দেহেন গেহেন কিম্ ।

জাতৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ

স্বার্থঃ গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্কীভীবল্লভম্ ॥

হস্তি-অশ্ব-ধনে কিবা রয় প্রয়োজন ?

বিশাল সাম্রাজ্য ল'য়ে কি ফল কখন ?

পুত্র মিত্র কুলত্র পশুতে কিবা হয় ?

দেহে গেহে প্রয়োজন কিবা আর রয় ?

এই সব ক্ষণস্থায়ী জানিয়া রে মন !

শীঘ্র দূর কর তাহা, রেখো না কখন ।

আত্মোন্নতি-হেতু যদি গুরুবাক্য মতি,

ভজ ভজ ভজ সেই পার্কীভীর পতি !

(১৪)

আয়ুর্নশ্চি পশুতাং প্রতিদিনং ষাতি ক্ষয়ং যৌবনং

প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুন ন দিবসাঃ কালো জগন্তক্ষকঃণ

লক্ষ্মীস্তোত্রতরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যাচলং জীবিতং

তস্মান্নাং শরণাগতং শরণদ স্বং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥

দেখিতে দেখিতে আয়ু বাইছে চলিয়া,

যৌবন বাইছে চলি, দেখিলু ভাবিয়া,

চলিয়া বাইছে দিন, না ফিরিছে স্থার,

গ্রাস করিতেছে কাল জগৎ-সংসার,

তরঙ্গের মত লক্ষ্মী অস্থির নিয়ত,

এ জীবন ক্ষণস্থায়ী বিদ্যাভের মত ।

বড়ই বিশদ মোর বিপদ-শরণ !

কর কর রক্ষা মোরে, ওহে ত্রিলোচন !

(১৫)

বপুঃ প্রার্থুর্ভাবানহুমিতম্বিদং জ্ঞানি পুরাঃ
 পুরারে ন প্রায়ঃ কচিদপি ভবন্তং প্রণতবান্ ।
 নমন্ মুক্তঃ সম্প্রত্যাহমতনুরগ্রেহপ্যানতিভাক্
 মহেশ ক্ষম্তব্যং তদিদমপরাধমমপি ॥

• পূর্বজন্মে এ দেহ ফে ছিল বিদ্মান,
 এ জন্মে এ দেহ দেখি হয় অহমান ।
 পূর্বজন্মে হে শঙ্কর ! আসিয়া ধরায়
 প্রণাম না করিয়াছি প্রায় হে তোমায় ।
 এ জন্মে প্রণামি হ'লো দেহের, মোচন,
 দেহ নাই, কিসে করি প্রণাম এখন ।
 ছুই জন্মে ছুই দোষ করেছি শঙ্কর,
 এখন ক্ষমিতে তাহা হও হে সত্বর ।

(১৬)

করচরণকৃতং বাক্কায়জং কৰ্মজং বা, শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্ ।
 বিদিতমবিদিতং বা সৰ্বমেতৎ ক্ষমস্ব, জয় জয় করুণাক্রে শ্রীমহাদেব শস্তো ॥

কায় মন বাক্য কর অথবা চরণে,
 কাধাস্ত্রে কিম্বা আর শ্রবণে নয়নে,
 জানিয়াই হোগ্ কিম্বা হোগ্ না জানিয়া
 করেছি যে সব পাপ ভ্রমেতে পড়িয়া,
 সেই সব পাপ মোর ক্ষমহ সত্বর,
 জয় জয় দিব শত্ৰু করুণাম্ভাগর !

(১৭)

শাস্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমূৰ্ত্তং পঞ্চরক্তং ত্রিনেত্রং
 শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গাং পরশুসপি বরং দক্ষিণাজে বহন্তম্ ।
 নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুকসহিতং চাক্ষুশং বামভাগে
 নানালঙ্কারদীপ্তং ফটিকমণিনভং পার্শ্বতীশং ভজামি ॥

ষিনি শান্তি-নিকেতন, শশাক-ভূষণ,
 পদ্মাসম পঞ্চানন ষিনি ত্রিলোচন,
 ত্রিশূল পরশু ধ্বজা পুনশ্চ কুলিশ
 দক্ষিণাঙ্গে শোভা পায় ষার অর্হর্নিণ,
 অক্ষয় ডমরু নাগ পাশ ঘণ্টা আর
 মনোহর শোভা করে বামাঙ্গে বাঁহাট,
 স্ফটিক-সমান ষিনি, ভূষণ-শোভন,
 ভজি আমি নিত্যসেই:পার্বতীরমণ !

(১৮)

বন্দে দেবমুমাপতিং সুরশ্রেষ্ঠং বন্দে জগৎকারণং
 বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশুনাং পতিম্ ।
 বন্দে সূর্য্যশশাকবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং
 বন্দে ভক্তজনপ্রিয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্ ॥

বন্দি উমাপতি, বন্দি সুর-শ্রেষ্ঠ-ধন,
 বন্দি সর্বক্ষণ সেই জগৎ-কারণ ।
 বন্দি মৃগধর, বন্দি পন্নগ-ভূষণ,
 বন্দি সেই পশুপতি আমি সর্বক্ষণ ।
 বন্দি সেই চন্দ্র-সূর্য্য-অনল-নয়ন,
 বন্দি আমি নিত্য সেই হরি-প্রিয়-ধন ।
 বন্দি সেই ভক্তজন-পরম-শরণ,
 বন্দি সেই শিব শঙ্কু মঙ্গল-বচন ।

(১৯)

গাত্রং ভ্রাস্মিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং
 ধট্টাঙ্কঞ্চ সিতং সিতশ্চ বুযভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে ।
 গজাফেনসিতা জটা পুণ্ড্রপতে শ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্দ্ধনি
 সোহয়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ ॥

শুভ্র-ভ্রাস্ম-দেহ, শুভ্র সহাস্র-বদন,
 নরের কপাল শুভ্র হস্তে-অমুক্ষণ,

সুন্দর পুষ্টাঙ্ক শুভ্র শোভে অবিরল,
 শুভ্রবৃষ, শুভ্র পুনঃ কর্ণের কুণ্ডল,
 শুভ্র গজাজল-ফেন, শুভ্র জটাভার,
 ভালে শুভ্র চন্দ্রদেব শোভে অনিবার,
 শুভ্র বস্ত্র ল'য়ে যার প্রীতি সর্বক্ষণ,
 সেই শিব দিন মোরে পাপনাশী ধন !

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ

চরকীর নীতি ।

ন নিয়মং ভিন্দ্যাৎ—নিয়ম-ভঙ্গ করিও না, যদি পিতৃ-পিতামহাদি-
 কৃত কোনও শুভোদেশমূলক প্রথা গৃহমধ্যে প্রচলিত থাকে, তাহা সহসা
 লঙ্ঘন করিও না, অথবা যদি তুমি নিজে বহুবিচার পূর্বক কোনও নিত্য-
 কর্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া থাক, তবে তৎসম্বন্ধেও বিস্মৃত বা অনভিনিবিষ্ট
 হইও না ।

ন বুদ্ধাশ্চ ন গুরুন ন গণান্ ন নৃপান্ বাধিক্ষিপেৎ ন চাতিক্রয়াৎ—
 বুদ্ধদিগের বিষয়ে, গুরুদিগের সম্বন্ধে, কোনও সম্ভ্রদায়ের সম্বন্ধে এবং রাজার
 সম্বন্ধে কোনও নিন্দাবাদী মুখে আনিও না, অথবা তাঁহাদের অভ্যাস বা ক্রিয়া
 কলাপের অতিরঞ্জিত বর্ণনাও করিও না ।

নাভূতভূত্যো না বিশ্রদ্ধস্বজনো নৈকঃসুখী স্ত্র্যাৎ—রক্ষিত ভূত্যের
 পাগনে অমনোযোগ, স্বজন সমূহের প্রতি অবিশ্বাস, এবং পর-সুখ-হঃখে অক
 হইয়া কেবল আত্মসুখ-চেষ্টা কদাপি করিও না ।

ন গবাং দণ্ড মুদাচ্ছেৎ—গাভীর প্রতি কখনও দণ্ড উত্তোলিত
 করিও না ।

দ্রব্যগুণ বিচার ।

কার্পাসী ।

• বাঙ্গালা নাম—কাপাস; হিন্দী—কপাস, কইকে পেড়; ইংরাজী—Cotton Plant; সংস্কৃত পর্যায়—কার্পাসী তুণ্ডিকেরী চ সমুদ্রান্তা চ কথ্যতে । সংস্কৃত নাম—কার্পাসী, তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রান্তা । অন্তরনাম—বদরা, পটল, স্তম্ভপুষ্পা, চব্যা, তুলা, শুড়, মরুদ্ভবা, পিচু, ছাদন ।

কাপাসের গাছ মাঠের লেড় বা ডুই গুণ উচ্চ হয় । পাতা প্রায় স্থলপদ্ম পাতার মত, বোঁপা বোঁপা ফল গুলি ফাটিয়া তুলা বাহির হয়, তাহার মধ্যে বড় এলাচের দানা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় কাল কাল বীজ থাকে । ফুল শাদা হয় । কিন্তু আর এক প্রকারের কাপাস আছে তাহার ফুল লাল, তাহাকে “রক্ত কাপাস” বলে । ভারতবর্ষে কাপাস বৃক্ষ বহুল পরিমাণে জন্মে ।

শ্বেত কাপাসের গুণ ।

কার্পাসকী লঘু: কোষ্ठा मधुरा वातनाशिनी ।

तदीजं सुखदं व्यां मिथुं कफकरं शुक्र ॥

तुं कर्ण पीडका नाद पूषश्राव विनाशनम् ॥

শ্বেত কাপাস লঘু, ঐষহৃষ, মধুর রস, বায়ুনাশক । ইহার বীজ সুস্তপ্রদ, ব্যা, মিথু, কফকর ও শুক্র । ইহা কর্ণ-পীড়কা, কর্ণনাশ, ও কর্ণের পুষশ্রাব বিনাশক ।

রক্তকাপাসের গুণ ।

• রক্তকার্পাসিকা স্বাদী স্তম্ভবৃদ্ধিকরী তথা ।

কিঞ্চিৎক্ষা বলকরী কষারা চ লঘু: স্নাতা ॥

কফপিত্ত ভৃষাদাহ ভ্রম শ্রম বমী হরা ।

মূচ্ছাবিনাশিনী শীতা প্রোক্তা গুণ রিশারদৈঃ ॥

তৎপলাশ সমীরণং রক্তকুং স্ত্রবর্দ্ধনম্ ॥

রক্তকার্পাস স্বাদু, কষাণ রস, স্তম্ভ বৃদ্ধিকর, ঐষহৃষবীৰ্য্য, বলকর, লঘু, কফপিত্ত ভৃষাদাহ ভ্রম শ্রম ও বমী নাশক । ইহা মূচ্ছা প্রশমক, শীতল, এবং ইহার পাতা বায়ুনাশক, (জরায়ুর) রক্ত শ্রাব কারক এবং মূত্রবৃদ্ধি কর ।

প্রয়োগ—কাপাসের প্রধান প্রয়োগ বস্তাদি নির্মাণের উপকরণ

সম্বন্ধীয়। বস্ত্র বয়ন জন্ত এপূর্ণ্য পতপ্রকার সূত্রপ্রদ বৃক্ষ বা প্রাণী আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে কার্পাসকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়। ইহার বস্ত্র নাতি শীতোষ্ণ, সুখস্পর্শ, এবং ভারতবাসীর পক্ষে শীত-গ্রীষ্মে দেহের সমান উপকারী।

কাপাসের বীজ বাতরোগের স্বেদ জন্ত ব্যবহৃত হয়। শব্দর স্বেদ নামে শাস্ত্রে যে উৎকৃষ্ট স্বেদ আছে তাহা এই—

কার্পাসাস্থি কুলথিকা তিলযবৈবেররও মৃলাতসী।

বর্ষাভূ শনবীজ কাঞ্জিক যুতে রৈকীরুঠে বা পৃথক্।

কাপাসবীজ, কুলথ, তিল, যব, এরণ্ডমূল, মসিনা, পূর্ণবা, ও শনবীজ একত্র কাঁজিসহ বাটিয়া পোটুলী করতঃ অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া স্বেদ দিলে নানাস্থানের বাতব্যথা দূর হয়।

কোনও স্থান ফুলিলে ও ব্যথা হইলে কাপাসবীজ চূনের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়। কর্ণমধ্যে ব্রণ হইয়া পূঞ্জ নিঃসৃত হইলে কাপাস-বীজ-সিদ্ধ সর্ষপ তৈল কাণে দিতে হয়।

জ্বালোকের স্তনে দুধ কম হইলে কাপাস পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবার নিয়ম আছে।

সংস্কৃতে যে “রক্ত কার্পাস” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই সম্ভবতঃ আজকালকার “ওলট কষল”! ওলট কষলের গুণ জানিতে বোধ হয় আর কাহারও বাকী নাই। ইহার মূল বা পত্রের রস বাধক রোগের বিশেষ উপকারী। অনেকে বলেন রক্তকৃচ্ছ ও বাধক ব্যথার পক্ষে এমন ঔষধ আর নাই। রক্ত কার্পাসের গুণবর্ণক শ্লোকটির শেষ পংক্তিতে যে “রক্তকৃৎ” বিশেষণটি রহিয়াছে তাহা দ্বারাই এই প্রসিদ্ধ গুণের আভাস পাওয়া যায়। সচরাচর বাধক রোগে শুধু ওলট কষলের শিকড় (আনাজ ১০ আনা বা ১০ আনা পরিমাণ) ২৫-৩০টা গোঁলমরিচ সহ বাটিয়া খাইবার প্রথা আছে।

শ্রীমদ্ গোবিন্দ দাস স্বকৃতঃ সংগ্রহে এই উৎকৃষ্ট ষোগটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

কন্দং রক্তোৎপলস্তাধ রক্ত কার্পাস মূলকম্।

করবীরস্ত মূলানি তথা রক্তোদ্ভূ মূলকম্

বকুলস্ত তথা মূলং গন্ধ মাতৃক জীরকৌ।

রক্তচন্দনকং চৈব সমভাগকং কারয়েৎ

ততুলোদক সংপিষ্টং যোনিরোগ হরুঃ পরম্ ।

- অর্থাৎ রক্তোৎপলের মূল্য, লাগীকাপাসের মূল, কনুবীর মূল, লাল অবা বৃক্ষের মূল, বকুলমূল, গন্ধবোল, জীরা ও রক্তচন্দন এই সমুদায়ের চূর্ণ ততুলোদক সহ সেবন করিলে যোনিশূল, কুক্ষিশূল প্রভৃতি নানারূপ বাধক অপমৃত হয় ।

কাপাসের তুলা পোড়াইয়া তাহা আহিত স্থানে লাগাইলে রক্তশ্রাব নিবারিত হয়, ক্ষতস্থানে দিলে ক্ষত শুষ্ক হয় ।

• স্তন্যসংযুক্ত কাপাসের তুলা দধি ক্ষতাবিতে লাগাইয়া রাখিলে বাহুবায়ুর সংস্পর্শ স্বগিত ও তৎস্থানের স্বাভাবিক তাপ সংরক্ষিত হওয়ার বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয় ।

কাল-কাস্মুন্দে ।

বালালা—ঐ, ইংরাজী—Casia Soffora. সংস্কৃত—কাসমর্দ, কালস্কন্ধ । ইহা একপ্রকার গুণ্ড, ২।৩ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়, পাতা প্রায় মনুষ্যচক্ষুর ত্রায় । লম্বা লম্বা স্বক শিমের ত্রায় ফল হয়, তন্মধ্যে মূগের ত্রায় বীজ থাকে ।

ইহার পত্র, বীজ ও মূল ঈনাবিধ চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয় । ছকার জলে লবণসহ ইহার বীজ বা মূল বাটিয়া লাগাইলে দ্রুত দূর হয় ; পত্রের রুস গন্ধক সহ লাগাইলে চুলকানী ও পাচড়া সারে । ইহার বীজের চূর্ণ ৩৪ রতি মধুসহ চাটিয়া খাইলে খাস-কাসে উপকার দর্শে । কোনও প্রাচীন বৈদ্য তাঁহার নিজের খাস কাস রোগের জন্ত এই মুষ্টিযোগ আবিষ্কার ও লবহার করিয়া ফল পাইয়াছিলেন—যথা কালকাস্মুন্দে বীজ চূর্ণ, ময়ূর পুচ্ছভস্ম ও হিংভস্ম একত্রে পুরাতন স্ততে মাড়িয়া সিদ্ধছোলাপ্রমাণ বড়ী করিতে হইবে । অল্পপান কর্তব্য জল । প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেব্য । •

চক্রদত্ত লিখিয়াছেন—কালকাস্মুন্দে বীজ, মূলায় বীজ ও গন্ধক সমভাগে জলসহ বাটিয়া লেপদিলে, ছুলি ও ধবল আরোগ হয় ।

কালমেঘ ।

ছোট ছোট গুণাবিশেষ, ভারতের গ্রাম সর্বত্রই পাওয়া যায়, পাতা কতকটা লম্বার পাতার মত কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সরু ; এই গাছের ডাল পাতা মূল সমস্তই অত্যন্ত তীব্র তিক্তাস্বাদযুক্ত ।

হিন্দুস্থানীরা ইহাকে কল্লনাথ বলে । সংস্কৃতে ইহার নাম মহাতিক্ত ও যবতিক্ত । চরকাদি পুরাতন আয়ুর্বেদ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই । তৈষম্য-রত্নাবলিতে ইহার প্রয়োগ আছে ।

কালমেঘ পিত্তনাশক, পাণ্ডু, প্লীহা ও বহুদের উপকারী ; জীর্ণজ্বরনাশক অগ্নিকর ও বলকর । রক্তামাশয় রোগেও উপকার করে । আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা উক্ত রোগগুলিতে কালমেঘের উপকারিতা দেখিয়া ইহার আরক বাহির করিয়া ব্যবহার করিতেছেন ।

শিশুদের বহুদরোগে কাপমেঘের শক্তি অত্যন্ত তিক্ত উদ্ভিজ্জ অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয় ।

পূর্বকাল হইতেই বঙ্গীয় প্রাচীন গৃহিণীরা কালমেঘের গুণ অবগত আছেন, তজ্জন্যই তাঁহারা সত্বোজাত বা অন্নবয়স্ক শিশুদিগকে কালমেঘ ঘটিত একপ্রকার বটা খাওয়াইয়া থাকেন । এই বটাকে আলুই বা আলোই বলে । ইহাতে কালমেঘের পাতা ছাড়া ঘোয়ান্ লবঙ্গ জীরা বড় এলাচ ও দারুচিনি থাকে । বড়ী মটর প্রমাণ করিতে হয় । এই বড়ী শিশুদিগকে ভাল অবস্থায় মধ্যে মধ্যে খাওয়াইলে তাহাদিগের জ্বর আমাশয় কাস সর্দি বমী ও জ্বর হইতে পারে না । অথবা ঐ সব রোগে সেবন করাইলেও তাহা দূরীভূত হয় । আজকাল যে এত বহুৎ-দোষ শিশুদের মধ্যে দেখা গাইতেছে তাহার অন্ততম কারণ নবীন গৃহ-বধুদিগের এই আলুই সম্বন্ধে অজ্ঞতা ।

তৈষম্যরত্নযুক্ত গুড়ু চ্যাদি চূর্ণের উপকরণে কালমেঘ আছে—

গুড়ু চ্যতিবিষা শুষ্ঠী ভূমিষো যবতিক্তকম্ ।

মুস্তং কণা যবক্ষারঃ কাসীসং ভ্রমরাতিথিঃ

যকুৎ প্লীহ পাণ্ডুরোগ মগ্নিমান্দ্য মরোচকং ।

জ্বর মষ্টবিধং হস্তি সাধ্যাসাধ্য মথাপিবা ॥

গুলক, আতইচ, শুঠ, চিরতা, কালমেধ, মুখা, পিপ্পলী, ষব্কার, হীরাকস, ও চাঁপার ছাল, সমভাগে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিতব্য । মাত্রা ১—২ মাষা । ইহাতে বক্তৎ প্রীহা পাণ্ডুরোগ, অগ্নিমান্দ্য অরুচি, ও অষ্টবিধ জ্বর দূরীভূত হয় ।

কাবাবচিনি ।

এই জিনিসটী চরকাণ্ডি প্রাচীন আয়ুর্বেদ-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না । জাবা ও মলকাদ্বীপে জন্মে । ইহা প্রথমে ইউনানী চিকিৎসকেরা ব্যবহার করেন । এক্ষণে ইহা এত বহুলরূপে কবিরাজসম্প্রদায় মধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে যে ইহা এস্থলে, বিলক্ষণ উল্লেখ-যোগ্য । আধুনিক দ্রব্যগুণ গ্রন্থে ইহার—“স্বরপ্রিয়ং বৃত্তফলং” এই দুটি সংস্কৃত নাম কল্পিত হইয়াছে, ইতঃ পর এই নামই ভবিষ্যতে নব-রচিত চিকিৎসাগ্রন্থে প্রচলিত হইবে ।

বাস্তালা নাম—কাবাবচিনি, হিন্দী-শীতলচিনি বা শীতল মিরিচ; ইংরাজী—Cubeba.

স্বরপ্রিয়ং বৃত্তফলং তদ্বায়ুশমনং মতম্ ।

শ্লেষ্মোৎসারণ মাগ্নেয়ং মূত্রবৃদ্ধিকরং তথা ।

ওপসর্গিক মেহঞ্চ শুক্রমেহং সুদারুণম্ ।

শ্বেত প্রদর মশাংসিকুচ্ছুকাপি বিনাশয়েৎ ॥ সংগ্রহ ।

ইহা বায়ুশমনক, কফনিঃসারক, আগ্নেয়, মূত্রবৃদ্ধিকর । বিষাক্তমেহ শুক্রমেহ শ্বেতপ্রদর অর্শ ও মূত্রকুচ্ছ বিনাশক । মাত্রা ১/০ আনা হইতে ১/০ আনা ।

প্রয়োগ—ইহা ইংরাজীমতে একটা “মুহ-উত্তেজক বস্তু”, এই উত্তেজন ক্রিয়া প্রধানতঃ মূত্রযন্ত্রে প্রকাশিত হয়, তজ্জন্ত ইহা সেবনে প্রস্রাব বৃদ্ধি হয় । ইহার এই প্রভাব থাকায় নূতন বিষাক্ত মেহে ইহার প্রভূত ক্ষমতা ।

পশ্চাত্য চিকিৎসকেরা এতদুরোগ শ্রীশমন সম্বন্ধে ইহার প্রতি বিশেষ আদর প্রদর্শন করেন । তাঁহারা ইহার চূর্ণ অপেক্ষা ইহা হইতে নিঃসারিত তৈলই অধিক প্রয়োগ করেন । কখন কখন তাঁহারা অধিকতর ফলাশায় ইহার সহিত চন্দন তৈল মিশাইয়া থাকেন । কবিরাজগণ কাবাবচিনির সহিত

বেগামূল, গোকুরবীজ, বাবলাছাল প্রভৃতি সংযোগ করিয়া পাচনরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন ।

কাবাবচিনির গুঁড়া মেহাধিকারোক্ত বস্ত্রেশ্বরের একটি প্রধান অঙ্গুপান । কাবাবচিনির গুঁড়ার সহিত কাঁচা হলুদের রস সংযুক্ত হইলে উক্তমেহে অধিকাংশস্থলে অতীব আশ্চর্য উপকার পাওয়া যায় ।

জীলোকের জননেত্রির মধ্যে প্রদাহ উপস্থিত হইলেও ইহার প্রয়োগে উপকার দর্শে ।

কাবাবচিনি স্বপ্নদোষের একটি মহৌষধ । ১০ আনা মাত্রায় রাজ্যে শয়নকালে কর্পূরের জলসহ সেবন করিলে স্বপ্নদোষ দূরীভূত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ; উহাতে কিঞ্চিৎ চূণের জল সংযুক্ত হইলে আঁচরা ভাল হয় । কাবাবচিনি শুষ্কসারোগে উপকারী । মিশ্রীসংযোগে মুখে রাখিলে উৎকাসি নিবারিত হয়, কখন কখন ইহাঘারা হাঁপানিও উপশমিত হয় ।

কাবাবচিনি পানের মশলারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু অধিক দিলে বিষাদ হইয়া যায় ।

কামিনী ।

ইহা এক প্রকার ফুলের গাছ ; অবশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন । ফুল গুলি অতীব সুগন্ধ, ছোট ও শাদা, হাত দিলে করিয়া পড়ে । পাতাগুলি ছোট ছোট, জঁষৎ লম্বা । গাছ নাম্বুকের দেড় দুইগুণ উচ্চ হয়, চারিদিকে ইহার ডাল গুলি বিস্তৃত হইয়া ঝোপু হইয়া উঠে । উদ্যানের, বিশেষতঃ, প্রবেশ পথের শোভার জন্য ইহার বড় আদর । ইহার উল্লেখ আয়ুর্বেদে দৃষ্ট হয় না । তথাপি বহুকাল প্রচলিত লৌকিক ব্যবহার দ্বারা ইহার যে গুণ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এখানে উল্লেখ্য ।

এই গাছ জাতী-বৃথী ফুলের গাছের সমগুণ । ইহার পত্র কটুতিক্তরস, ও কতর । জাতী পত্রের স্তায় ইহারও পত্র সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথের সহিত মুখ ধুইলে মুখের ঘা ভাল হয় । অনেক সময়ে জাতী পত্রের অপেক্ষাও কামিনী পাতার এবিধে অধিক গুণ দৃষ্ট হয় । জীবা পুরুষের গণোরিয়া রোগে মূত্র নালীর মধ্যে প্রদাহ হইলে কাথের পিচকারী উপকারী ।

পাতার কাথে অন্ন ফটকারী মিশাইয়া পিচকারী কুরিলে বিশেষ কল-পাওয়ার যায় ।

• কামিনীকুল স্তম্ভ সৈন্ধব সংযোগে^১ ভাজিয়া থাকিলে কৃমিরোগীর উপকার হয় ।

কামিনীর ডাল কুঁড়িয়া উত্তম মালা^২ প্রস্তুত হয় । তাহা ঔষধ সম্প্রদায় মধ্যে ব্যবহৃত হয়, ইহার ডালে^৩ অতি উৎকৃষ্ট লাঠী প্রস্তুত হয় তাহা হাতে করিয়া বেড়াইলে নাকি সাপের ভয় থাকে না ।

কালাদানা ।

ইহা এক প্রকার ছোট বৃক্ষের বীজ, ইংরাজীতে “কার্বাইটিস্ নীল” বলে । ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে জন্মে । বীজগুলি কোণযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষুদ্র । শুঁড়া করিলে ধূসরবর্ণ হয় । মুখে দিলে কটু ও স্নিগ্ধ মিষ্ট আশ্বাদ । অনেকক্ষণ মুখে রাখিলে মুখমধ্যে চিন্ চিন্ করে । ইহার চূর্ণ জলে গুলিলে একটু আঠা আঠা হয় ; সুতরাং উত্তমরূপে জলে গুলিয়া না দিলে বমি হইয়া বাইতে পারে । কালাদানাচূর্ণ প্রল-রেচক, যোগ্যমাত্রায় সেবন করিলে দান্ত হইতেই হইবে । এবং বিরোচন ক্রিয়া ১২ ঘণ্টার মধ্যেই প্রকাশ হয় । ইহা সোণামুখী অপেক্ষা একটু উষ্ণবীৰ্য্য । সুতরাং মিশ্রী মউরী প্রভৃতি বায়ুনাশক উপকরণের সহিত দেওয়া উচিত । • কালাদানার মাত্রা ১০ আনা হইতে ১০ আনা পর্যন্ত । • ইহা বণিকের দোকানে স্থলভমূল্যে বিক্রীত হয় । হাকিমেরা এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন । যদিও আয়ুর্বেদ ইহার উল্লেখ নাই, তথাপি ইহার গুণ দেখিয়া কবিরাজের ইহা ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহার সকলি^৪ বিরোচক চূর্ণ বা বটীতে এবং সালসার উপকরণ মধ্যে ইহা দিয়া থাকেন ।

কাশ, কুশ ।

বাঙ্গালার প্রথমটিকে কেশে বলে, ইহা এক প্রকার ঘাস জাতীয় লম্বা গাছ, ইহাতে পাড়া গাঁয়ে ঘর ছাওয়া হইয়া থাকে । কুশ অনেকেই দেখিয়াছেন, শ্রাঙ্গীদিতে কুশ পুঞ্জোপকরণ মধ্যে আবশ্যিক হয় । শুকাবস্থায় অবশ্য

সকলেরই ইহা দেখিয়াছেন—যেহেতু ইহা দ্বারা ই কুশাসন প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। কুশ ও কাশ প্রায় এক জাতীয়, কিন্তু কুশের পাতা অপেক্ষাকৃত একটু সরু। উভয়েরই পীতায় অভ্যস্ত ধার আছে।

কাসের সংস্কৃত নাম—কাশঃ কাশেক্ষুঃকৃদ্ভিষ্টে সশ্রাদ্ ইক্ষুরস স্তথা ইক্ষু-
লিকেক্ষুগন্ধাচ তথা পোটগলঃ স্মৃতঃ।—

কাশঃ শ্রান্ মধুর ত্তিক্তঃ স্বাদুপাকো হিমঃ সরঃ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্রাদাহাশ্র ক্ষয়পিত্তজ রোগজিৎ ॥

কাশ মধুর তিক্তরস, মধুরবিপাক, শীতবীৰ্য্য, সারক, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্তপ্রাব ক্ষয় ও পিত্তজরোগ নাশক।

কুশের সংস্কৃত নাম—কুশো দৰ্ভস্তথা বর্হি সৃচ্যোগ্রো যজ্ঞভূষণঃ ।

কুশস্ত শ্রাৎ ত্রিদোষঘ্নঃ মধুরঃ তুবরো হিমঃ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরী তৃষ্ণা বস্তিরুক্ প্রদারশ্র জিৎ ।

কুশ মধুর কষায়, হিম, ত্রিদোষঘ্ন, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিরুক্ (তল-
শেটব্যথা) প্রদর ও রক্তপিত্ত নাশক।

প্রয়োগ—উভয়েরই প্রধান শক্তি মূত্রনিঃসারণ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ।
প্রস্রাবের সহিত রক্ত বাহির হইতে থাকিলে কুশ ও কাশ প্রয়োগে বিশেষ
উপকার দৃষ্ট হয়। জ্বালোকের যদি এই দুর্বটনা হয়, তবে তাহাও ইহা দ্বারা
নিবারণ হইয়া থাকে। কুশ ও কাশের মধ্যে পিত্তনাশক শক্তি ও মূত্রকারক
শক্তি একত্র থাকার ইহাদের দ্বারা প্রস্রাবকালীন জ্বলা দূরীভূত হয়।

ইহাদের শক্তি মূত্রযন্ত্রের উপরে সমধিক, এই যন্ত্রের বিকৃত জঞ্জ রক্ত-
প্রস্রাব হইলে তাহা সঘর নিবারিত হয়, উর্দ্ধগ রক্ত পিত্তাদিতে ইহার কোনও
শক্তি দৃষ্ট হয় না। কুশ ও কাশ তৃণ পঞ্চমূলের দুইটা প্রধান উপকরণ। তৃণ
পঞ্চমূল যথা—কাশ, কুশ, শর, উলু, কক্ষ-ইক্ষুমূল। এই তৃণপঞ্চমূল নূতন
বিষাক্ত মেহে বা অন্ত্রবিধ মূত্রকৃচ্ছ্রে অভ্যস্ত উপকারী। ইহাতে প্রস্রাব
পরিষ্কার হয়। যন্ত্রণার সহিত অন্ন অন্ন প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকিলে ইহার
প্রয়োগ বিশেষ উপকারী। শাস্ত্রোক্ত কুশাবলেহ, কুশাদ্য ঘৃতে, তৃণপঞ্চমূলাদ্য-
স্বত ও কুশাদ্য তৈলে কুশ-কাশ আবশ্যক হয়।

২য় বর্ষ, ১ম ও ১২শ সংখ্যা। ১৯০০, এপ্রেল, মে। ১৩০৭, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ

মূল্য বার্ষিক সড়াক ১

ধর্ম

আয়ুর্বেদ.ও. ধর্মনীতি বিষয়ক
মাসিক পত্র।

২০২ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট-স্থিত

আয়ুর্বেদ বিদ্যামন্দির
হইতে প্রকাশিত।

গবর্ণমেন্ট উপাধি ও সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত,
কবিরাজ শ্রীরাধাচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ-কবিশূষণ
সম্পাদিত।

বিষয়— রোগের সৃষ্টি ও রোগ, দমরস্বী, চরকীয় নীতি, হুল ও কপ,
জ্বর ও বিস্ময়, রূপা-স্তোত্রম, হর্জন-নিন্দা।

পারিজাত

জগৎপিতা মানব সম্বন্ধকে বর্তমান
ভাল জিনিস দিয়েছেন, তাহার মধ্যে
ফুল, ফল, লতা পাতাদিই বোধ হয়
সকলোকে উৎকৃষ্ট, ভোগ্য ও আনন্দের
বস্তু—এবং জীবনধারণেরও উপায় স্বরূপ, অথচ বিষাদ কালের সাহায্যপ্রদ
স্থল।

নার্শরি

সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় নানাবিধ তরকারির বীজ
আমরা ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থান হইতে বহুপরিমাণে আমদানি
করিয়াছি। ফুল, ফল শাকসবজী, নরনরজন লতাপল্লবাদি বাহ্য চাহিবেন
তাহাই পাইবেন।

যিনি প্রকৃতির মনোহর দৃশ্যে নরনরন পরিভূষ্ট করিতে চাহেন, বাহার
গাছপালার সখ আছে, তিনি একবার অমুগ্রহ পূর্বক আশুন! উৎকৃষ্ট শত শত
প্রকারের আশ্র, নিচু, গোলাপজাম প্রভৃতি নানাবিধ সুন্দর ফল ও তরিতর-
কারীর বীজ ও কলম লইয়া নিজ নিজ উদ্যানে রোপণ করুন।

আমাদের বীজে বড় বড় ফল জন্মে, প্রায় ৫ মন ওজনের ১টা বিলাতী
কুমড়া হয়। যদিও আপনার রোপণ যোগ্য স্থান থাকে একবার পরীক্ষা
করিয়া দেখিবেন কি ?

কোনও ক্রিয়া কলাপ উপলক্ষ করিয়া অনেকেই গৃহাদি সাজাইয়া
থাকেন, আমরা দে কাঠোও সুন্দর। অমুমতি করুন, আপনার সুন্দর অট্টা-
লিকা লতা পাতা পুষ্পাদি দ্বারা সুরমা "নন্দন-কানন" তুল্য করিয়া দিব।
ব্যয় অল্পান্ত নার্শরি অপেক্ষা বিশেষ মূল্য।

একমাত্র সত্বাধিকারী—শ্রীমুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাণিকতলা, কলিকাতা।

ঋষি।

২য় বর্ষ, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা। } { ১৩০৭, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।

পাপের সৃষ্টি ও রোগ।

“আদিকালে হৃদিতিস্তমোজসোহতিবিমলবিপুলপ্রভাবাঃ প্রত্যক্ষ দেব-
দেবর্ষি ধর্মযজ্ঞবিধিবিধানাঃ শৈলেন্দ্রসারসংহতস্থিরশরীরাঃ প্রসন্নবদর্শেস্ত্রিষাঃ
পবন সমবল্লব পরাক্রমা শ্চাক্ষুণ্ণি চোহ তিরুপপ্রমাণাকৃতি প্রসাদো-
পচয়বন্তিঃ সত্যার্জবান্শংস্রদানদম নিয়ম তপ উপবাস ব্রহ্মচর্যব্রত পর ব্যপ-
গত ভয়রাগ ঘেয়মোহ লোভক্রোধশোকমান রোগ নিদ্রাতন্ত্রা শ্রম ক্রমাগত
পরিগ্রহাশ্চ পুরুষা বভূবু রমিতায়ুষঃ।”

যখন এই পৃথিবী সৃষ্টির হস্ত হইতে অচির-নিঃসৃত ও অন্নসংখ্যকমাত্র
জীবসমূহের বাসভূমি ছিল—যখন ইহার বয়ঃক্রম সম্পূর্ণই নবীন ও পরিমেষ
ছিল, তৎসময়ের মনুষ্যাগণের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা পর্যালোচনা করিলে
আমাদ্রিগকে আর মানব-নাম-যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। যেমন হস্তীর
নিকটে ছুচুন্দর, মনুষ্যের ঠান্ডাশিথ্যে মশক, অশ্বখের সমীপে হর্ষা-শুক্র এবং
জ্যোতিষ্মতা দেবতার সন্নিধানে পিশাচ-পুতুলী, সেই আদিকালীন মনুষ্যবর্গের
তুলনার আমরাও যে অতীব হেয় ও জবস্ত, তাহিবয়ে অণুমান সন্দেহ
নাই।

পুরাকালে অক্ষরের ত্রয় তেজঃশালী বিমল-বিপুল-প্রভাব-সম্পন্ন, প্রত্যক্ষ-
দেব দেবর্ষিতুল্য, ধর্মকর্ম ও যজ্ঞবিধির অহুষ্ঠায়ক, পর্বতের ত্রয় সংহত
সারবান্ ও স্রষ্টৃ-কার-বিশিষ্ট, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও চক্ষুঃ কর্ণাদির মাধুর্য্য এবং
প্রসন্নভাস, প্রভঞ্জনতুল্য-বল বেগ-পরাক্রমী, মনোজ্ঞ নিতম্ব-যথোপস্থিত-প্রমাণ-
কৃতি সৌর্ভূব, ও ঔন্নত্য-সমম্বিত, সত্য সরলতা অনৈর্হৃদ্য, দান দম নিয়ম
তপস্তা উপবাস ও ব্রহ্মচর্যব্রত পরায়ণ, ভয় রাগ ঘেয় মোহ লোভ ক্রোধ

শোক আত্মাভিমান, রোগ, নিদ্রাগীতা, তন্দ্রা, শ্রম-ক্লান্তি, আলস্য ও পরতন্ত্র্য-স্পৃহা বিবর্জিত পুরুষগণ ছিলেন, এবং তাঁহাদের আয়ুঃও অপরিমিত ছিল ।

“তেষা যুদার ঋতু গুণ-কর্মণা মচিস্ত্যরসবীর্ষ্যবিপাক প্রভাব গুণ সমুদ্ভিতানি প্রাহুর্ভূত্বঃ শতানি, নর্কগুণ সমুদ্ভিতত্বাৎ পৃথিব্যাদীনাং কৃতযুগস্তাদৌ ।
ব্রহ্মতি চ কৃতযুগে কেবাঞ্চি দত্যাদানাং সাঙ্গানিকানাং শরীর গোরব-মাসীৎ ।
সত্বানাং গোরবাৎ শ্রমঃ শ্রমাদালস্তম্ আলস্তাৎ সঞ্চলঃ । সঞ্চরাৎ পরিগ্রহঃ
পরিগ্রহান্নোভঃ প্রাহুর্ভূতঃ ।”

সত্যযুগের আদিতে পৃথিবী নর্কগুণসম্পন্ন ছিল বলিয়া, সেই উদারচেতা সদগুণাধার অনিন্দ্যকর্মী পুরুষগণের সমক্ষে চতুর্দিকে অপূর্ণ, মাধুর্য্যবীর্ষ্যময় অচিস্ত্য-বিপাক-প্রভাব-গুণশালী অল্পশ শত্রু যুদার উৎপন্ন হইত ।

তৎপরে সত্যযুগের ক্রমিক অপগমে যখন ঐ সমস্ত পৃথিবীগুণ ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন কোনও কোনও ব্যক্তি আতিরিক্ত গ্রহণ করার ও তজ্জন্ম সমুদ্ভি-সম্পন্ন অবস্থার উপনীত হওয়ার, ক্রমে তাহাদের দেহের গুরুত্ব আসিয়া পড়িল, তখন শরীরের গুরুতা-হেতু শ্রান্তি বোধ, শ্রান্তি হইতে আলস্য (শ্রমবৈমুখ্য) আলস্য হইতে ভবিষ্যতের জন্ম সঞ্চয়েচ্ছা ও সঞ্চয় হইতে পরিগ্রহ (যথাপ্রাপ্ত যথাদৃষ্ট বস্তুর গ্রহণোদ্যম) এবং পরিগ্রহ হইতে তাহাদিগের মনে লোভের আবির্ভাব হইতে লাগিল । তদনন্তর সত্যযুগ অপসৃত হইলে, ত্রেতার সমাগমে লোভ হইতে প্রতিবেশীর দ্রব্যজাত বলাৎকার দ্বারা গ্রহণের প্রবৃত্তি উদ্বেষিত ও পরস্প-সম্বন্ধে “এ দ্রব্য আমার” ইত্যাদিরূপ মিথ্যা ভাষণ আরম্ভ হইল । মিথ্যাকথন অভ্যস্ত হওয়ার কাম জাগিয়া উঠিল, কামের ব্যাঘাতে ক্রোধ ও আত্মাভিমান, তৎপরে দ্বেষ, দ্বেষের উদ্রেকে হৃদয়ের কোমলতা দূরে গিয়া তৎস্থানে নৈষ্ঠুর্য্য ও পারুষ্যের অধিষ্ঠান সূত্ররূপে বিরোধিপক্ষের গ্রহারাদি নির্ঘাতনের ইচ্ছা উপনীত হইল । গ্রহারাদির বিভীষিকার সহিত ভয়, পরিভাণ, শোক, চিত্তেষ্টিগ্নেগ প্রভৃতি আসিয়া জুটিল ।

“তন্ম জ্ঞেতার্য্যং ধর্ম্মণ্যোস্তর্ধান মগমৎ । তন্ত্রাস্তর্ধানাং পৃথিব্যাদীনাং
গুণপাদ-প্রাণো হত্বৎ । তৎপ্রণাশকৃতশ্চ শতানাং স্নেহবৈমল্যা রসবীর্ষ্য
বিপাক প্রভাব গুণপাদ ব্রংশঃ ।”

এইরূপে, সত্যযুগ-সুলভ সেই পূর্ণাঙ্গ চতুস্পাদধর্ম্মের এক পাদ অর্থাৎ

চতুর্থাংশ ত্রেতাযুগে অস্তিত্ব হইল। ধর্মের একপাদ বিলুপ্ত হইলে পর পৃথিবী-জল-বায়ু প্রভৃতির স্ব স্ব গুণের একপাদ বিনষ্ট হইল। পৃথিব্যাতির স্বাভাবিকী শক্তির একপাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার শতনমূহের স্নেহ (পোষক শক্তি) নির্মলতা, মধুরতা, বীর্ষ্যবত্তা, বিপাক, ঐশ্বর্য ও রোগনাশকত্বাদি গুণের একপাদ তিরোভূত হইল।

“তত স্তানি প্রজাশরীরানি স্তীর্ণগুণপাদৈর্ হৌরমান গুণৈশ্চাহারবিহারৈঃ
যথাপূর্বম্ উপষ্টভ্যমানানি অগ্নিমাকৃত পরীতানি প্রাগ্ ব্যাধিভি জরাদিভি
রাক্রান্তানি, অতঃ প্রাণিনো হ্রাস মবাপুরায়ুষঃ ক্রমশ ইতি।”

তদনন্তর সেই গুণপাদহীন ও ক্ষয়মান শক্তি আহারবিহারের দ্বারা যথা-
ক্রমে পোষিত হওয়ার মীনব গুণের শরীর অগ্নিবায়ু-বহুল হইয়া প্রায়শ্চৈ
জরাদি রোগ ঐষ্ট হইল। অর্থাৎ ইতঃপূর্বে তাহাদের যে দেহ কাম ক্রোধাদির
দ্বারা কিঞ্চৎ পরিমাণে উত্তেজিত ও তাপাবিত ছিল, সেই দেহে স্নেহ-বীর্ষ্য-
মাধুর্য্যহীন শত্বাদি দৃষ্টিত অপকৃষ্ট অন্ন প্রবেশ পূর্বক দৈহিক অগ্নি-বায়ু-ধর্মকে
(বাত-পিত্তকে) বর্ধিত করিল—

অতএব মানবদেহ সর্বপ্রথম উত্তাপাত্মক জরাদি রোগে আক্রান্ত হইল।
সেই কারণে-দেহে জর হইতে শাখা-প্রশাখাক্রমে অস্ত্রান্ত রোগের আবির্ভাব,
তদন্তে পুরুষগণের আয়ু ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

এইরূপে মতায়ুগের ধর্মরাজত্ব, নীরোগতা ও দীর্ঘজীবিত্ব ক্রমে প্রত্যেক
পরবর্তীযুগে হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ার বর্তমান কলিযুগে আমরা মানবগণের এই
লোমহর্ষণ পাপ-প্রবৃত্তি, রোগ বাহ্য ও অন্নায়ুত্ব দেখিতে পাইতেছি।

দময়ন্তী ।

ভারতের প্রাচীনতম সতীদিগের মধ্যে দময়ন্তীর স্থান অতি উচ্চ।
আজ তাঁহার পবিত্র চরিত্রের কিঞ্চিৎ আলোচনী করিব। পুরাতন বিষয়
বলিয়া, ভয়সা করি পাঠিক্যাগণ বিরক্ত হইবেন না।

প্রসিদ্ধ হিন্দুশাস্ত্রকার ভগবান মহু ঋষী নারীর লক্ষণ এইরূপ নির্দিষ্ট
করিয়াছেন,—

“পতিং বা ন্যুভি চরতি মনোবাক্ দেহুঃসংবতা ।

সা তর্ভূলাকানাপ্রোতি সফিঃ সাধ্বীতিচোচ্যতে ॥

যে রমণী কার মন বাকো ও ব্যভিচারিণী না হয়েন্ তিনি পতি-লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং সাধুগর্ভ তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ।

পতিব্রতার লক্ষণ ।

আর্তীভর্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিত্তে মলিনী কৃশা ।

মৃতে ব্রিয়েত বা নারী সাচ জ্জয়া পতিব্রতা ॥”

যে নারী স্বামী হুঃখিত হইলে হুঃখিতা, সুখে হুঃখিতা। পতি দেশান্তর গমন করিলে মলিনা ও কৃশা হন এবং পতির মৃত্যু হইলে তাঁহার অনুগমন করেন তাঁহাকে পতিব্রতা কহে ।

সাধ্বী নারী দেশের গৌরব, সমাজের ভূষণ, ঐশ্যে নর নারীর উপাস্ত দেবতা। দেবতার পূজা যেমন কখনও পুরাতন হয়না তজ্জপ সতী চরিত্রা-লোচনাও কখনও পুরাতন হয়না। সেই বিশ্বাস ও ভরসা সেই অতি প্রাচীন পবিত্র দময়ন্তীর আখ্যান পাঠিকা ভগিনীদিগের নিকট উপস্থিত করিলাম।

দময়ন্তী অতি প্রবল পরাক্রান্ত সমৃদ্ধ বিদর্ভপতি মহারাজ ভীমের এক মাত্র ছুহিতা। সাধারণতঃ রাজকন্যা মাত্রেই যেরূপ আদরের সোহাগের হয়, দময়ন্তী তদপেক্ষা অধিক স্নেহ বস্ত্রের ধন ছিলেন। রাজা ভীম বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াও নিঃসন্তান ছিলেন, পরে দমন নামে এক প্রথম তেজস্বী ব্রহ্মর্ষীর আরাধনা করিয়া দময়ন্তী নাম্নি কঙ্কারত্ন ও দম, দাস্ত, দমন নামে তিনটি পুত্র লাভ করেন। দময়ন্তী যেরূপ সাধের ও আদরের মেয়ে ছিলেন, রূপে গুণেও সেইরূপ অতুলনীর ছিলেন। “রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী” বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহা দময়ন্তীর প্রতিই সুপ্রযুক্ত হইবার যোগ্য। ফলতঃ তাঁহার রূপ গুণ ও সৌভাগ্যের খ্যাতি তৎকালে সমগ্র ধরণী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময় নিষধ দেশে বীরসেন রাজতনয় মহারাজ নল রাজ্য করিতেছিলেন। তিনি রূপে গুণে ও শূরত্বে তৎকালিক নৃপতিদিগের মধ্যে অধিকারী ছিলেন। অধিক কি দেবতাদিগের মধ্যে শচীনাথ ইন্দ্র যেরূপ, মর্ত্তে রাজাদিগের মধ্যে নল সেইরূপ শ্রেষ্ঠ ছিলেন; রাজা নলও রাজকন্যা দময়ন্তী উভয়ে উভয়ের যোগ্য ছিলেন।

কালে তাঁহাদের উভয়ের রূপ গুণাদির বিবরণ উভয়ে অবগত হইয়া উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন ।

একদা মহারাজ নল তাঁহার অন্তঃপুরস্থ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন এমন সময় এক সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত অসাধারণ রূপ দেখিয়া নল তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন । হংস প্রাকৃত্যে নৃপতিকে বলিল, “মহারাজ আমাকে মারিবেন না, আমি দময়ন্তীর নিকট আপনার বিষয় একরূপ ভাবে বলিব যে, তিনি আপনাকে ভিন্ন পৃথিবীতে আর কাহাকেও পতিত্ব বরণ করিবেননা ।” একরূপ কথার কাঁহার না মন গলিয়া যায় ? মহারাজ হংসকে ছাড়িয়া দিলেন । হংস কৃতম্ব নহে, সে সদল বলে দময়ন্তীর নিকটে গিয়া যে উপবনে তিনি সখীগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন সেই খানে গিয়া পড়িল । কক্ৰাগণ হিরণ্ময় পক্ষযুক্ত চিত্তোন্মাদক হংস সকল দেখিয়া ধরিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন, এক একজন এক একটী হংসের পশ্চাদ্ধাবিতা হইলেন । দময়ন্তী যে হংসের পশ্চাদ্ধাবিতা হইয়াছিলেন ; সে তাঁহাকে নিৰ্জনে পাইয়া বলিল “নিষধ দেশে নল নামে এক অতি অপকৃপ রূপগুণ সম্পন্ন রাজপুত্র আছেন, অধিক কি তাঁহাকে মূর্তিমান কন্দর্প বলিলেও অত্যাক্তি হয় না । তুমি নিজে যেমন রূপ গুণবতী রমণীরত্ন রাজা নলও সেইরূপ রাজকুলরত্ন । তোমাদের উভয়ের সংযোগই আমাদের প্রার্থনীয় ।” দময়ন্তী হংসের এই কথা শুনিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং মহারাজ নলের প্রতি তাঁহার অমুরাগ দৃষ্টিগতর উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল ।

এদিকে কক্ৰাকে বরস্থা দেখিয়া রাজা ভীম দময়ন্তীর সম্বন্ধে সজ্ঞা আহ্বান করিলেন । নানা বিদেশীয় নরপতি বর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া বিদর্ভে আগমন করিলেন । নিষধাধিপতি নলও আগমন করিলেন ।

দময়ন্তীর রূপে গুণে মোহিত হইয়া, ইন্দ্র, অগ্নি, বসু ও বরুণ চারি দিকপালও তাঁহার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া বিদর্ভে আগমন করিলেন । স্বর্গের দেবতাগণ পর্য্যন্ত তাঁহার রূপে মুগ্ধ, গুণে আকৃষ্ট তিনি কিরূপ অলোক সামান্য রূপ গুণবতী ছিলেন তাহা সহজেই অমুরের ।

আবার অলৌকিকত্ব । এইবার নলের পরীক্ষা । মানুষ বাহুবলশালী

হইলেও তাঁহাকে বীর বলেদা, সে পশুবল মাত্র। ইন্দ্রিয় ও কামনা জয়ই বলের বাস্তবিক নিদর্শন, তাহাই প্রকৃত বীরত্ব। এনলের সেই পরীক্ষা হইল। ইন্দ্রাদি দিকপালগণ দময়ন্তীর চিত্ত পরীক্ষার্থ তৎসময়ে দূত প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু যার কে ? অধিতীর রূপবান নলকেই তাঁহারা দৌত্যপদে বরণ করিলেন। নল ভাবিলেন “ইহা মন্দ কথা নহে, নিজের বিবাহ করিতে আসিয়া অন্তের জন্ত ঘটকালি করিতে হইল, কিনি বলিলেন,—

যে কার্যো, অমরগণ ! কৈলে আগমন।
সেই কার্যো চলি আমি লোক পালগণ !
দূতরূপে প্রেরণ করিতে এই হেনে ।
উচিত না হয় দেব ভাবি দেখ মনে ।
ত্রিভুবনে এ হেন পুরুষ কোন্জন ।
কামিনীর প্রতি কার, সঙ্কল্পিত মন ॥
অন্য তরে হেন বাক্য বলিবারে পারে ?
প্রভুগণ ! ইথে ক্ষমা করহ আমারে ।

(মহাভারত, বনপর্ব, ৬ রাজকুরুবায়ের অনুবাদ)

কিন্তু দেবতার ছাড়িবার পাত্র নহেন। তাঁহারা বলিলেন “তোমা ব্যতীত একাধি সমাধা করিতে পারে এমন কেহই নাই তোমাকেই বাইতে হইবে।” নল অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। দেবতাদের রূপায় মানুষের অমানুষিক শক্তি লাভ হয় নলও দৈবানুগ্রহে লোক চক্ষুর অগোচরে রাজাস্তঃপুরে দময়ন্তীকে সকাশে উপস্থিত হইলেন। দময়ন্তী পূর্বে নলের রূপ গুণের কাহিনী অবগত ছিলেন মাত্র কখনও দেখেন নাই। এখন সম্মুখে সেই শ্রুত পূর্ক অমানুষ রূপ গুণ বীৰ্য সম্পন্ন নল, দময়ন্তী সেই দেবোপম মূর্তি দর্শনে কেমন এক প্রকার হইয়া পড়িলেন। নল আশ্চর্য পরিচয় প্রদান পূর্ক যখন তাঁহার আগমনের কারণ বিবৃত করিলেন দময়ন্তী বিস্মৃত হইয়া বলিলেন “সেকি ! আমি যে পূর্কই আপনাকে আশ্রয় সমর্পণ করিয়াছি। এখন আমাকে একি কথা বলেন ? আমি আপনাকেই জানি দেবতাগণ আমার মাথায় থাকুয়।” তখন দৈবধরাজ বলিলেন,—

নল চূড়ান্ত ঘটকালি কুরিলেন। কিন্তু দময়ন্তীর হৃদয় টলিল না। এই খান হইতেই আমরা দময়ন্তীর পবিত্র চরিত্রের বিকাশ দেখিতে পাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নগেন্দ্রকলা মুস্তোফী ।

চরকীয় নীতি ।

আত্মহিতং চিকীৰ্ষতা সৰ্বেণ সৰ্বং সৰ্বদা স্মৃতিমাশ্বায় সঙ্কৃত
মনুতিষ্ঠেৎ—যিনি আত্মহিত প্রার্থনা করেন, এরূপ ব্যক্তিমাাত্রই যেন নিজ
স্বৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অর্থাৎ আত্মবিস্মৃত না হইয়া সৰ্বদা সংকার্য্য অমুষ্ঠান
করেন। বস্তুতঃ, আমি কেখা হইতে আসিলাম? কোথায় যাইব? কে কার?
কাহার জন্য কি করিতেছি? কতদিন আমি এ পৃথিবীতে থাকিব? আমার
সদস্য কার্য্যের পরিণাম কি? ইত্যাদি-রূপ বিভূর্ক যাহার স্বৃতিতে প্রত্যেক
কার্য্যকালে বথার্থরূপে উদ্ভিত হয় তিনি অহর্নিশ কুক্রিয়ার পরিহার ও
সদাচারের অমুষ্ঠান অবশ্যই করিতে পারেন।

তদ্ব্যনুষ্ঠানং যুগপৎ সম্পাদয়ত্যর্থ-দয়ম্ আরোগ্যম্ ইন্দ্রিয়-
বিজয়ঞ্চ। পুরোক্তপ্রকার কার্য্য-নিয়ম কোনও মহামুভাবের থাকিলে,
যুগপৎ তাঁহার দুটা অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়—আরোগ্য ও ইন্দ্রিয়-বিজয়।

অতিথীনাং পূজকঃ বিনয়বুদ্ধি বিজ্ঞাভিজ্ঞান বয়োবৃদ্ধ সিদ্ধা-
চার্যাণা মুপাসিতা স্ম্যৎ। অভ্যাগত জনের সংকার করিতে সৰ্বদা
প্রস্তুত থাকিবে, এবং যিনি বিনয়, বুদ্ধি, বিদ্যা বা পরগৌরবে তোমা অপেক্ষা
উচ্চতর এরূপ ব্যক্তিগণ এবং সিদ্ধ আচার্য্যদিগের নিকট গভীরত করিবে ও
তাঁহাদের প্রশংসনভাষাতে বহুবান থাকিবে।

কালে হিতমিত মধুরার্থ বাদী—যখন কোনও স্থানে পাঁচজনের মধ্যে
কথাবার্তা হইতেছে তখন অকস্মাৎ অযোগ্য ব্রাচালতা না করিয়া ঠিক
উপযুক্ত অবসরে হিতোদ্দেশমূলক মধুরভাষাষিত, অল্প শুটীকৃত সার্থক
কথা বলিবে।

স্কুল ও কুশ।

স্বামী। কবিরাজ মহাশয় আপনি বড় মোটা! মোটা মানুষ গুলো বড় বিক্রী! উদরটা যেন রক্তকের বৃক্ষ-পোটুলী! আর প্রতিবাসী মাংস-পিণ্ডের শ্রীবৃদ্ধিতে চক্ষু ছুটা যেন লজ্জায় লুকায়িত। গ্রীবাঞ্চল নাই বললেই হয়,—যেন সেটা কিংস্বত্রে কেমন করে কীচকহস্তা ভামের হস্তস্পর্শ পেয়েছিল!

কবিরাজ। মর্কটপ্রবর! বল্ছিস্ কি? বিধাতা তোর সৃষ্টির সময়ে তোর হাড়ের কাঠামটা শেষ করে মাংসের খরটা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন!—না?

তোমার কোটরে-টোকা চক্ষু, সারিন্দে বিনিমিত পেট, আর তালপাতার সেপাইএর বাড়ী হাত পা গুলি তোমাকে একেবারে কন্দর্প করে তুলেছে। বা হ'ক! তুমি বাপু, মেডিকেল কলেজের দিকে যেন কখনই বেড়াতে যেও না, নইলে পাছে সাহেবরা তোমাকে পলায়মান স্কলিটন (কঙ্কাল) মনে করে টানাটানি করবে।

স। কবিরাজ মহাশয়! আমি ঠিক প্রাণের কথা বল্ছি আমার কিন্তু মনে মনে বড় সাধ হয় যে আমি আপনার মত মোটা হই,—অন্ততঃ এ অপেক্ষা একটু মোটাও হই। আমি যে সর্বদাই শাট-কোট গায়ে দিয়া থাকি, সে শুধু ভদ্রতা বা বাবুগিরির জ্ঞান নয়। আমার আল্গা শরীরটা লোকের সম্মুখে বাহির করিতে লজ্জা বোধ হয়। আপনার অর্ধেক শরীর আমার হলেও আমি কত সুখী হতাম!

ক। আরে! পাগল! আবার অত নাড়াবাড়ির কথা কেন? এইনা উল্টো উল্টো বলছিলে? বাহা হউক এই কথাটা ঠিক কেনো—এ জগতে যার যেটা নাই সেইটাই তার পক্ষে স্পৃহনীয় হয়। বোধ হয় রেলের বাবুরা মনে করেন, পোষ্ঠাকিসের কর্মচারীদের বড় আরামের কাজ। ডাকের চাকুরে মনে ভাবেন রেল-অফিসার বড় সুখী। ছেলে মনে করে বুড়োদের কত সুখ-স্বাধীনতা। বুড়ো ভাবেন ছেলে হ'তে পারে তবে কিছু সুখ হইত। আজ কালকার লোকে পরিবার মধ্যে একটা মেয়ে হলে কত ভয় পায় কিন্তু

এ বড় রহস্য—যে বাড়ীতে শুধুই হেঁলে হরু সে বাটীতে, কল্পার স্তম্ভ বড়ই লালসা দেখা যায়—মা ছোট ছেলেটার বড় চুল রাখেন, দিব্য নেলিক-টিপ চুড়ী পরাইয়া কল্পার সার্থ কথকিং তৃপ্ত করেন। মা'ক বাহিরের কথা। আমিও তোমার মত মনে মনে বড় হুঃখিত, কিরূপে দেহভার কমিবে সর্বদাই ভাবি।

স। আপনিও ক্রশ হইতে চান ?

ক। চাই বইকি ? কিন্তু তোমার মত ক্রশ হইতে চাই না। সব বিষয়েরই ভাল মন্দ আছে, মোটারও দোষগুণ আছে, ক্রশ হওয়ারও দোষগুণ রহিয়াছে। দেখ, মোটা লোকে শীতকালে অনায়াসে আলুগা গায়ে পরিধানার ব্যয়, বেশ হিন্দুয়াণী রক্ষা হয়, আর ক্রশবাক্তি গায়ে সাতপর্দা কাপড় না জড়াইলে ঘর থেকে এক পা বাহির হইতে পারে না। তা সত্য, কিন্তু গ্রীষ্মকালে যে তার শোখ ! কাহিলেরা বেশ থাকে; স্থলকায় ব্যক্তির গরমের সময় হাঁসফাঁস করিয়া মরে।

ক। কি বিপদ ! তাই ত বল্ছিলাম, হুএরই দোষগুণ আছে, আমার বলতে দাও !

স। আচ্ছা চুপ করে শুনিছি।

ক। মোটা লোকের আকার সম্বন্ধে তুমি যে কুৎসা গাইলে, বাস্তবিক ভেবে দেখ, তা নয়, স্থলকায় ব্যক্তির আকৃতিতে কেমন সুন্দর এক গুরুগাভীরা থাকে, দেখলেই একটা বড় লোক বোধ হয়, তার কাছে সহস্র কেহ চপলতা, অমান্ত্যভাব দেখাইতে পারে না। অকস্মাৎ দর্শকের প্রজ্ঞা আকর্ষণ করে। তাই শাস্ত্রে বলে,—

বস্ত্ৰেণ বপুষা বাচা বিদ্যয়া বিভবেন চ।

এতিঃ পঞ্চবকারৈশ্চ নরঃ প্রাপ্নোতি মান্ত্যতাম্ ॥

অর্থাৎ ভাল বেশভূষা, সুগঠিত স্থলবপুঃ, বাক্পটুতা, বিদ্যাবত্তা, আর বৈভব এই পঞ্চবকার দ্বারা মনুষ্য মাননীয় হয়।

স। ঠিক ঠিক ! সেই ক্ষেত্রেই আমাদের পাড়ায় ক্রমহরি বাবু (ক্রশকায় নেটিব ডাক্তার) বলেন যে “আমার শরীরটা একটু মোটা হলে আমার নামে হাজার টাকা আর হইত !

ক। সত্যই দেহাকৃতির একটা মূল্য আছে। কথক, উকীল, মোক্তার

স্থূলমাষ্ট্রার, ডাক্তার, কবিরাজ প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের একটু দর্শনধারী চেহারা থাকিলে বাস্তবিকই হয় ভাল ।

এই সমস্ত ব্যবসায়ীদিগের অন্ততঃ অপরিচিত বা নূতন পরিচিত মস্তকের নিকটে বেশ খাতির-বৃত্ত হয়।—অনেক গ্রাহক সহসা তাহার নিকট উপনীত হইতে থাকে ।

স। একদিন কৃষ্ণহরী বাবু কসিয়াছিলেন, তার পার্শে তার সেই মোটা কম্পাউণ্ডারটা দাড়িয়ে ছিল, আমি দেখিলাম একটা রোগী এসে ডাক্তার ভেবে আগে কম্পাউণ্ডার মহাশয়কেই প্রণাম করিল ।

ক। দেখলুে ?

স। তা'ত দেখলুম, কিন্তু “মধুরেণ সমাপয়েৎ” রীতিটাই ত সব চেয়ে ভাল, একটা আগস্তক ব্যক্তি প্রথমে বহিঃস্থোণ্য দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া যদি শেষে অন্তস্তরে কৃশ দেখতে পায়, তাহ'লে তার সেই চাণক্যের “দূরতঃ শোভতে” নীতিটা কি মনে উঠে না ? তার চেয়ে প্রথমে হীনচেহারা দেখিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া পরে পরিচয়ে যদি ভিতরে পুষ্ট দেখিতে পায় তাহ'লে কেমন মজাটা হয় ।

আমাদের পাড়ার বিশ্বনাথ নামে একজন এল্ এম্ এন্স আছেন—তার বড়ই কৃশ শরীর । তার পঠদৃশ্যর পাড়ার লোকে সর্বদাই বলিত—বিশ্ববাবু তোমার কাছে চেহারা তোমার মোটেই পশার হবে না । তা শুনে বলতেন— কেন ? আমাকে কি রোগীর সঙ্গে “যুদ্ধং দেহি” বলতে হবে যে রোগা-শরীরে পোষাবে না ?

ক। যাক্ যাক্ ! চেহারার কথা ছেড়ে দাও । মোট কথা “বুদ্ধিবৃত্ত বলং তত্ত্ব ।” অতিমাত্র কৃশস্থলের অল্প দোষগুণও আছে ; চরক বলিতেছেন— “সততং ব্যাধিতাবেত্তী অতিস্থূলকৃশৌ নরৌ” (হত্রহীন) অর্থাৎ অতি স্থূল ও অতিরিক্ত কৃশ ব্যক্তিদিগকে প্রায়ই কোন না কোন রোগে ভুগিতে হয় ।

চরকমতে প্রধানতঃ স্থূলদেহীর দোষ এই গুলি—স্থূলব্যক্তি দেহের গুরুত্বকেই শ্রমসাধ্য কার্যে অগত্ হইয় ; তাহার অল্পাত্ত বীত্ব বুদ্ধি-প্রাপ্ত না হইয়া কেবল মেদোঘাত্তরই বৃদ্ধি হয় বলিয়া জীবনীশক্তির হ্রাস হয় । দেহের শিথিলতা ও স্কন্ধমারত্ব কেহু কার্য্যাদিতে সমধিক উদ্যোগ

হয় না, শুক্রধাতুর বৃদ্ধি অর্থাৎ শুক্রবহা নাড়ী মেদকর্ষক আবৃত হওয়ার
 তাহার পক্ষে ক্রীসঙ্গ অনার্যাস-সাধ্য হয় না। ধাতুসমূহের সমতা না থাকার
 দোষ হ্রস্ব ও মেদাধিক্যবশতঃ অতীব বর্ণাকুল হয় এবং শ্লেষদ্রুষ্টি হেতু
 দৌর্গন্ধ্যযুক্ত হইয়া থাকে।^৬ অপিচ, শ্লেষসংসর্গে তাহার কফ, কাস, শ্বশ্বত
 কোড়া, মূত্ররোগ, এবং শ্লেষ দ্বারা বায়ুবহা নাড়ী সহস্র অবক্ল হওয়ার
 তাহার সন্ন্যাস রোগ (আকস্মিক সূচীকিশেষ) হইবার সম্ভাবনা থাকে।—
 বিশেষতঃ যে স্থলব্যক্তিদিগের গ্রীবা অত্যন্ত ঋক্ষ তাহাদেরই এই সন্ন্যাস
 রোগের অধিক আশঙ্কা। কোন কোন স্থলদেহীর “তৌক্ষায়ি” নামক রোগ
 জন্মে—ইহারা আহার করিবামাত্র ভুক্তবস্ত্র, ভক্ষ্যসাং হওয়ার পুনরায় অসহ
 সুখার জ্বালায় নিপীড়িত হয় এবং অসহ শিথিলতা বেগে দৃষ্ট হইতে থাকে।

স্থলদেহীর গুণ—ইহারা গভীর প্রকৃতি ও স্থিরমুখি হয়, ইহারা
 কালব্যাপিনী চিন্তা ব্যতিরেকে কোনও কার্য করে না, স্তুরাং অসুতাপও
 ইহাদের ভাগ্যে কম ঘটে। স্বজনবিয়োগাদিতে ইহারা শোকক্ষেতে অতি-
 মাত্র উঘেলিত হয় না। প্রায়ই অল্প ভাষী ও দীর্ঘহৃদী হয়। “মনসা চিন্তিতং
 কৰ্ম বচসান প্রকাশয়েৎ” এই চানক্যনীতির সর্বদা অনুসরণ করিতে সক্ষম হয়।
 ইহাদের ক্রোধায়ি আধুনিক দে-সলাইয়ের কাটাতে নিহিত নয়, সেই সেকলে
 তুন্কি পাথরেই অধিষ্ঠিত। হু-চারিদিন উপধাঙ্গ করিলেও শরীরের অনুভব-
 বোগ্য ক্লান্ততা বা শীতগ্রীষ্মের পরিবর্তনে ইহাদের হঠাৎ “স্বাস্থ্যভঙ্গ” হয় না।
 সংক্ষেপে ইহাদের সর্বতোমুখী সহিষ্ণুতা ও ধীরতা প্রভৃতি গুণ প্রকৃতিগত।

চরকমতে অতি কৃশব্যক্তির দোষ এই গুলি—

ব্যায়াম মতি সৌহিত্যং ক্ষুৎপিপাসা মধৌষধং ।

ক্ৰশো ন সহতে তদ্য অতি শীতোষ্ণমৈথুনং ॥

প্লীহ কাসঃ ক্ষয়ঃ শ্বাসো গুল্মাশাং শ্বাদরাপি চ ।

কৃশং প্রায়ো ভিধাবন্তি রেগাশ্চ গ্রহণীমতাঃ ॥

অতিশয় কৃশ ব্যক্তি “ব্যায়াম বা অতিরিক্ত অঙ্গচালনা-সাপেক্ষ কৰ্ম,
 অত্যন্ত উদয় পুরিমা ভক্ষণ, ক্ষুৎপিপাসার বেগ, অধিক ঔষধ সেবন, অধিক
 শীত বা অধিক তাপ এবং নিরমিতাপেক্ষা অধিক ক্রীসংসর্গ সহ করিতে
 পারে না। এবং কৃশব্যক্তিদিগের প্রায়শঃ প্লীহা, কাস, ক্ষয়রোগ, শ্বাস, গুল্ম,

অর্শ, উদররোগ এবং গ্রহণীজাতীয় রোগ (ঐর্ষ্যাৎ পাকাশয়ের হ্রাসলতা-নিবন্ধন-ভেদ বা কৌষ্ঠকাঠিন্য সংযুক্ত রোগ) সমুদায় হইবার প্রবণতা দৃষ্ট হয়। কৃশব্যক্তির আরো এই সমস্ত দোষ—কৃশব্যক্তির প্রায়শঃ চঞ্চল প্রকৃতি, অধীর, মনের কথা গোপন রাখিতে অক্ষম, প্রায়শঃ অবিমূষ্যকারী, স্বল্পনিদ্রা হৃশ্চিন্দ্র্য-প্রবণ, অভিপ্রেত বিষয়ে সর্বদা পরিবর্তনশীল, আকস্মিক উদ্যম ও সত্বর অনুৎসর্গ, কাম-ক্রোধাদির আশু-পরবশ ও সহসা ভীত বা সাহসান্বিত এবং সর্বদাই পুতনত্ব প্রিয় হয়।

কৃশব্যক্তির গুণ—কৃশব্যক্তির প্রায়শঃ ক্ষিপ্রকর্মা, অনলস, শ্রমপটু, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, কবিশুণ্ণাধিত, বৃহৎ বৃহৎ কার্যসমুদায়ের প্রথম প্রবর্তক, পরদুঃখকাতর, কৃতাপরোধে অধিক অনুতপ্ত উন্নতিপথান্বেষী ও বাকুপটু হস্ত এবং হঠাৎ কুণ্ঠিত হইলেও তদ্রূপে ভুলিয়া যায়।

চরক পুনরায় বলিতেছেন—

স্থোলায়াকশৌ বরং কাশ্চঃ সমোপকরণে হিতৌ।

যত্য়াভৌ ব্যাধিঃ রাগচ্ছেৎ স্থূল মেবীতি পীড়য়েৎ ॥

স্থূল ভাল, কি কৃশ ভাল এই হইএর বিচারে বরং কৃশকেই ভাল বলিতে হইবে। যেহেতু উক্ত উভয় প্রকার ব্যক্তিই যদিও—তুল্য উপকরণযুক্ত ও তুল্য অবস্থাধীন হয় এবং একই রোগ যদি হই জনকেই এক সঙ্গে আক্রমণ করে তাহা হইলে, সে স্থলে স্থূলব্যক্তিই অতিরিক্ত উৎক্লিষ্ট হইয়া থাকে।

স। বেশ! আপনি ত বুঝাইয়া দিলেন—অতিরিক্ত হইই মন্দ; তবে ভাল কে ?

ক। তোমার প্রশ্নের উত্তর চরকের এই শ্লোকটিতে পাইবু—

সম মাংস প্রমাণস্ত সমসংহনুনো নরঃ।

দৃঢ়োস্ত্রিয়ত্বাদ ব্যাধীনাং ন বলেনাত্তরুতে ॥

বাহাদের শরীরে মাংসের পরিম্যুণ ক্রমও নয় বেশীও নয়, শরীরের অঙ্গে অঙ্গে মাংস পেশী সমুদায় আঁবশুকমত পুষ্ট ও কঠিন, বাহাদের ইন্দ্রিয় সমুদয়ে দৃঢ় ও কর্মঠ—তাহারাই ভাল যেহেতু রোগগ্রহ হইলেও সেই রোগকর্তৃক অধিক ক্ষতিভূত হয় না।

স। পৃথিবীতে শর্ত করা হু-চারিজনকে স্থূলকায় দেখিতে পাওয়া যায়,

তাহা ছাড়া আর সকলেই কুশলশরীর, তবে ইহারা সকলেই কি দুর্বল, না কুশলের একটা প্রমাণ আছে ?

ক। আছে বৈকি ?

শুষ্কশিখরঃ শ্রীবো ধমণী জাল সন্ততঃ ।

ত্বগশিশোষোতিকুশঃ স্থূল পর্বো নরোঃ মতঃ । (চরক)

বাহাদেয় নির্ভয় উদর ও গলদেশ অত্যন্ত শুষ্ক বর্ষমাংসহীন, চর্ম পাতলা, অস্থি সরু, হস্তপদাদি শিরাসমূহের দ্বারা ব্যাপ্ত তাহাদিগকে অতিকুশ বলিয়া জানিবে।

স। মনুষ্য কি কারণে কুশ হয় ?

ক। সেবা রক্ষাপানানাং লভবৎ প্রমিতাশনং ।

ক্রিষ্টান্দিয়াগঃ শোকশ্চ বেন্ননিদ্রাবিনিগ্রহঃ ॥

রক্ষশ্রোদবর্তনং স্নানানভ্যাসঃ প্রকৃতি জীরা ।

বিকারামুশয়ঃ ক্রোধঃ কুর্কৃত্যতি কুশং নরুন্ ॥

রক্ষ অন্নভোজন, রক্ষপানীয় (মদ্যাদি) পান, ঘন ঘন উপবাস, অত্যন্ত ভোজন, অতিরিক্ত পরিমাণে মলমূত্র শুক্রাদির নিঃসারণ, শোক বা হুশ্চিন্তা, হাঁচি মল মূত্র কাম প্রভৃতি স্বাভাবিক বেগকে নির্যাতন করা, বিনাটৈলে গাত্রমর্দন, ঘ্রানের অনভ্যাস, প্রকৃতি অর্থাৎ স্বাভাবিক বায়ু বা বায়ুপিত্ত প্রধান থাকু বশতঃ আশ্রয় ক্ষীণতা, অরাজনিত রসরক্তাদি সর্বধাতুর ক্ষয়, রোগ হইয়াছে মনে করিয়া সর্বদা পরিভাপ এবং সর্বদা ক্রোধ-জলিত হওয়া এই সমস্ত কারণে মনুষ্য সাতিশয় কুশ হয়।

স। কিসে শরীরের অতি স্থূলত্ব জন্মে ?

ক। তদতিহ্যোলামতি সংপূরণাদ্ গুরু মধুর শীত নিম্বোপযোগাদ্ অব্যায়াদ্ অব্যায়াদ্ দিবানন্দাদ্ হর্ষনিত্যাদ্ অচিন্তনাদ্ বীজ স্বভাবা চোপকায়ন্তে ।

স্বভাবতঃ বা অভ্যাস দ্বারা অধিক্ত ভোজন, মাংস গোলাও প্রভৃতি গুরুত্বা, অতিরিক্ত নিদ্রা, বধি মাষকলায় প্রভৃতি শীতল বস্ত, মাখন, ঘৃত, চর্ব্বীযুক্ত রক্ত মাংসাদি, অকচালনার অভাব, শক্তিসঙ্গে স্রোতস্পর্ক পরিত্যাগ, দিবানিত্রা, সর্বদা আমোদ প্রমোদে কালযাপন, চিন্তারাহিত্য অর্থাৎ বে বীজে-দেহস্থি তাহারই প্রকৃতি হেতু অতিশয় স্থূলতা জন্মিয়া থাকে।

• স। স্থূলতা নাশের উপায় কিছূ আছে কি ।

• ক। ধিখেট।

স। তবে সে সব উপায় দ্বারা আপনার স্থূলতার হ্রাস কেন করেন না ?

ক। কৃশ ব্যক্তিকে স্থূল করা অপেক্ষা স্থূল ব্যক্তিকে কৃশ করা কঠিন ?

যেহেতু কৃশ ব্যক্তির পোষণজন্য ভাল ভাল আহার বিহারের বন্দোবস্ত শাস্ত্র-
কার নির্দেশ করিয়াছেন। স্থূল ব্যক্তির পক্ষে কিরূপ?—না, তিনি যতই
পোষ্টাই আহারের মাত্রা কমাইবেন ততই তিনি সফলকাম হইবেন, উজ্জনা
দেখু নিয়মপালনটা স্থূল অপেক্ষা কৃশেরই কিছু সুবিধা জনক। আমি পূর্বে
আরও মোটা ছিলাম, সামান্য শুটুকত নিয়মের অমুসরণ দ্বারা তবুও পূর্বা-
পেক্ষা একটু ওজনে কমিয়াছি, নিয়মলিখিত নিয়মগুলি স্মৃষ্করূপে পালন করিলে
নিশ্চয়ই ফল পাইয়া যায় !—

অন্নত্যাগ বা অন্নর্জল পান, রাত্রে অন্নত্যাগ পূর্কক শুক্করুটি, চিড়া ভাজা
বা মুড়ী, আহারান্তে শীতল জলের পরিবর্তে উষ্ণজল পান, ব্যঞ্জন অন্যান্য
ঝালের পরিবর্তে অধিক গোলমরিচ ও শুঠচূর্ণ ব্যবহার, ময়ূর বনমুগ অড়হর
বা কুলথ কলায়ের ডাল, নালুতে চাল-কুমড়ার ছেঁচকি, ভোজনের পর
কোনও শাস্ত্রোক্ত তীক্ষু অরিষ্ট পান, অন্ননিদ্রা, জীসঙ্গম, অতিরিক্ত চিন্তা বা
গণনার কাণ্ড, পুরাতন মধুর সহিত জল মিশ্রিত করিয়া খাওয়া, হৃৎ মাংস
স্বত ত্যাগ করিয়া কেবল খাঁটী সর্ষপ তৈল সংস্কৃত ব্যঞ্জনাদি আহার, সম্পূর্ণ
মাখন রহিত তুক্র, যবের ছাঁত, লৌহভস্ম, বেলছাল শোণাছাল গাস্তারী ছাল
পাকুলছাল, এবং গণিয়ারী ছাল এই পাঁচটি একত্রে ১০ ছটাক লইয়া ১১ সের
জলে সিদ্ধ করিয়া ১০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে
ও সন্ধ্যায় পান, কঠিন শব্যায় শয়ন, ও নিয়মমত প্রতিদিন ২ ঘণ্টা কাল
ক্রান্তিজনক ব্যায়াম করা ইত্যাদি।

স। আর, কিসে কৃশতা নিবারণ হইয়া একটু মানুষের মত চেহারা হয় ?
আমার যেটা আবশ্যক তাহা এখনও শুনিতে পাই নাই। শীত্র বলুন!
শীত্র বলুন।

ক। যপ্নো হর্ষঃ সূখা শব্যায় মনসৌ নিবৃত্তঃ শমঃ ।
চিন্তা ব্যায়াম ব্যায়াম বিবাসঃ প্রিয়দর্শনঃ ।

নবান্নানি নকৈ মদ্যাং গ্রাম্যানুপৌদকা রসা !
 সংক্ৰান্তানি চ মাংসানি দধি সর্পিঃ পয়াংসিচ ॥
 ইক্ষ্বীঃ শালয়ো মাষা গোধূমা শুড় বৈকৃতম্ ।
 বস্তুরঃ স্নিগ্ধমধুরা তৈলাভ্যঙ্গশ্চ সর্বদা ॥
 স্নিগ্ধ মুহুর্ভনং স্নানং গন্ধ মাল্যানিষেবনং ।
 শুক্লোবাসঃ বথাকীলং দোহানামবসেটনং ॥
 রসায়নানাং ব্রহ্মাণাং যোগানাং সুপীসেবনং ।
 হত্ৱাতিকাশ্র মাধুর্ভে নৃণা সুশচয়ং পরং ॥

অর্থাৎ সুনিদ্রা, সর্বদা আমোদ প্রমোদ, সুপ্রথদ শয্যা, জীখর বা করেন তাই ভাল" এইরূপ আন্তরিক বিশ্বাস, শমস্তল অর্থাৎ হিংসা ক্রোধাদি ভ্যাগ-পূর্বক চিন্তের প্রশান্তিজন্য, চিন্তারাহিত্য, ক্রুর অপচয় না করা, পরিশ্রম-রাহিত্য, প্রিয়বস্তুর দর্শন, নবান্ন ভোজন, নুতন মদ্য, কচ্ছপ শূকর মুহিহাদির মাংস ভক্ষণ বা বিশিষ্ট প্রক্রিয়া সাধিত অল্প মাংস, দধি, ঘৃত দুগ্ধাহার, ইক্ষু-প্রভৃতি, শালিধান্য মাষকলায় গোধূম শুড়োংপর মিষ্টান্ন, স্নিগ্ধ মধুর বস্তিগ্রহণ, উত্তম তৈল মাষা, ও স্নিগ্ধ বস্তুর সহিত গা-হাত-পা টিপিয়া লওয়া, নিত্যস্নান, গন্ধমাল্যাদি পরিধান, শুভ্রবেশ পরিধান, বথাকালে সঞ্চিত দোষের পরিহার, রসায়ন ও ব্রহ্মা ঔষধ সেবন (বথা ছাগলাদ্যস্বত) এই সমস্ত অভ্যাসদ্বারা মানুষের জ্বতিকাস্র দূরীভূত হইয়া দেহ স্থৌল্য উপনীত হয়।

স। আর সবত বুঝিলাম কিন্তু আপনি যে স্বর্ভ প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার দ্বারা জ্বষ্টপুষ্টাদ হওয়া বার বলিলেন কিন্তু অনেকের যে ঐরূপ গুরু আহার লভ হয় না, তার কি ?

ক। সহ না হইলে মন্দারি রোগ আছে, জানিতে হইবে। "প্রকৃত্যা দুর্বলাঃ কেচিৎ কেচিদ্ আময় দুর্বলাঃ" কেহ স্বভাবতঃ ক্ষীণ থাকে, কেহ রোগজন্য ক্ষীণ।

স্বভাব ক্ষীণেরা "পোষ্টাই" সেবন করিলে অনারাসে স্থলকার হইতে পারে কিন্তু ব্যাধিশীর্ণ ব্যক্তিদিগের মন্দারি দূরীকরণের পূর্বেকদাপি পুষ্টাদ হইবার আশা নাই। তুমি দেখিয়া থাকিবে রোগ-ক্লম ব্যক্তির অপ্টিমদেশে পিত্ত কিছুদিন থাকিবার পর রোগনা সারিলেও একটু মোটা হইয়া আসে !

তাহার কারণ কি ? কারণ এই যে, রোগী এখনে যা খায়, তাহা পরিপাক পুষ্য না, গায়েও লাগে না—আর স্থানান্তরে সেখানে ভুক্তবস্ত সমস্ত জীর্ণ হইয়া শরীরের পোষণক্রিয়া সাধন করে। অগ্নিই শরীরের ক্ষয়বৃদ্ধির মূল কারণ।

স। আপনি যে বলিয়াছেন, লোকে ভিন্ন ভিন্ন কারণে স্থূলকায় হইতে পারে; সে সব কারণগুলি ধরিয়া এক এক করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিন, নতুবা আমার মনে হইবে—মোটাই হয় কেবল বড় লোকে, গরীবেরাই কৃশ। ধন ও দারিদ্র্যই দুইদিকে দুইটা স্পষ্ট কারণ।

ক। “তুমি যা বলছ, তা নিতান্ত মিথ্যা নয়; তবে উহার মধ্যে আরও কথা আছে, ক্রমে বুঝাইতেছি। •দেখ, প্রথম কারণ বলা হইয়াছে “সুনিদ্রা”; এটা কক্ষপ্রকৃতিক সুস্থদেহীরই হইয়া থাকে; অনেক গরীব লোকের স্থূল দেহ আছে, দেখিয়া থাকিবে—নিঃসাসনস্থ রাজারও না থাকিতে পারে, সুতরাং একরূপে রাজাকেও কৃশকায় হইতে হয়। দ্বিতীয় “হর্ষ”। ইহা ধরে বেঁধে হয় না, স্বাভাবিক হওয়া চাই; এটা ঈশ্বরপরায়ণ বা অবস্থাবানেরই আছে। “সুখপ্রদ শয্যা” এটা ধনীর পক্ষে। মনের নিবৃত্তি বা ঈশ্বরবিশ্বাস—এটা শুধু ধনীর নয়, যে কোনও সাধুচিত্ত ব্যক্তির হইতে পারে। নানারূপ পুষ্টিকর ভোজনে দেহ পুষ্ট হয়, তাহা ত বলাই বাহুল্য। তবে সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্ততা না থাকিলে হইবে না, তজ্জগৎই ভোজনশীল নিমন্ত্রণ-কীট ব্রাহ্মণেরা দিব্যাহার সম্বন্ধে কৃশকায়। •চিন্তারাহিত্য একটা প্রধান কারণ। দেখা যায়, কোনও ব্যক্তির অবস্থার উন্নতি হইলে ক্রমে মোটা হইয়া পড়ে। তাহার কারণ—পূর্বে হীনাবস্থাকালে সে চিন্তায় দগ্ধ হইতেছিল, সম্প্রতি মনের হর্ষ ও নিশ্চিন্ততা আসিয়াছে। আর গায়ে তেল বসাইয়া লইলে যে মোটা হওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত পাড়াগেঁয়ে মুসলমান দরবেশেরা। ইহারা শিষ্য বা সেবাদাসী দ্বারা নিত্য নিত্য বহুৰূপ ব্যাপিয়া দেহে তৈল মর্দন করাইয়া লন, দেহও খুব লম্বা-চওড়া মোটামোটা হয়। শেষ কথা—শান্তোক্ত অমৃতপ্রাণ ছাগাদি দ্রব্য প্রভৃতি পুষ্টিকর রসায়ন যোগ সমুদায়ের দ্বারা যে কৃশদেহ স্থূল হয় তাহা বহুবার দেখা গিয়াছে।

দ্রব্যগুণ বিচার ।

কিস্মিস্ ও মনকা ।

বাজালা নাম—কিস্মিস্ ; হিন্দী—ক্রাধ ; ইংরাজী—Vitis Vini fera.
সংস্কৃত পর্যায়ঃ—দ্রাক্ষা বাহুফলা প্রোক্তা তথা মধুরস পিচ । মৃদ্ধিকা হার-
হুরা চ গোস্তনী চাপি কীর্তিতা । সংস্কৃত নাম—দ্রাক্ষা, বাহুফলা, মধুরস,
মৃদ্ধিকা, হারহুরা, গোস্তনী । অন্ত নাম—কৃষ্ণা, চূরুফলা, বক্ষ্ময়ী, তাপস-
প্রিরা, প্রিয়লা, শুদ্ধফলা, অমৃতফলা, ফলোদ্ভমা ।

কিস্মিস্ ও মনকা কাশ্মীর কাবুল প্রভৃতি দেশীয় এক প্রকার বিস্তীর্ণ
লতার গুল্মীকৃত ফল । এই ফল যখন খোলো খোলে গাছে ঝুলিতে থাকে
তখন ইহা দেখিতে মনোরম-হরিদ্রাত একে অতীব শোভাময় । সংস্কৃত-
সাহিত্যে সুন্দরীর গুণ ইহার সহিত উপমিত হইয়াছে । গাছ-পাকা অবস্থায়
অত্যন্ত সুস্বাদু । ডাঁসা থাকিতে থাকিতে গুর্কাইয়া বিক্রয়ার্থ চূড়দিকে
প্রেসিত হয় ।

ইহা প্রধানতঃ দুইপ্রকারে আছে—বড়গুলিকে মনকা এবং বীজহীন
ছোটগুলির নাম কিস্মিস্ বলে । বড়গুলির চেহারা কতকটা গরুর বাঁটের
ভায়, তজ্জন্মই ইহার সংস্কৃত নাম “গোস্তনী” ।

দ্রাক্ষা পকা সর শীতা চক্ষুযা বৃংহণী শুষ্কঃ ।

বাহু পাক রসা স্বধা তুবরা স্ফট মূত্র বিট্ ।

কোষ্ঠমারুত্ কৃদ্ ব্যা কফপুষ্টিরচিপ্রোদা,

হস্তি তৃষ্ণা অরখাস বাত বাতাস্র কামলাঃ,

কৃচ্ছ্রাপিত্ত সংমোহ দাহ শোথ মদাত্যম্বলি ॥

ব্যয়া স্তাং গোস্তনী দ্রাক্ষা শুর্কাচ বাত পিত্তমুৎ ।

অবীজাতা যন্নতরা গোস্তনী স্পৃশী শুঠৈঃ ।

পাকা মনকার রস—মধুর ; বিপাক—মধুর ; বীর্ষ্য—শীতল ;
গুণ—চক্ষুর হিতকর, দেহহৌল্যকারক, গুরু পাক, অরশোধক, অধিক
ভোজনে কোষ্ঠ-বায়ু-জনক, ব্যা, কফকর, পুষ্টিকর, রচিপ্রোদ, তৃষ্ণা, অর, খাস,
বায়ু, বাতরক, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, সংমোহ (মূর্ছা ও দেহকল্যাণজনিত অবসাদ)
দাহ, মদাত্যয় (অতিরিক্ত মদ্যপানজন মূর্ছা) নাশক । প্রভাব—সারক,
মলমূত্র নিঃসারক, ক্ষয়হর ও রক্তপিত্তাস্তক । সংক্ষেপে, এই গোস্তনী দ্রাক্ষা

কর বৃথা ও বাতপিত্ত হয়। অবীজ ক্ষুদ্রাকারী, গুলি (অর্থাৎ সাধারণ কিস্মিস্) গোস্তনীর তুল্য গুণ ।

প্রয়োগ—এদেশে নানা মিষ্টান্ন ও পোলাও প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে । জলধাবার রূপে শুধু অথবা অস্ত্রান্ত্র মেওয়া জিনিসের সহিত ব্যবহৃত হয় । ইহার প্রধান প্রয়োগ মুহ রেচন পিত্তহরণ ও উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে বায়ুর অহুলোমুন । শিশু, যুগাশীল ব্যক্তি ও মূহকোষ্ঠ ব্যক্তিদের মুনকার কাথ খাওয়াইলে নিকষেগে মলত্রুষ্টি হয় । এই কাথে কার্য্য না হইলে সৌদালের আঠা উছাতে ১ বা ২ আনা গুলিরা দিতে হয় । মউরী ও কিস্মিস্ কাপড়পুটলীতে রাখিয়া জলে ভুকাইয়া চুষিলে বাতপিত্ত জরের পিপাসা দূর হয় । জরকালে ছ-চারিটা কিস্মিস্ সুপথ্যের মধ্যে গণ্য । হিন্দুস্থানীরা গোলমরিচচূর্ণ ও অন্ন সৈন্ধবসহ ৮।১০টা মুনকা একটু ভাজিয়া জর রোগিকে খাইতে দেয় । ইহাতে দ্রাব্য পরিষ্কার ও শরীরের লঘুতা হয় । উর্দ্ধগরক্তপিত্তে খই ও কিস্মিস্ খাওয়া ভাল, এবং মুনকাষটিত পাচন অত্যন্ত উপকারী—যথা—মুনকা, অনন্তমূল, ষষ্টিমধু, পিপূল যথাবিধি কাথ কর্তব্য । মুহুরেচক ঔষধে প্রায়শঃ কিস্মিস্ সংযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে রেচকত্ব ও মধুরতা এই উভয় উদ্দেশ্য সাধিত হয় । শাল্কোক্ত দ্রাক্ষারিষ্ট, দ্রাক্ষাদি বৃত্ত প্রভৃতির মধ্যে ইহা আবশ্যক হয় ।

কুঁচ ।

বান্দালা নাম—কুঁচ ; হিন্দী—শোণাকাঁইচ, চিরমিটাং ; ইংরাজী Abrus Precatorius. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—রক্তিকা গুল্লিকা গুল্লা কাকজন্বা শিখণ্ডিনী, কৃষ্ণলা কাকিনী কক্ষা কনৌচিঃ কাকগন্তিকা । সংস্কৃত নাম—রক্তিকা, গুল্লিকা গুল্লা, কাকজন্বা, শিখণ্ডিনী, কৃষ্ণলা, কাকিনী, কক্ষা, কনৌচিঃ কাকগন্তিকা ।

ইহা এক প্রকার লতা-গাছ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরু পাতা হয়, ইহাতে সরু শিমের মত ফল হয়, তাহার মধ্যে কুঁচ-বীজ থাকে । কুঁচ সকলেই দেখিয়াছেন । বাজারে বণিকের দোকানে যে ষষ্টিমধু বিক্রীত হয়, তাহা এই জাতীয় গাছের মূল । খেত ও লাহিত ভেঙ্গে কুঁচ ছই প্রকারের আছে ।

• গুল্লাঘর; তুঁ কেত্রং শ্রাং বাতপিত্তজরাপহম্ ।

মুখশোষ ভ্রমখাস তৃষ্ণা মদ বিনাশনম্ ॥

নেত্রাময় হরঃ বৃষাঃ বলাং কণ্ড ব্রণং হরেৎ ।

ক্রিমীক্রলুপ্ত কুষ্ঠানি রক্তাচ্চ চ খবলাপি চ ॥

শিফা বাস্তিকরী পত্রং শূলম্নঃ বিষহৎ তথা ॥

দুই প্রকার গুল্লাই কেশকর, বাতপিত্তজ্বর নাশক, মুখশোষ, ভ্রম, ঋস, তৃষ্ণা ও মত্ততা প্রশমক ; নেত্ররোগ হর, বৃষা, বলা, কণ্ড ব্রণহর। ক্রিমি ইক্র-লুপ্ত ও কুষ্ঠের প্রতিকারক (শেত ও রক্ত উভয়ই) । ইহার মূল বমিজনক, (অতি মাত্রায় বমিজনক, অল্পমাত্রায় কফনিঃসারক) পত্র শূলনাশক ও বিষহর (প্রলেপে) । কেশকর অর্থাৎ বৌদ্ধে চিতামূল প্রভৃতির স্থায় উগ্রতা থাকার কেশহীন চর্মকে উত্তেজিত করিয়া কেশ উৎপাদন করে। বাতপিত্তজ্বর নাশক, মত্ততা প্রশমক—ইহার মূলের কাথ। নেত্ররোগ হর—পত্রের রস চোখে ফোট দিতে হয়। বৃষা—কুঁচ বীজ উত্তেজক বলিয়া ইহার সহিত সিদ্ধ করা তৈল শিথিলাঙ্গে প্রয়োগে উপকারী। কণ্ড ব্রণ হর = বীজসিদ্ধ সর্বপ তৈল। ক্রিমি-নাশক = ইহার সহিত সিদ্ধ তৈল বাহুক্রিমিয়।

ইক্রলুপ্ত প্রতিকারক = মত্তকের কেশ উষ্ণিয়া গিয়া চর্ম মন্থ হইলে ইহার প্রলেপ তৎস্থান উত্তেজিত করিয়া কেশ উৎপন্ন করে। কুষ্ঠহর = বীজের প্রলেপ বা সিদ্ধ তৈল।

প্রয়োগ—ইহার মূল, পত্রের রস ও ফল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। মূল শুষ্ক কাশে ও নানাবিধ পিত্তরোগে বিশেষ উপকারী। পত্রের রস সেবন কম্প-জরে উপকারী—মাত্রা আধছটক। ইহার বীজকে “রতি” বলে এবং গুজন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ফলের প্রধান প্রয়োগ ইক্রলুপ্ত ও কুষ্ঠে। কুঁচ আকন্দ-মনসী-প্রভৃতি সপ্ত উপবিষের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। শুনা যায় কুঁচ কাটিয়া সূক্ষ্মাগ্র কবিয়া তদ্বারা শূকর বিড়াল প্রভৃতির গায়ে ঘোঁচা দিলে তাহাদের শরীর বিধাঙ্ক হয় ও ক্রমে তাহাদের মৃত্যু ঘটে। বস্ততঃ, ইহা এক-প্রকার মুহু বিষ, অধিকমাত্রায় উদরস্থ হইলে, বা অন্তকোনও রূপে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে মনুষ্যেরও প্রাণ নাশক হয়। ইহা একপ্রকার বিষ বলিয়াই কুষ্ঠরোগে ইহার প্রভূত শক্তি। কুষ্ঠে যে বিষের প্রয়োগ উপকারী তাহা শাস্ত্রোক্ত ‘করবীন্দা তৈল, বিষ তৈল, বিষতিলুক তৈল, কৃষ্ণদর্পাদ্য তৈল, ভ্রাতক গুড় প্রভৃতি ঔষধই তাহার প্রমাণ।

• কেশ উঠাইবার জন্য একটা ইউনানী ষ্টিমোগ এই—লাল কুঁচ খোলা ছুঁড়াইয়া ওঁ খেঁৎলাইয়া একপোয়া লাইবে এবং চারিদেয় গব্যদ্রবের সহিত সিদ্ধ করিয়া দেড় সের থাকিতে নামাইবে। এই দ্রব হইতে মাখন তুলিয়া ১৪ দিন টাকে লাগ্যাইলে পুনরায় চুল উঠে। ষ্টিমোগের দ্রব ষ্টিমোগ—ভেলার আঠা, কুঁচফল ও কুঁচফল পিষিয়া মধু মিশাইয়া প্রলেপ দিলে টাক দূর হয়। ইহাতে ভেলার আঠা ৪৫ ফোঁটার অধিক দিতে নাই। হাকিমেরা বলেন সাদা কুঁচ চিনিসহ ষ্টিমোগ ৩ দিন সেবন করিলে জ্বালোক বন্ধ হয়।

• শার্শ্বক বলিয়াছেন—কুঁচ-বীজ জলসহ পেষণ করিয়া লাগাইলে বাত-ব্যাদিজন্য স্থানিক কম্প ও নিঃসৃজতা দূর হয়।

ধবলরোগের একটা ষ্টিমোগ—কুঁচবীজ, হীরাকস, ও সোমরাজী সমাংশে আকন্দদ্রব সহ মাড়িয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিলে চর্ম্মের পূর্ষধর আবার উঠে। ভাবমিশ্র বলেন—কুঁচের ফল ও মূল সহ বিশুণ জল দ্বারা বিপাচিত সর্ষপ তৈল গঞ্জমালা দূর করে, দেখা গিয়াছে এই তৈলে মেটে সিন্দুর দিলে অধিক উপকারী হয়। কুঁচ, মনঃশিলা ও মনসার আঠাসহ গব্যদ্রব পাক করিয়া ছাঁকিয়া লাগাইলে কুষ্ঠ বা কুষ্ঠত্বলা উৎকট চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়। শাস্ত্রোক্ত কেশ রোগের গুঞ্জাতৈলে টাকের স্নানাতৈলে, ধবলাদি ক্ষারঘৃতে কুঁচ আবশ্যিক হয়।

কুঁচিলা ।

• বাঙ্গালা নাম—ঐ ; হিন্দী—কুচলা ; ইংরাজী—Nux vomica. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—তিন্দুকশ রম্যফলো জলদো দীর্ঘপত্রকঃ। কুপীলুঃ কুলকঃ কাল-তিন্দুকঃ কালপীলুকঃ ॥ কাহকন্দু বিষতিন্দুশ্চ তথা মর্কট তিন্দুকঃ ॥

• অন্ত্রনাম—গরজম, কারস্বর, কচির, কুপাক, বিষষ্টি।

• গাবের গাছের মত বড় বড় গাছ হয়, সুপক ফলগুলি দেখিতে কতকটা ছোট কমলানুব্বর মত, ইহার মধ্যে যে বীজ থাকে তাহাই “কুঁচলে”। ভারতের মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতির জঙ্গলে এই গাছ জন্মে। কুঁচলে-বীজ দেখিতে প্রায় গোলাকার, চ্যাপ্টা, ও প্রায় একটা আধলা পয়সার মত। বীজগুলি অত্যন্ত শক্ত, রৌদ্রে শুকাইয়া হারামদিওয়ার শুঁড়া করা অতীব কষ্টসাধ্য ব্যপার।

হৃৎকে বা জলে সিদ্ধ করিয়া নরই হইলে শিলার পিবিয়া লওয়া যায় ; এই রূপেই কবিরাজী ঔষধে ব্যবহারযোগ্য হয় । কুঁচলের আশ্বাদ অত্যন্ত তিক্ত ।

কুপীর্গু শীতলং তিক্তং বাতলং মদক্লম্বু ।

পরং ব্যাধাহং গ্রাহি কফপিত্তাশ্বনাশনম্ ॥

রস—তিক্ত ; বিপাক—কটু ; বীৰ্য—উষ্ণ ; গুণ—শীতল অর্থাৎ পিত্তজনিত দাহ নাশক ; বায়ুবর্ধক অর্থাৎ ব্যানবায়ু উত্তেজক (মর্শার্থ এই যে শরীরের কোনও স্থান অশাঙ ও রক্ত চলাচল রহিত হইলে ইহার বাহু বা আত্যন্তরিক প্রয়োগে সেই দোষপূরীভূত হয়) ইহা মদকারক, অর্থাৎ অধিক মাত্রায় মূর্ছা আনয়ন করে ; লঘুপাক, আত্যন্ত ব্যাধানাশক (আত্যন্তরিক প্রয়োগে শূলব্যথা ও প্রলেপে দেহের বাত বেদন নিবারণ করে) । ইহা গ্রাহি অর্থাৎ ধারক ; এই “গ্রাহি-বিশেষণ মলমূত্র সম্বন্ধে নহে ; যেহেতু প্রত্যক্ষে ইহার একরূপ শক্তি দৃষ্ট হয় না । তবে এই বিশেষণ কেন ? যদি এই বিশেষণের সার্থকতা নিষ্পন্ন করিতে হয় তবে বলিতে হইবে ইহা শুক্রের ধারক । বস্তুতঃ, ইহা সপ্তদোষ ও শুক্রমেহ রোগে বেরূপ উপকার করিয়া থাকে, তাহাতে ইহাকে শুক্রধারক বলিতেই হইবে । পুনশ্চ, কফ পিত্তনাশক (কফ ও পিত্ত হইতে অঙ্গব্যথা, মস্তকব্যথা, বক্রদোষ, পাণুরোগ, অল্পপিত্ত, সুখের বিশ্বাস প্রভৃতি যে যে উপসর্গ হয় তৎসমস্তের প্রশমক) ইহা অশ্বনাশক অর্থাৎ পিত্তজন্ত রক্তদোষনাশক ।

এতৎসম্বন্ধে মতান্তর ।

° কচিরঃ কটুকস্তিক্তো রুক্কোকো দীপনো লঘুঃ ।

ভেদনো রোচনো হস্তি পাণুরোগক্ষ কামলাম্ ।

কুঁচলে কটুতিক্ত, রুক্ক, উষ্ণ, অগ্নিদীপন, লঘু, কোষ্ঠওদিকর, কচিকারক, এবং পাণুরোগ ও কামলারোগ বিনষ্ট করে ।

প্রয়োগ—জীর্ণ-অর, পিত্তরোগ, অঙ্গুখা, বক্রদোষ, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, বাত-পক্ষাঘাত হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি বাতব্যাধিতে ও নানাবিধ চর্মরোগে প্রয়োগ্য । কুঁচলের গুণ সংক্ষেপে স্বয়ংস্বয় করিতে হইলে, ইহাই মনে রাখা উচিত যে চিরতা গুলক প্রভৃতি সাধারণ তিক্ত বস্তুতে যে যে গুণ আছে—ইহাতেও তাহাই

আছে অধিকতর ইহা বিধাঙ্ক বলিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক ভীত ও অধিক আশ্রয়
 ও অন্নমাত্রার অধিক কার্যকারী এক উত্তেজক ।

তিক্ত বস্তু সমূহের মধ্যে কুঁচলে অতি উৎকৃষ্ট জিনিস্ । আয়ুর্বেদে ও ইহার
 প্রয়োগ রহিয়াছে, তথাপি কবিরাজগণ ইহার বহুল প্রয়োগ করেন না, পাশ্চাত্য
 চিকিৎসকেরাই ইহা অধিক ব্যবহার করেন ও ইহার গুণে মুগ্ধ । ইহার
 কারণ কি ? জ্ঞাপাততঃ ইহার উত্তরে মনে হয়, ইহা বড় উষ্ণ বর্ষা স্তরায়
 এতৎ পরিবর্তে গুলক প্রভৃতি মৃদুবর্ষা উদ্ভিজ্জগুলিই কবিরাজেরা ব্যবহার করা
 সম্ভবত বুঝেন, একথা ঠিক নহে ; যেহেতু দেখা যায় কবিরাজেরা কথার কথার
 মিঠাবিষ ও পারল ব্যবহার করিয়া থাকেন । যেহলে নবজ্বরাদি রোগে ডাক্তার
 মহাশয় সোরা-নিশাদল প্রভৃতির শৈত্যকর তরলসার প্রয়োগ করিতেছেন,
 ঠিক সেই স্থলেই কবিরাজ মহাশয় উৎকট মিঠাবিষ ও হিঙ্গুলঘটিত মৃত্তাজ্বর
 প্রভৃতি দ্বিত্যেছেন । স্তরায় মৃদুবর্ষা-প্রিয়তাই ইহাদের কুঁচলার প্রতি
 অন্নাদরের কারণ নহে । ইহার কারণ আনু কিছই নহে, একমাত্র কারণ
 এই যে কবিরাজেরা বাধাগদের গভীর মধ্যে থাকেন, উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা
 একটা দেখিয়া আর একটা করিতে পরাধ্যুধ । শাস্ত্রে যে হুই এক ঔষধের
 মধ্যে কুঁচলের প্রয়োগ আছে, সেইগুলিই গ্রস্তত করেন, কেহবা সেগুলি
 পরিহারও করিয়া থাকেন । ফলকথা, পরীক্ষাপরায়ণ পাশ্চাত্য ঔষধানিকেরা
 কুঁচলেকৈ বস্তটা চিনিয়াছেন, কবিরাজেরা ইহা ত্রুতদূর চিনিতে পারেন নাই ।
 পুরাতন জ্বরের (বা অন্তরোগের) পাচন লিখিবার সময় কবিরাজ মহাশয়
 যখন চিরতা গুলক নিমছাল কটকী প্রভৃতি এক-ঘেরে তিক্ত দ্বারা লব্ধা
 তালিকা করিতে বসেন, তখন তিনি কুঁচলের এক টুকরাকৈ উহার মধ্যে
 সন্নিবিষ্ট করিলেন এল্পক কি, পাঠক মহাশয় ! কখনও দেখিয়াছেন ?—বোধ
 হয়, না । আর এক কারণ—বাধাবর্জীর মধ্যে যদি কুঁচলে থাকে তাহাত
 কবিরাজ মহাশয় অবশ্যই ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু শুধু কুঁচলের মাত্রা
 তিনি জানিবেন কিরূপে ?—কেন না শাস্ত্রে একটা বস্তুর প্রয়োগ ও বড় বেশী
 নাই ! লোহ বিষ প্রভৃতির-মাত্রা নির্ণীত আছে বটে, কিন্তু কুঁচলের ও তাহা
 দেখিতে পাই না । দেখা যায়, ডাক্তারেরা ইহার তরলসার (tincture)
 সাধারণতঃ পাঁচ ফোটা করিয়া দেন, এখন কতটুকু কুঁচলে কত জলে কতক

ভিজাইলে বা সিদ্ধ করিলে ঐ কাথ পাঁচ ফোঁটার জ্বল্য হইবে ডায়াই বা কে নির্ণয় করিতে যায়। সস্তায়তঃ একরূপ নির্ভয়াভাবেও কবিরাজেরা পাঁচনা দিতে ইহা প্রয়োগ করেন না। যাহা হউক, আমরা বহুকালব্যাপক ব্যবহার দ্বারা ইহার মাত্রা সম্বন্ধে এইটুকু স্থির করিয়াছি—একটী কুঁচলেকে কাটিয়া তাহার সিকিভাগ (আধছটাক জলে) রাতে ভিজাইয়া প্রাতে সেই জল পান করিলে ৩ ফোঁটা টিঁচর নম্নভমিকা পান করিয়া কার্য্য হয়। অর্দ্ধঘণ্টা কাল জ্বাল দিয়া লইলেও ৩ ফোঁটার জ্বল্য সার নির্গত হয়। বলবান ব্যক্তির জন্য আধখানা কুঁচলে ঐরূপ ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া দেওয়া যহিতে পারে। এই ক্বাথ মহালক্ষ্মীবিলাস, বাতচিন্তামণি প্রভৃতির অনুপপন্ন লক্ষণ, অর্দ্ধিত্ত, (মুখ টেকিয়া যাওয়া) স্থানিক স্পর্শক্রিহীনতা ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি বাতব্যাধিতে প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়; অথবা মাথকলাদি পাচনের সহিত একটা কুঁচলের একচতুর্থাংশ দিয়া কাথ করিলেও উক্ত রোগসমূহে বিশেষ উপকারী হয়। পাকস্থলীর দৌর্ভল্যজনিত অতিসারেও ইহা ফলপ্রসূ। ইহার কাথের সহিত ৩০ ফোঁটা কাঁচা পেপের আঠা মিশাইয়া সেবন করিলে অঙ্গীরোগী সম্বয় উপশম পাইতে পারে। বক্রদোষজনিত অল্পপিত্তের পক্ষেও এমন মুষ্টিবোগ হ্রাস্ত। কামলারোগে চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ বা হরিদ্রাভ হইলে কুঁচলের কাথ সহ ৩৪° রতি নিষাদল চূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিলে উপকার হয়। অধিক কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে উহাতে হরিতকীর জল মিশানো আবশ্যিক।

একটা উৎকৃষ্ট মুষ্টিবোগ—খাঁটা সর্ষপ তৈল অর্দ্ধসের, কুঁচলের টুকরা অর্দ্ধপোয়া, শূকরের চৰ্ব্বা এক ছটাক, আদার রস অর্দ্ধসের, সৈন্ধব লবণ এক ছটাক, কর্পূর অর্দ্ধ ছটাক একত্রে সিদ্ধ করিয়া তৈলাবশেষ করিয়া লইয়া মর্দন করিলে বাত ও পক্ষাঘাতে বিশেষ উপকার দর্শায়। ধ্বজভঙ্গ রোগে শিথিল অঙ্গে এই তৈল মর্দন করিলে নিস্ত্রোজোভাব দূরীভূত হয়।

স্বপ্নদোষ ও অনিচ্ছাকৃত মূত্রত্যাগে কুঁচলের ব্যবহার উপকারী। অর্দ্ধটুকরা কুঁচলে, আধতোলা আমলকী ও চারি আনা কাবাবচিনি, দু' আনা ফুল ভড়ীচূর্ণ ও আট আনা মিশ্রী একত্রে ৮ ভরি জলে রাতে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় কিঞ্চিদধ পর্য্যন্ত সেবন করিতে থাকিলে স্বপ্নদোষ দূরীভূত হয়। কোন কোন বালকদিগের অজ্ঞাতসারে মূত্রনিঃসরণ হইয়া থাকে,

তছাদিগকে । আনা আমলকী ও কুঁচলের অষ্টমাংশ ভিজাইয়া খাওয়াইতে হয় ।

অর্শ, শূল ও রক্তঃ কৃচ্ছুরোগে কুঁচলের প্রয়োগ ফলদায়ক হইয়া থাকে । শিরোরোগেও ইহার উপকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে । দশমূলের সহিত কুঁচলে সংযুক্ত হইলে বাতশ্লেষ্মাঘটিত শিরোরোগে আশ্চর্য্য উপকার দর্শায় । একটা কুঁচলে, দু আনা দুগ্ধচিনি ও দু আনা চিনি একসঙ্গে জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে আধকপালি প্রশমিত হয় । ইহার চূর্ণের মাত্রা—সিকি হইতে ২ রতি । প্লীহজ্বর, অগ্ন্যার, রক্তামাশ্রয় এবং বহুমূত্রেও ইহার শক্তি আছে । শাস্ত্রোক্ত অজীর্ণের অগ্নিতৃণী বটা, শূলের শূলের শূলহরণ যোগ, এবং কুষ্ঠ ও পক্ষাঘাতের বিষতিজুক তৈল প্রভৃতির মধ্যে কুঁচলে আবশ্যক হয় ।

কুকুন্দর ।

বাক্সালা নাম—কুকুসিমা, কুকুর শোঁকা, কুকুরমুতা, পেনো মূলো বা বন-মূলো ; হিন্দী—কুকুরোন্দা ; ইংরাজী—সেলসিয়া করমাণ্ডিলিয়েনা, সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কুকুন্দরঃ পীতপুষ্পঃ কুকুরক্ষ মূর্ছচ্ছদঃ । সংস্কৃত নাম—কুকুন্দর, পীতপুষ্প, কুকুরক্ষ, মূর্ছচ্ছদ ।

ছোট ছোট গাছ, ভূমি হইতে ডাঁটা একটু দূর উঠিয়াই চারিদিকে ছড়ানো পাতা দ্বারা বেষ্টিত থাকে, পাতাগুলি কলেকের হাতের পাঞ্জারি স্তার, কিন্তু তদপেক্ষা একটু লম্বা । পাতা অত্যন্ত কোমল, হাত দিয়া মাড়িলে একরূপ অপ্রীতিকর গন্ধ বাহির হয় । পতিত জমিতে, দেওয়ালে, গৃহস্থের বাড়ীর ধারে অনেক দেখিতে পাওয়া যায় ।

কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো অররক্ত কফাগ্নহঃ ।

রক্তপিত্ত মতিসারং দাহং হৃদ্যঃ নিহস্তি চ ॥

তন্মূল মার্জ্জং নিক্খিপ্তং বননে মুখশোষহং ॥

রস—স্বিষং কটুতিক্ত ; বিপাক—মধুর ; বীৰ্য্য—শীতল ; গুণ—অরয়, রক্তদোষহর, কফনিঃসারক, ঘোর দাহ নাশক । প্রভাব—রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসার প্রশমকারী, আর্দ্রমূল মুখে ধৃত হইলে মুখশোষ নাশক ।

প্রয়োগ—এই গাছটী নানারূপে বড়ই উপকারী ! ইহার পাতার রস একটা উত্তম রক্তরোধক । তবে উর্দ্ধগ অপেক্ষা অধোগরক্তে অধিক কার্যকর । যদি রক্তশ্রাব কফমিশ্রিত না হইয়া বাতপিত্ত জন্ম হয়, তবে উর্দ্ধগ রক্তেও বেশ ফল দর্শায় । দাহজ্বরে ইহার রস সেবন করাইলে ও গাত্রে মাখাইলে উপশম পাওয়া যায় । সেবা মাত্রা—২ তোলা । পিত্ত-প্রকোপকারণে রক্ত উত্তপ্ত হইয়া দূষিত হইলে ইহার রস সেবনে সেই দোষ দূরীভূত হয় । ষাণ্মাচি চুলকানির উপরে রস মাখাইলে উপকার দর্শায় । ইহার পাতার রস মধু সেবন করিলে জমাট শ্লেষ্মা তরল হইয়া উঠে । পিপ্যুসা কালে ইহার মূল মিশ্রীসহ মুখে রাখিলে কণ্ঠশেষ্য নিবারিত হয় । নূতন গনোরিয়া রোগে ইহার রস চিনিসহ পানে উপকার হইতে দেখিয়াছি ।

ইহার প্রধান ঔষধ-স্বভাবস্বভাবসারে, কুড়াচির স্তরে পেট গরম না করিয়া রক্তরোধ করে । বাতরোগীকে এক ব্যক্তি নিজ হস্তে একদিন মাত্র একটা মূল খাওয়াইয়া আরোগ্য করে—আমরা শুনিয়াছি, ইহা এই কুকসিমার মূল । ইহার সঞ্চয়ে একটা ঘটনা আছে এই একজন মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক অধ্যক্ষের সহিত বিবাদ করিয়া কার্যত্যাগপূর্বক দেশান্তরে চলিয়া যান, সেখানে গিয়া একটা দুঃসাধ্য রক্তামাশয় রোগীকে শুধু কুকসিমার রস খাওয়াইয়া খাওয়াইয়া ভাল করেন । তজ্জন কিছু অর্থলাভও করেন । তাহার পরে বাঙ্গালা আয়ুর্বেদ পুস্তক কিনিয়া তিনি সেই দেশে ক্রমে কবিরাজী করিতে লাগিলেন !

কুম্ভুম ।

বাঙ্গালা নাম—কুম্ভুম ; হিন্দী—জাফরান, কেশর ; ইংরাজী—Saffron. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কুম্ভুমং ঘৃস্থগং রক্তং কান্দারং পীতকং বরং । সঙ্কোচং পিণ্ডনং ধীরং বাহ্লাকং শোণিতাভির্ভূম্ব । . সংস্কৃত নাম—কুম্ভুম, ঘৃস্থগ, রক্ত, কান্দার, পীতক, বর, সঙ্কোচ, পিণ্ডন, ধীর, বাহ্লাক এবং শোণিতপর্ষায়ের সমস্ত শব্দ জলি ।

অন্য নাম—ঘস্র, কুস্থরাস্রক, ধগ, রজ, সৌরভ, কান্দীরজন, অগ্নিশিখ, রবেণ্য, কান্ত, গৌর ।

কাশ্মীর দেশে এক প্রকার ছোট গাছ আছে, ইহা তাহরই পুষ্পের গর্ভ-কেশর। এই গাছ দেখিতে অন্তোকাংশে পেরাজ-গাছের স্তায়। ঐ সকল পুষ্প আহরণ করিয়া কাগলের উপর রৌদ্রে বা উননের উপরে অগ্নিতাপে শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। ইহা প্রধানতঃ কাশ্মীরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার একটা নাম কাশ্মীর বা কাশ্মীরজ। কুম্ভুম দেখিতে রক্তাভ হরিদ্রাবর্ণ, এক বা দেড় ইঞ্চি লম্বা স্তম্ভাকার টুকরীর স্তায়, অগ্রভাগ একটু স্থূল, এবং ইহা তীব্র সাদাগন্ধযুক্ত, যেন ইহাতে রসুনের গন্ধের একটু আমেজ পাওয়া যায়। কাশ্মীরে ঐই জিনিসের বহুল প্রচলন। যেমন এতদেশে বিবাহাদি উৎসবে হরিদ্রা ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ কাশ্মীর প্রদেশে উৎসবকালে ইহার মহা সমাদর। বাজনারির স্বস্বাদ উৎপন্ন করিবার জন্তও ইহা উক্ত প্রদেশে বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশেও পোলাও-কালিয়া প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের খাদ্য প্রস্তুত করিবার কালে গুরুম মশলার উপকরণরূপে ইহা সমাদৃত হইয়া থাকে।

ইহার কাথে বস্ত্র রঞ্জিত করিলে উহাতে অতি সুন্দর বর্ণ উৎপন্ন হয়। মাখিবার তৈলে ডুবাইয়া রাখিলে উহাতে সৌগন্ধ, সদ্গুণ ও স্বর্ণবর্ণ উৎপাদিত হয়। কাশ্মীরের নিকটবর্তী অন্তান্ত শীতপ্রধান দেশেও কুম্ভুম জন্মে, কিন্তু তাহা তত্ত ভাল নয়, যথা—

কাশ্মীর দেশে জন্মে কুম্ভুমং যদ্ ভবেচ্ছিতং ।

স্বস্নকেশরীমারক্তং পদ্মগন্ধি তচ্ছুভ্রম্ ।

বাহ্লীক দেশ সংজাতং কুম্ভুমং পাণ্ডুরং স্নতং ।

কেতকীগন্ধযুক্তং তৎ মধ্যমং স্বস্নকেশরম্ ।

কুম্ভুমং পারসীকে যন্ মধুগন্ধি তদোরিতম্ ।

ঐযং পাণ্ডুরবর্ণং তদ্ অধমং স্থলকেশরম্ ।

যে কুম্ভুম কাশ্মীর প্রদেশে জন্মে, তাহা স্বস্নকেশরবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধি, এই কুম্ভুমই সর্বোৎকৃষ্ট। যে কুম্ভুম বাহ্লীক (বোখারা) প্রদেশে জন্মে, তাহা পাণ্ডুর বর্ণ, কেতকী পুষ্পের স্তায় গন্ধযুক্ত ও স্বস্নকেশর বিশিষ্ট, ইহা মধ্যম এবং পারস্য প্রদেশে যে কুম্ভুম উৎপন্ন হয়, তাহা মধুর স্তায় গন্ধযুক্ত, ঐযং পাণ্ডুর বর্ণ, স্থলকেশরও নিকৃষ্ট।

কুম্ভকুমং কটুকং স্নিগ্ধং শিরোরুগব্রণজঙ্ঘজিং ।

তিক্তং বমিহরং বর্ণ্যং বন্দিদোষত্রয়পহম্ ॥

রস—তিক্তকটু; বিপাক—কটু; বীৰ্য্য—উষ্ণ; গুণ—স্নিগ্ধ (তৈলাক্ত) ব্রণহর, ক্রিমিনাশক, বমিহর, বর্ণশোধক, মেচেতানাশক ও নিদোষহর, প্রভাব—শিরোরোগে উপকারী।

প্রয়োগ—পূর্বে পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা ইহার আক্ষেপ-নিবারক ও রক্তোনিঃসারক শক্তি দেখিয়া হিষ্টিরিয়া ও বাধক প্রভৃতি স্ত্রীরোগে বিশেষ উপকারী মনে করিতেন। এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অধিক ফলপ্রদ নূতন নূতন উদ্ভিদ্ধ আবিষ্কৃত হওয়ার আজকাল ডাক্তারী চিকিৎসায় ইহার অধিক প্রচলন নাই।

আয়ুর্বেদ মতে ইহার প্রধান প্রয়োগ মুখব্রণাদি চর্মবিকারে ও শিরোরোগে। ইহা কফপ্রকৃতির রোগী ইহা নিত্য নিত্য অন্নবাজ্জনে ব্যবহার করিলে উপকার পাইতে পারে। মুষ্টিযোগ—(১) সিমুলের কাঁটা, জাক্রাণ ও ছুথের সর একত্রে পিষিয়া মুখে লাগাইলে মেচেতা ও মুখব্রণ দূরীভূত হয়। (২) কাঁটা হনুদের রসের সহিত জাক্রাণ উত্তমরূপে মাড়িয়া উহাতে মাখন মিশাইয়া মস্তক মর্দন করিলে মাথা-ঘুরা ও মাথার দবদ্বীবানি উপশমিত হয়। (৩) জাক্রাণ আতপতগুল ও দারুচিনি সমানংশে পানের রসে পিষিয়া লেপ দিলে মাথাধরা ও আধুরুপালে আরোগ্য হয়।

রসারনোক্ত অমৃতপ্রাশ ঘৃত ও শিরোরোগের কুম্ভুমাঙ্গি তৈলে জাক্রাণ আবশ্যিক হয়।

কুটজ ।

বাক্সালা নাম—কুডচি; হিন্দী—কুইরয়া; ইংরাজী—Wrightia antidysentrica. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কুটজঃ কুটজঃ কোটো বৎসকো গিরিমল্লিকা কালিদ শক্রশাখী চ মল্লিকাপুষ্প ইত্যপি। ইন্দ্রোষবফলঃ প্রাক্তো বৃক্ষকঃ পাণ্ডুর ক্রমঃ। সংস্কৃত নাম—কুটজ, কুটজ, কোট, বৎসক, গিরিমল্লিকা, কালিদ, শক্রশাখী, মল্লিকাপুষ্প।

বড় গাছ হয়, পাতা কতকটা চাণা-পাতার মত (ছোট হাতের পাক্সার

মত) ফুল ছোট, খেতবর্ণ, অতীব সুগন্ধিও দেখিতে মনোহর । পাড়া গারে ঘন জঙ্গলে আপনা-আপনি জন্মিয়া থাকে ।

কটুজঃ কটুকো রুক্ষো দীপন স্তবরো হিমঃ ।

অশোভিতসার পিত্তাশ কফ তৃষ্ণামকুষ্ঠমুৎ ॥

রস—তিক্তকষায়; বিপাক—কটু; বীর্য্য—হিম; গুণ—রুক্ষ, দীপন, কফ তৃষ্ণা ও কুষ্ঠনাশক । প্রভাব—অশ, অতিসার ও রক্তপিত্ত প্রশমক ।

• প্রয়োগ—কুড়চির প্রধান শক্তি রক্তরোধকতা । এইশক্তি উর্দ্ধগ অপেক্ষা অধোগর্ভেই অধিক দৃষ্ট হয় । রক্তার্শ ও রক্তাতিসারে ইহার ক্ষমতা সর্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে । বিশেষতঃ রক্তাতিসারে ইহা অগ্রেই অধিক ফলপ্রদ উদ্ভিজ্জু আবিষ্কৃত হয়, নাই বলিলে বলা যায় । জীলোকের রক্তপ্রদরেও প্রয়োগ করিয়া ফল পাওয়া যায় রক্তপ্রদরে ইহার সহিত আমলকী প্রভৃতি শীতবীর্য বস্তু যুক্ত করিলে অধিক ফল হয় । আমাশয় রোগে ইহা কখন কখন প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু উহা রক্তমিশ্রিত হইলে কটুজপ্রয়োগে সমধিক উপকার দর্শায় । আমরক্তাতিসারে কুড়চি নানারূপে প্রযুক্ত হয়, ইহার কাঁচা ছালের টাটকা রস, কাঁচা ছাল পোড়াইয়া তাহার রস, কাঁচা ছালের কাথ বা শুষ্ক ছালের কাথ শুষ্ক ছাল চূর্ণ পাতার কাথ, মূলের ছালের রস, ও ইহার ফল (ইঞ্জিয়া) ব্যবহৃত হইয়া থাকে । রক্তামাশয়রোগে যখন নাড়ীতে বা হইয়া নানাবর্ণের মল মিশ্রিত মাংস খসিয়া পড়িতে থাকে তখনও ইহাধারা রোগীর প্রাণরক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে । নূতন ও পুরাতন উভয়প্রকার রক্তাতিসারেই কুড়চী উপকারী, তবে পুরাতন অবস্থার বিনাবিচারে সহসাই প্রয়োগ করা যায় কিন্তু নূতনে কখন কখন ইহা প্রয়োগার্হু নহে । পুরাতন অবস্থার সহিত দালিমের খোলা মোচরস প্রভৃতি সংকোচক বস্তু সংযুক্ত করা কর্তব্য । আমরক্ত রোগে যে ইহা দ্বারা এত উপকার হয় তাহার কারণ ইহার এই কমটী গুণ—শোধক আমপাচক ক্ষতনাশক ও রক্তরোধক । কুড়চির সহিত বেলগুঁঠ যুক্ত করিয়া উভয়ের কাথ পান করাইলে যেন সোণার সোহাগা হয় বলিতে হইবে । কাথ করণার্থ প্রত্যেক ১ ভরি লইতে হইবে । দুঃসাধ্য অবস্থায় এ কাথে মটরপ্রমাণ আফিং সংযুক্ত করিয়া দিবে ।

কুড়চিত্তে ক্ষতনাশক শক্তি আছে। ইহার স্তম্ভচূর্ণ দ্বারা উপরে ছটাইয়া দিলে উপকার দর্শায়। কুড়চি চূর্ণ দ্বারা দাঁতে মাজিলে মাজীর বা ওঁরক্ত পড়া দূর হয়। সাধারণ লোকে নিমপাতার জলে বা ধুইয়া থাকে ; কিন্তু তৎপরিবর্তে কুড়চি সিদ্ধজলের সহিত বা ধুইয়াইলে অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার হয়।

আমরক্তের কয়েকটা শাস্ত্রোক্ত মুষ্টিযোগ—(১) বৎসকাদি কাথ—কুটজ, আতিস, বেলগুঁঠ মুখা, বালা, সার্কলো ২ ভরি। কুটজাদি কাথ—কুটজ, দাড়িমখোলা, মুখা, বালা, লোধ, রক্ত চন্দন, ধাইকুল, আকনন্দ একত্রে ২ ভরি। ষথাবিধি কাথ কর্তব্য। (৩) কুটজ পুটপাক—টাটকা কুড়চির ছাল উত্তমরূপে তণ্ডুলজলসহ পেষণ করিয়া জামপত্র দ্বারা বেটন ও কুশদ্বারা বন্ধন করিয়া বহির্ভাগে মুক্তিকালেপন পূর্বক পুটপাক করিবে। বহিঃস্থ লেপ অরুণবর্ণ হইলে অগ্নি হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া রস নিংড়াইয়া ২ তোলা পরিমাণে মধুসহ সেবন কর্তব্য।

কুড়চির জ্বরাতিসার নাশনেও সমধিক শক্তি আছে—জ্বরাতিসারের ব্যোষাদি চূর্ণের মধ্যে অর্ধেকভাগই কুড়চিছালচূর্ণ কুড়চি হইতে শাস্ত্রোক্ত কুটজাষ্টক, কুটজরস ক্রিয়া, কুটজাবলেহ, কুটজারিষ্ট প্রদবারি লৌহ গ্রহণী-মিহির তৈল প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত সহর মর্কঃশলে ষেখানে যে প্রসিদ্ধ রক্তামাশয়ের মুষ্টিযোগাদি আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহার অধিকাংশেরই কুড়চিই প্রাণ।

কুড় ।

বাঙ্গালা নাম—ঐ ; হিন্দী—কুট ; ইংবাজী—*Sansurea Auriculata*. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কুষ্ঠং রোগাহরং চাপ্যং পারিত্যব্যং তথোৎপলম্ সংস্কৃত নাম—কুষ্ঠ, রোগের সমার্থক সমস্ত শব্দ, আপ্য, পারিত্যব্য, উৎপল। অস্ত নাম—কদাধা, ছট, জরণ, কোবেল, ভাস্কর, কাকল, কুংসিত, পাবন, পদ্মক, কিক্ক, হবিভদ্রক।

হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ জাত একরূপ বৃক্ষের মূল। হরিণশৃঙ্গের টুকরার ভায় অমল্য পাতলা খণ্ড খণ্ড অবস্থায় বগিকের দোকানে বিক্রীত হয়, ইহাতে বেশ একটু স্বগন্ধ আছে।

• কুষ্ঠ মুষ্ণুঃ কটু স্বাদু শুক্রলং তিক্তকং লঘু।

হস্তি বাতশ্র বৌসর্প কাশকুষ্ঠ মরুৎ কফানু॥

• রস—তিক্ত কটু স্বাদু ; বিপাক—কটু; বীর্য—উষ্ণ ; গুণ—
বীতগ্লেহ্নম, লঘু কাশনাশক, বাতরক্ত কুষ্ঠ বৌসর্প প্রশমক ।

প্রভাব—শুক্রল (কটুতিক্তস্ব সঞ্চেৎ)

মতাস্তর—কুষ্ঠং স্বাসং কাশকুষ্ঠং জ্বরং হিকাঞ্চ নাশয়েৎ । কুড়, স্বাস,
কাশ, কুষ্ঠ, জ্বর ও হিক নিবারণ করে ।

• প্রয়োগ—কাশ রোগে প্রধানতঃ, দ্বিতীয়তঃ চর্মরোগে ইহার ব্যবহার
জরযুক্ত কামে'ও প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ইহার সৌগন্ধ্যবশতঃ ডাক্তারেরা
ইহাকে কার্মিনেটিভ (Carminative) শ্রেণীর মধ্যে গণনা করেন । বস্তুতঃ,
বাতাজীর্ণে ইহার প্রয়োগ দৃষ্টকল । শ্লোকস্থিত "বাতগ্লেহ্ন" বিশেষণ দ্বারাই
ইহার এই শক্তি বুঝিতে হইবে ।

মুষ্টিযোগ—(১) কুড় গিপুল ষষ্টিমধু, কাঁকড়াশৃঙ্গী একত্রে ২ তোলা সিদ্ধ
করিয়া তাহার কাথ ২ বারে পান করিলে কাশ আরোগ্য হয় অথবা উহাদের
চূর্ণ ১/০ আনা মাত্রা মধুসহ লেহন করিবে । (২) কুড় ও মনছাল সর্ষপ
তৈলে সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল লাগাইলে পাচড়া বা প্রভৃতি আরোগ্য হয় ।
(৩) কুড়, গৃধ্রুম হরিদ্রা কুড় রাইসর্ষপ ও ইন্দ্রযব শুক্রের সহিত বাটিয়া
প্রলেপ দিলে ছুগি ও বিচর্চিকা (কাউর আরোগ্য হয় । (ভৈঃ রত্ন) 'কাশ-
রোগের (বিশেষতঃ শিশুর জন্ম) শাস্ত্রোক্ত সহজ অথচ অতি ফলপ্রদ যোগ
পুষ্করাদি চূর্ণ—কুড়, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী গিপুল, ছয়ালতা প্রত্যেক সমভাগ
মধুসহ লেহন কর্তব্য । কুড়, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, শ্রিয়ঙ্গু, বটেরকুড়ী
মস্তুর দাইল একত্র জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে মেচেতা দূর হইয়া মুখের বর্ণ
উজল হয় । (ভৈঃ রত্ন) অগ্নিমন্দ্যরোগের, অগ্নিমুখ চূর্ণের মধ্যে কুড় বহু
প্রসিদ্ধিমাণে প্রযুক্ত হয়, যথা—

হিঙ্গুভাগো ভবেদেকো বচা চ বিগুণাভবেৎ ।

দ্বিপল্লী ত্রিগুণা শ্রোক্তা শূর্পবেরং চতুর্গম্ ॥

• যমানিকা পঞ্চগুণা ষড়্গুণা চ হরিতকী ।

চিক্ককং সপ্তগুণিতং কুষ্ঠ মষ্টগুণং ভবেৎ ॥

অর্থাৎ হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপূল ৩ ভাগ, তুষ্ঠ ৪ ভাগ, বফানী ৫ ভাগ, হরিতকী ৬ ভাগ, চিতামূল ৭ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ, দধির মাত, সুরা অথবা উজ্জলের সহিত সেবনে উদাবর্ত্ত, বাতাজীর্ণ, আমাজীর্ণ, শ্রীহা ও কাসরোগ আরোগ্য হয়। ইহা সহজ অথচ একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

শান্তোক্ত হরজ্জ্বলের কল্যাণাবলেহ ও ব্রহ্মীঘৃতে, কাসের হমশর্কর লৌহ ও শৃঙ্গারালে শিশুরোগের কুমার কল্যাণ ঘৃতে, চন্দ্রেরোগের বৃহৎ মরিচাদি ও কন্দর্পগার তৈলে এবং বাতব্যাধির নানা তৈলে কুড় আবশ্যিক হয় ।

কুন্দুর ১

বাঙ্গালা নাম—কুন্দুর খোটা; হিন্দী—খেরোজা; A sort of resin. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কুন্দুরস্ত কুন্দঃ স্তাৎ সৃগন্ধঃ কুন্দ ইত্যপি । সংস্কৃত নাম—কুন্দুর, মুকুন্দ, সৃগন্ধ, কুন্দ ।

ইহা রসওয়েলা ফ্লোরিগা (শল্লকী) নামক বৃক্ষের ধূনাযুক্ত নির্যাস । এই নির্যাস গোলাকার, ঈষৎ পীতবর্ণ; স্বচ্ছ, ভঙ্গুর, উগ্র, রক্ষাস্বাদ ও রক্ষ সঙ্গন্ধবুল, অগ্নিসস্তাপ পাইলে অধিকতর সৃগন্ধ নির্গত হয় । খোটাশারীর দোকানে কিনিতে পাওয়া যায় ।

কুন্দুর মধুর তিক্ত স্তীর্ণ স্বাচ্যঃ কটু ইরেৎ ।

জ্বর শ্বেদ প্রদাহালক্ষী মুখরোগকফানিশান্ ।

দাহপ্রদর পিত্তাত্তী লেপনাচ্ছেত্যদঃ পরঃ ॥

রস—মধুর তিক্তকটু; বিপাক—কটু; বীর্য—উষ্ণ; গুণ—তীক্ষ্ণ স্বক্লেদোঘনাশক, কফবাতঘ্ন, জ্বর, দাহ ও পিত্তরোগহর, লেপনে শ্বেত্যপ্রদ (প্রদাহনাশক) প্রভাক—প্রদর (শ্বেত) নাশক ও মুখরোগহর । কোমলস্থানের ক্ষতে বিশেষ উপকারী, তজ্জগ্ৰহি ঘোনি মধ্যস্থিত ক্ষত জন্তু খেতস্রাব ও মুখগহ্বরস্থ ক্ষতের প্রশমন করে ।

প্রয়োগ—কাস, ক্ষত, ব্রণ, শ্বেতপ্রদর ও মেহে প্রযোজ্য । চূর্ণের মাত্রা (আত্যন্তরিক) ৫ হইতে ১৫ রতি । মধু সহ লেহন করিতে হয় । চকমস্ত লিখিয়াছেন, গোধূম ও কন্দুর, মেঘদ্বন্দ্বসহ পেষণ ও ঈষদ্বক্ষ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণশূল নিবারিত হয় । কুন্দুর অর্ধ ছটাক গর্জন তৈল ও

মোম প্রত্যেকে অর্ধ ছটাক উদ্ভাপ সংযোগে গলাইয়া ছাঁকিয়া লইলে ইহা সর্বপ্রকার মায়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ হয়। গৃহে সদর্পকযুক্ত ধূম দিবার সময় অস্ত্রাশ্র মশলার সহিত ইহা ব্যবহার করা ভাল।

কুমড়া ।

বাঙ্গালা নাম—কুমড়া; হিন্দী—কোঁহড়া; ইংরাজী—Benin casa. ইহা মনুষ্যের একটা অনায়াস-লভ্য খাদ্য, বহুল পরিমাণে জন্মে, যেরে সঞ্চিত থাকিলে পঁচে না, অল্পমূল্যে অধিক ওজনে পাওয়া যায়। সুতরাং গরিব বাঙ্গালী গৃহস্থের পক্ষে মহোপকারী—অত্র কিছুই অভাবে অন্ন গলাধঃ করাইবার অধম-তারণ সহীর্ণ। ইহা রোগীকে অপথ্য, কিন্তু সুস্থের পক্ষে বলপুষ্টিকর।

কুম্ভাণ্ডং বৃংহণং বৃংহুং গুরু পিত্তাশ্র বাতনুৎ ।
 বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকাশিকম্ ॥
 বৃদ্ধং নাতি হিমং স্বাদু স্ফারং দীপনং লঘু ।
 বস্তিগুদ্ধিকরং চেতোরোগহৃৎ সর্বদোষজিৎ ॥

সদ্যঃপক কুম্ভাণ্ড (যেহা পাকা অথচ ঘরে বহুদিন রাখা হয় নাই) একরূপ কুমড়া শরীরের পুষ্টিকর, শুক্রকর, ঈষৎ গুরুপাক, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক। কচি কুমড়া পিত্তনাশক ও শীতল, মধ্যম কুমড়া কফকর এবং অত্যন্ত পাকা কুমড়া, অতিশীতল নহে, মিষ্টাস্বাদ, ক্ষারযুক্ত, অগ্নিদীপক ও লঘুপাক, ইহা প্রস্রাববধরক, হৃৎস্রোগনাশক ও ত্রিদোষহর।

cerifera. সংস্কৃত পর্যায়ঃ—কুম্ভাণ্ডং স্রাৎ পুষ্পফলং পীতপুষ্পং বৃহৎফলম্ ।
 সংস্কৃত নাম—কুম্ভাণ্ড, পুষ্পফল, পীতপুষ্প, বৃহৎফল। অত্রনাম—সুগাবাস, তিমিষ, গ্রাম্যকর্কট, কর্কাক, শিথিবর্দ্ধক, সূফলা, নাগপুষ্পফলা।

কুমড়া গাছ সকলেই দেখিয়া থাকিবেন, ইহাকে চালকুমড়া, ছাঁচিকুমড়া সাদা কুমড়া বা দেশী কুমড়া বলে; হরিদ্রাজিট মিষ্টাস্বাদ যুক্ত যে কুমড়া, বাহা মিষ্টকুমড়া, স্বর্ষাকুমড়া, বিলাতী কুমড়া প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়) তাহা এই জাতীয় কুমড়া হইতে সম্পূর্ণই বিভিন্ন। চল কুমড়া ঘরের ছাদে বা উচ্চ মঞ্চের উপরে জন্মে, শেযোক কুমড়া ভূমির উপরে উৎপন্ন হয়। এই মিষ্ট কুমড়া যদিও ঔষধোপকরণরূপে ব্যবহৃত হয় না, তথাপি ইহার একটা প্রধান গুণের জন্ত এস্থলে ইহার উল্লেখ করিতে হইল; সে গুণটি এই।

দুর্গা-স্তোত্রম্.

(হিমালয়-কৃতম্)

(১)

মাতঃ সৰ্ব্বময়ি প্রসাদ পরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে,
ঐং সৰ্ব্বং ন হি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বস্তু হ্রদত্তং শিবে ।
ঐং বিষ্ণু গিরিশ স্বমেব হি স্মরা ধাতাঃসি শক্তিঃ পরা
কিং বর্ণ্যং চরিতং ত্বচ্চিত্যচরিতে ব্রহ্মাদাগম্যং শিবে ॥

এই ত্রিসংসার মাগো ! চক্ষাচরময়
তোমারি স্বরূপ বিনা কিছু আর নয় !
তুমি বিশ্বেশ্বরী মাগো ! তুমি বিশ্বধরী,
মোর প্রতি স্নপ্রসন্ন হও মা শঙ্করি !
তুমিই এ ত্রিসংসারে একমাত্র সার,
তোমা বিনা সার বস্তু কিছু নাই আর !
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর,
তুমি পূর্ণশক্তি, তুমি দেবতা-নিকর !
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তোমার যখন
চরিত্র বর্ণিতে নাহি পারে কদাচন,
তখন অধম আমি কিরূপ করিয়া
বর্ণন করিব তাহা, না পাই ভাবিয়া !

(২)

ঐং স্বাহাঃখিলদেবতৃপ্তিজনিকা পিত্রাদিষু ঐং স্বধা
তৃপ্তেঐং জনিকা সতৈল জগতাং ঐং দেবদেবাত্তিকা ।
হবাং কব্যমপি স্বমেব নিয়মো যজ্ঞপুণা দক্ষিণা
ঐং স্বর্গাদিকলং সমস্তফলদে বিশ্বেশি তৃত্যং নমঃ ॥

যাবতীয়া দেবতার তৃপ্তির কারণ
যে আছতি দেয় লোক অনলে যখন,

সেই পুণ্য ষ্ঠতাহতি, স্বাহা নাম ধার,
 তব নামান্তর বিনী কিছু নয় আর !
 মৃত-পিতৃ-পুরুষের তৃপ্তির কারণ
 পিশু জল যাহা কিছু যে দেয় যখন,
 সেই পুণ্য পিণ্ড জল, স্বধ্য যার নাম,
 তব নামান্তর তাহা, সার বুঝিলাম !
 তুমিই এ জগতের তৃপ্তির কারণ,
 দেবদেব মহাদেব তব প্রাণধন ।
 তুমি হব্য, দেবলোক-তৃপ্তির কারণ,
 তুমি কব্য, পিতৃলোক-তৃপ্তির সাধন ।
 তুমিই স্বয়ং যজ্ঞ, তুমিই দক্ষিণা,
 স্বর্গাদি যা কিছু ফল, তোমারি কল্পনা ।
 ওমা সর্ব-ফল-দাত্রি ! ওমা বিশ্বেশ্বরি !
 তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি ।

(৩)

রূপং সূক্ষ্মতমং পরাং পরতরং যদ্ যোগিনো বিদ্যয়া
 শুদ্ধং ব্রহ্মময়ং বিদন্তি পরমং মাতঃ সূক্ষ্মপুং তব ।
 বাঁচাৰ্কাতিগমং মনোহতিগমপি ত্রৈলোক্যবীজং শিবে
 ভক্ত্যা হং প্রণমামি দেবি বরদে বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাম্ ॥

অতি সূক্ষ্মতম রূপ জননি ! তোমার,
 যাহা হ'তে প্রশ্ৰুতর কিছু নাই আর ;—
 যোগবলে বলে যাকে যোগী সমুদয়
 বিশুদ্ধ, সূক্ষ্মপু পুনঃ পূর্ণব্রহ্মময় ।
 বাক্য-অগোচর তুমি, চিত্ত-অগোচর,
 তোমার, "ত্রিলোক-বীজ" নাম নিরন্তর ।
 তুমি শিবময়ী, তুমি বর-প্রদায়িনী,
 ভক্তিভরে নমি আমি তোমায় জননি !

ত্রিপদে পড়েছি মাগো ! হৃৎথে ফাটে প্রাণ,
ওমা বিবেচরি ! মোরে কর পরিভ্রাণ !

(৪)

উদ্যৎসূর্যাসহস্রভাং মম গৃহে জাতাং স্বয়ং লীলয়া
দেবীমষ্টভূজাং বিশালনয়নাং বালেন্দুমৌলিং শুভাম্ ।
উদ্যৎকোটিশশাক্তিস্তিমলাং বালাং ত্রিনেত্রাং শিবাং
ভক্ত্যাহং প্রণমামি বিশ্বজননীং দেবি প্রসীদাধিকে ॥

সহস্র! উদীয়মান সূর্যের সন্ধান

তোমার উজ্জ্বল কান্তি রূপে অনুমানি ।
মোর ঘরে জন্ম নিলে করিয়া কক্ষণা,
তুমি দেবী অষ্টভূজা, বিশাল-নয়না ।
অর্ধচন্দ্র শিল্পে তব কিবা শোভা ধরে,
পরম মঙ্গলময়ী তুমিই সংসারে ।
আকাশেতে কোটা চন্দ্র হইলে উদয়,
তোমার কান্তির সনে তবে তুল্য হই ।
তুমি স্থনিশ্চলা বালা ত্রিনেত্র-ধারিণী,
একমাত্র শিবময়ী তুমিই জননি ।
ওমা জগন্মাতঃ ! আমি নমি ভক্তিভরে,
প্রসন্ন হও মা ! সদা আমার উপরে !

(৫)

রূপং তে রক্ততাদ্রিসন্নিকমলং নাগৈশ্চতুষোজ্বলং
ঘোরং পঞ্চমুখাম্বুজং ত্রিনয়নৈর্ভীমৈঃ সমুদ্ভাসিতম্ ।
চন্দ্রাঙ্কিতমস্তকং ধৃতজটাজুটং শরণ্যে শিবে
ভক্ত্যাহং প্রণমামি বিশ্বজননি ত্বং মে প্রসীদাধিকে ॥

তোমার রূপের কথা কি বলিব আর,
রক্ত-পর্কিত মম শুভ্র অনিবার ।

নাগৈঃ তোমার মাগো ভূষণ উজ্জল,
 তব শিরে রহে পুষ্প বদন-কমল ।
 ভীষণ ত্রিনেত্র-মূর্ত্তি করেছ ধারণ,
 অর্কচন্দ্র শিরে তব শোভে সর্বক্ষণ ।
 জটাভার ধরিয়াছ মস্তকে জননি !
 তুমি শুভমতী, তুমি আশ্রয়-দামিনী ।
 ওমা জগন্নাথঃ ! আমি নমি ভক্তিভরে,
 প্রসন্ন হও মা ! নিত্য আমার উপরে,

(৬)

রূপং শারদচন্দ্রকোটীসদৃশং দিব্যাম্বরশোভনং
 দিমৈর্যাত্রৈর্গণৈর্বিরাজিতমলং কান্ত্যা জগন্মোহনম্ ।
 দিব্যে বাহুচতুষ্টয়ৈঃ স্মিলিতং বন্দে শিবে ভক্তিতঃ
 পাদাজং জননি প্রসীদ নিখিলত্রন্ধাদিদেবস্তুতে ॥

তোমার রূপের ছটা নিত্য বিদ্যমান,
 'কোটা শরতের চন্দ্র ব'লে অসুমান ।
 পরম সুন্দর বস্ত্র কর মা ধারণ,
 কিছুই সুন্দর নাই তোমার পতন !
 দিব্য আভরণে তব শোভা অনিবার,
 রূপের ছটায় তব ভুলে ত্রিসংসার ।
 ধারণ করেছ তুমি বাহুচতুষ্টয়,
 করে মা ! তোমার পূজা দেবতা-নিচয় ।
 ভক্তিভরে পূজি, তব ঠাঁয়-কমল,
 মোর প্রতি তুষ্ট মাগো ! হও অবিরল !

(৭)

রূপং তে নবনীরদহ্যতিধরং ফুলাজনেত্রোজ্জলং
 কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং স্নিতমুখং রত্নাঙ্গদৈর্ভূষিতম্ ।

বিলাসজনমালয়া বিলসিতোরসঃ জগত্তারিণি
ভক্ত্যাহং প্রণতোহস্মি দেবিকৃপয়া-হর্গে প্রসীদাষিকে ॥

নবীন নীরদ সম তোমার বরণ,
প্রস্ফুটিত পদ্ম সম তোমার নয়ন ।
জ্বলয় তোমার কান্তি এই ত্রিসংসার,
মুহ মন্দ হান্ত তব মুখে অনিবার ।
রতন-কেয়ুরে তুমি শোভিছ সুন্দর,
বনমালা বক্ষে তব কিবা মনোহর ।
রক্ষা করিতেছ তুমি এই জিজ্ঞাসন,
জিজ্ঞাসুরে পূজা করি তোমার চরণ ।
করিয় আমার প্রতি কৰুণা মদাই ।
সুপ্রসন্ন থাক মাগো ! এই তিফা চাই !

(৮)

মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তব গুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মিকং
শক্যে দেবি জগত্রে বহুবুগৈ দেবোহথবা মানুষ্যৈঃ ।
যং কিং স্বল্পমতিত্র বীমি কুরুণাং কুমা স্বকৌটৈ গুণৈ
নো মাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিবেশি তুভ্যং নমঃ ॥

কিবা দেব, কিবা নর, এই ত্রিসংসারে
যত্ন করিলেও যুগযুগান্তর ধরে,
তথাপি তোমার গুণ, বিশ্বরূপ আর
বর্ণন করিতে পারি হেন সাধ্য কার ?
তবে ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি কিরূপ করিয়া
বর্ণন করিব তাল্লা, না পাই ভাবিয়া !]
নিজগুণে কৃপাবিন্দু করিয়া সঞ্চার
মায়াপাশে বদ্ধ মোরে করিও না আর ।
মায়ায় সমুদ্রে আছি মগ্ন অবিরাম,
ওমা বিবেশরি ! তব চরণে প্রণাম !

(৯)

অদ্য মে সফলং জন্ম তু পশ্চ সফলং মম ।
যৎ স্বং ত্রিজগতাং মাতা মৎপুত্রীত্বমুপাগতা ॥

এতদিনে হলো মোর জনম সফল,
এতদিনে সিদ্ধ মোর তপস্যার ফল ।
ত্রিজগন্মাতা তুমি আসি মোর ঘরে
কন্তা-রূপে জন্ম নিলে মোরে কৃপা ক'রে !

(১০)

ধনৌহং কৃতকৃত্যুশ্চ মাতস্বং নিজলীলয়া ।
নিত্যাপি মংগৃহে জ্ঞাতা পুত্রীভাবেন বৈ যতঃ ॥

ধনু ধনু ধনু মাগো ! জনম আমার,
সার্থক জীবন মোর, বুঝিলাম সার !
তাঁহা যদি না হবে মা ! তবে কি কারণ
হইয়াও এ সংসারে তুমি নিত্য ধন,
লীলাচ্ছলে তুমি মোর কন্তারূপ ধরি
শিতা ব'লে ডাকিলে মা ! মোরে কৃপা করি ।

(১১)

কিং জ্ঞানো মেনকারাশ্চ ভাগ্যং জন্মশিতাঙ্জিতম্ ।
যতত্রিজগতাং মাতুরপি মাতাহতবক্তব ॥

ধনু ধনু ধনু মাগো ! ভাগ্য মেনকার,
শত্ৰুজন্মে যত পুণ্য ছিল মা ! তাঁহার ।
ত্রিজগন্মাতা হ'য়ে কন্তারূপ ধরি
মাতা ব'লে ডাকিলে মা ! তাঁকে কৃপা করি !

হুর্জন-নিন্দা ।

(১)

হুর্জনং প্রথমং বন্দে সূজনং তদনন্তরম্ ।

মুখপ্রকাশনাং পূর্বং গুহ্যপ্রকাশনং যথা ॥

আর্গেই বন্দনা করি হুর্জনচরণ,

শেষে সূজনের পদ করিব বন্দন ।

প্রমাণ দেখ না কেন, লোকে শৌচে গিন্না

আগে ধোয় গুহ্যদেশ মুখ না গুইয়া ।

(২)

হুর্জনঃ সূজনো ন শ্রাহুপায়ানাং শতৈরপি ।

অপানং যুৎসহস্রৈশ্চ ধোতং চাস্ত্রং কথং ভবেৎ ॥

করুক যতই চেষ্টা লোকে সর্বক্ষণ,

তথাপি হুর্জন কভু না হয় সূজন ।

হাজার লাগাও মাটি মার্গেতে লোপিন্না,

যে মার্গ সে মার্গ রয়, মুখন্দা হইয়া !

(৩)

খলঃ করোতি হুর্জন্তং নুনং ফলতি সাধুযু ।

দশাননোহ্বরং সীতাং বন্ধনস্ত মহোদধেঃ ॥

হুর্জন করিকে দোষ, একি সর্বনাশ !

কুকল তাহার সাধু ভোগে বারমাসী

সীতারে কঙ্কি চুক্তি হুট দশানন,

সমুদ্রের ভাগ্যে কিন্তু ঘটিল বন্ধন !

(৪)

নিকাতোহপি চ বেদান্তে সাধুযুং নৈতি হুর্জনঃ ।

চিরং জলনিধৌ মথৌ মৈনাক ইব মার্দবম্ ॥

যতই বেদান্ত পাঠ করুক দুর্জন,
 তথাপি কিছুতে সে না হইবে সুজন
 হার রে মৈনাক গিরি সমুদ্র ভিতরে
 ডুবিয়া রয়েছে দেখ চিরদিন ধরে ;
 কিন্তু মনে ভেবে দেখ তুমি অবিরল,
 কিছুতেই কতু জাহা না হ'লো ত্রুপল !

(৫)

ন বিনা পরবাদেন রমতে দুর্জনো জনঃ ।
 নাহি সর্বরসানু ভুঞ্জ। বিনা মেধাং ন তৃপ্যতি ॥

পরনিলা বিনা জার যেজন দুর্জন
 কিছুতেই মনে সুখ না পার কখন।
 কুকুর স্মিষ্ট জব্য করে পরিহার,
 বিষ্ঠা খাইলেই কিন্তু তৃপ্তি হয় তার !

(৬)

নিমিত্তমুদ্ভিশ্চ হি যঃ প্রকৃপ্যতি ক্রবং স তস্তাপগমে প্রসীদতি ।
 অ কারণেই বিনোহস্তি যস্ত বৈ কথং জনস্তং পরিতোবসিধ্যতি ॥

কারণ দেখিলে তবে ক্রোধ বার হয়,
 সে কারণ গেলে, তাহা নাহি জার হয় ।
 নাহি বার কিছুমাত্র ক্রোধের কারণ,
 অথচ যদিপি ক্রোধ করে সেই জন,
 হেন জন কেবা কোথা রসু এসংসারে,
 কেজন তাহীরে তুষ্ট করিতে বা পারে !

(৭) ::

সংবদ্ধিতোহপি ভুজগঃ পরসানু যস্ত
 স্তংপালকানপি নিহস্তি বলেন সিংহঃ ।
 হৃষ্টঃ পর্ষেকপকৃতস্তদনিষ্টকারী
 বিখ্যাস্লেশ ইহ নৈব বুধৈ বিধেয়ঃ ॥

হৃদয় দিয়া সর্পে তুমি করছ পালন,
 তবু সে তোমার বশে না আসে কখন ।
 সিংহকে পালন কর পুথিয়া তাহার,
 তবু সে তোমারে খাবে বাগে যদি পার ।
 দুর্জনের উপকার করে যেই জন,
 তাঁহারি অনিষ্ট করে দুর্জন তখন ।
 যেই জন বুদ্ধিমান হয় এ সংসারে,
 সেজন কারেও মেনে বিশ্বাস না করে !

(৮)

অকরণমকারণবিগ্রহঃ পরধনে পরবোধিতি চ স্পৃহা ।
 সূজনবন্ধুজনেষসহিষ্ণুতা প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি হুরাঅনাম্ ॥

কিছুমাত্র দয়া মারা কভু না রাখিবে;
 কারণ না থাকিলেও বিবাদ কমিবে,
 দেখিলে পরের ধন নিতে ইচ্ছা যায়,
 দেখিলে পরের নারী ইচ্ছা করে তার,
 কিবা সাধু জন, কিবা নিজ বন্ধু জন
 কারো প্রতি সহ গুণ না রাখে কখন;
 যেজন পদম হুঁষ্ট এ সংসারে হয়,
 হাড়ে হাড়ে এই সব দোষ তার রয় !

(৯)

গজতুরগশতৈঃ প্রযুক্ত মূর্খা ধনরহিতা বিবুধা প্রযুক্ত পদভ্যাম্ ।
 গিরিশিখরগতাপি কাকপালী পুলিনগতৈর্ন সমেতি রাজহংসৈঃ ॥

হাতী বেড়া চড়িয়াও যথায় তথায়
 গমন করুক মূর্খ মুখ কিবা তার ?
 দরিদ্র পণ্ডিত যদি পারে হেঁটে বান্দু
 তবু তার তাহে মুখ, হেন অমুমান ।

কাক যদি ধ'সে রয় পকীত-স্থিখরে,
তবু তার "কাক" নাম চিরদিন ধ'রেল
চড়াতেও রাজহংস যদি করে বাস,
তবু তার "রাজহংস" নাম বারম্বাস ।
একবার ভেবে দেখ তুমি মনে মনে,
কাকের তুলনা হ'র রাজহংস মনে ?

(১০)

প্রায়ঃ স্বভাবমলিনো মহতাং সমীপে
তিষ্ঠন্ত খলঃ স কুরুতে হর্থজনোপষাতম্ ।
শীতাদিতৈঃ সকললোকস্থথাবহোহপি
ধূমে স্থিতে নহি স্মথেন নিষেব্যতেহমিঃ ॥

মলিন-স্বভাব বার সেই খণি জন
মহৎ লোকের কাছে থাকি সর্বক্ষণ,
খারাপ করিয়া দিয়া কাণ হুটী তার,
ভিক্ষুক জনেয় কত করে অপকার ।
আশুগ পোহারে সুখ শীতের সময়,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যদি ধূম তথা রয়,
সে আশুগ পোহাইয়া শীতান্ত যেজন,
কিছু মাত্র সুখ নাহি পাইবে তখন !

(১১)

ধূমঃ পক্ষ্মাধরপদং কথমপ্যাবাপ্য ঘর্ষাকৃতিঃ শময়তি জলনস্ত তেজঃ ।
দৈবাদবাণ্ড্য কলুষপ্রকৃতি মনুষ্যঃ প্রায়ঃ সবজ্জর্জনমেব তিরস্করোতি ॥

অগ্নি হ'তে বসত ধূম উঠিয়া গগনে
মেঘরূপে জন্ম লয়, জানে সর্বজনে ।

তার পর গুঁই মেঘ ঘোর বৃষ্টি দিয়া
সেই অগ্নিকেই দেয় নির্কাণ করিয়া ।
যে জনের স্বভাবতঃ অতি ক্ষুদ্র মন,
পার যদি উচ্চপদ কত্ব সেই জন,
অমনি নিজের শক্তি করিয়া বিস্তার,
সংলাপ করে দেয় আত্মীয় জনায় ।

(২২)

বন্দ্যারিন্দতি দুঃখিতানুপহস্যাত্যাকাধলে বান্ধবান্ • •
শুবান্ যেষ্টি ধনচ্যুতান্ পরিভবক্। জাপদত্যাশ্রিতান্ ।
শুহানি শ্রকণীকরোতি ঘটয়ন্ কৃত্বন বৈরাশয়ঃ
ক্রতে শীঘ্রমবাচ্যমুজ্জ্বতি গুণান্ গৃহাতি দোষাঃ খলঃ ॥

পূজ্য জনে নিস্তা করে ছুট বারমাস,
দুঃখীর দেখিয়া দুঃখ করে উপহাস,
বন্ধুর উপরে দেয় বিপত্তি অশেষ,
সাহসী লোকেরে দেখি করে থাকে দেব,
পূর্বে ধনী ছিল, কিন্তু ধন গেছে সব,
এ হেন লোকেরে দেখি করে পরাভব ।
জুলুম করিবে তারে যেজন আশ্রিত,
প্রকাশ করিয়া দিবে গুণ কথা বত ।
পথের বগড়া কিনে ল'য়ে আসে ঘরে,
অবাচ্যও বাহা তাহা মুখ হ'তে সরে, ॥
গুণ দেখিলেও তাহা না বলে কখন,
দোষ পাইলেই কিন্তু হন পকানন ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্রে দে বি, এ ।

২৬২ বৃন্দাবন পালের লেন, স্রামবাঙ্গার, কলিকাতা ।

